প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭

প্রকাশিকা / প্রীতি মুখার্জী। ৭/১ বি, অনরেট সেকেণ্ড লেন, কলকাতা ১৪
মুদ্রক / পি. কে. পাল, শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯

উপন্যাস

গল্পগুচ্ছ

সূচীপত্র

পূর্ণাঙ্গ নাটক

'একাঙ্ক

উপন্যাস

কতকগুলো কারণে আমি অরলভ নামে পিটারসবুর্গের একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কাছে চাপরাশির চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলুম। তার সম্পূর্ণ নাম গ্রিগরি ইভানিচ অরলভ, বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশ।

অরলভের কাছে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলুম তার বাবার জন্যে। উনি ছিলেন একজন ঝানু রাজনীতিবিদ এবং ওঁকে আমার লক্ষ্যপথের একজন প্রধান শত্রু বলে মনে করতুম। আমার পরিকল্পনা ছিলো, ওঁর ছেলের কাছে চাকরি করতে গিয়ে যেসব আলাপ-আলোচনা শুনবো, টেবিলে যেসব চিঠি আর কাগজপত্র দেখতে পাবো, তা থেকে ওঁর উদ্দেশ্য আমি স্পষ্ট বুঝতে পারবো।

প্রতিদিন সকাল এগারোটায় নিয়ম মাফিক আমার চাকর-বাকরদের থাকার ঘরে বিজলি-ঘন্টিটা বেজে উঠতো, আর তা থেকে আমি বুঝতে পারতুম আমার মনিবের ঘুম ভেঙেছে। ঝকঝকে পালিশ-করা জুতো আর ভাঁজ করা পোশাক নিয়ে আমি তার শোবার ঘরে হাজির হতুম, দেখতুম গ্রিগরি ইভানিচ তার শয্যায় বসে আছে। ঠিক নিদ্রালস নয়, বরং তার মুখ দেখে মনে হতো ঘুমিয়ে সে আরও অবসন্ন হয়ে গেছে এবং এমন ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে, যেন অসময়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে আদৌ খুশি হয়নি। আমি তাকে পোশাক পরায় সাহায্য করতুম, আর সে নীরবে এমন একটা ভঙ্গি করতো যেন আমার উপস্থিতির কথা সম্পূর্ণ ভুলেই গেছে। তারপর ভিজে চুলে প্রসাধনের হালকা স্নিগ্ধ একটা সৌরভ ছড়িয়ে সে খাবার ঘরে কফি পান করতে যেতো। তার অভ্যেস ছিলো টেবিলে বসে গরম কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজের ওপর চোখ বোলানো। তখন বাড়ির ঝি পলিয়া আর আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে পরিণতবয়স্ক দুজন মানুষ দূর থেকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তির কফি পান আর বিস্কুট চিবুনো লক্ষ্য করি। হয়তো এ দৃশ্য খুবই অদ্ভুত আর হাস্যকর, তবু এভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে আমি অবমাননাকর

কিছুই দেখি না, যদিও অরলভের মতো আমিও সদ্‌-বংশজাত এবং উচ্চ-শিক্ষিত।

আমার তখন ক্ষয়রোগের প্রথম স্তর। তার সঙ্গে আরও অনেক আনুষঙ্গিক ছিলো, যা সাধারণত ক্ষয়রোগের চেয়ে আরও মারাত্মক। আমি জানি না, মানে সে সময়ে ঠিক বুঝতে পারতুম না, অসুস্থতা না দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্যে আমি দিন দিন কেমন যেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলুম। মানসিক প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য, মুক্ত বায়ু আর ভালো ভালো খাবারের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠতুম। আমি যেন স্বপ্নদর্শী হয়ে উঠেছিলুম, আর তাদের মতোই বুঝতে পারতুম না প্রকৃতপক্ষে আমি কি চাই। এক এক সময়ে মনে হতো কোনো গির্জেয় গিয়ে দিনের পর দিন জানলার সামনে বসে সবুজ গাছপালা আর উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকি। কখনও ইচ্ছে হতো বিঘে পঁয়তাল্লিশেক জমি কিনে সাধারণ চাষীর মতো জীবন যাপন করি। কখনও আবার বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে প্রাদেশিক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ করার আর্তি অনুভব করতুম। আমি ছিলুম নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন অধ্যক্ষ। আমি স্বপ্ন দেখতুম সমুদ্র, নৌবাহিনী আর যে রণতরী করে আমি বিশ্ব পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলুম সেই তরণীর। গ্রীষ্মমণ্ডলের বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়ালে কিংবা বঙ্গোপসাগরের বুকে সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে থাকলে মানুষ যেমন একাধারে রোমাঞ্চিত ও ঘরে ফিরে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সেই অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে আমার হৃদয়ও ঠিক তেমনিভাবে নেচে উঠতো। স্বপ্ন দেখতুম উত্তুঙ্গ পাহাড়, নারী আর সংগীতের, শিশুর মতো অবাক চোখ মেলে আমি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতুম, শুনতুম তাদের অনন্ত কণ্ঠস্বর। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন অরলভের কফি পান লক্ষ্য করতুম, নিজেকে তখন আমার চাপরাসি বলে মনে হতো না, মনে হতো এ পৃথিবীর সবকিছুর ওপরেই না আমার কত আগ্রহ, এমন কি অরলভের ওপরেও।

হাবভাব চালচলন চেহারার দিক থেকে অরলভ ছিলো জাত পিটার্স-

বুর্গবাসী—সরু কাঁধ, লম্বা কোমর, চাপা কপাল, কটা চোখ, পাতলা ধূসর চুল আর সারা মুখ দাড়িগোঁফে ভর্তি। যদিও সে মুখের জন্যে বিশেষ যত্ন নিতো, তবু সারা মুখে ফুটে উঠতো বিষণ্ণ আর নৈরাশ্যের ছাপ। ঘুমলে কিংবা গভীর ভাবনার অতলে তলিয়ে গেলে তাকে আরও বিশ্রী দেখাতো। এ রকম অত্যন্ত সাধারণ একটা চেহারার বর্ণনা দেওয়ার কোনো মানে হয়না, তাছাড়া পিটার্সবুর্গ তো আর স্পেন নয়। চেহারাটা আদৌ কোনো ব্যাপার নয়, বিশেষ করে প্রেমের ব্যাপারে তো নয়ই। তবু অবলভের চেহারায় কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো বলেই আমি তার মুখ আর চুলের কথা উল্লেখ করলুম। যখনই সে সংবাদপত্র বা কোনো বই হাতে নিতো কিংবা কারুর সঙ্গে কথা বলতো, তার চোখে-মুখে ফুটে উঠতো প্রচ্ছন্ন একটা বিদ্রূপের হাসি। অবশ্য তাতে বিদ্বেষের ভাব থাকতো খুবই কম। বরং কিছু পড়া বা শোনার আগে, প্রাচীনকালে বর্বরদের হাতে যেমন সব সময় মজুত থাকতো ঢাল, তেমনি তার ভঙ্গিতেও ফুটে উঠতো নিন্দাচ্ছলে স্তুতির ভাব। এটা ছিলো তার মজ্জাগত স্বভাব, অনেকটা বহুদিন আগে গেঁজিয়ে রাখা পুরনো মদের মতো, যা প্রয়োগ করতে তার বিশেষ কোন আয়েশের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু যাক, সে কথা আমি পরে বলছি।

সকাল গড়িয়ে যাবার পর দুপুরের দিকে খাওয়া-দাওয়া সেরে ব্যাগের মধ্যে কাগজপত্র ভরে সেই যে সে বেরিয়ে যেতো, ফিরতো রাত আটটায়। আমি তার পড়ার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখতুম। ফিরে এসে সে নিচু চেয়ারে বসে অন্য আর একটা চেয়ারে পা ছড়িয়ে দিয়ে পড়া শুরু করতো। সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন বই নিয়ে আসতো, কখনও বা বইয়ের ঢাউস মোড়ক। কয়েকদিনের মধ্যেই তার টেবিলে তিনটে ভাষার বই স্তূপাকার হয়ে যেতো, এর মধ্যে রুশ ভাষার বইই থাকতো সবচেয়ে কম, যার কিছু কিছু পড়া হয়ে গেলে সে আমার ঘরের খাটের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিতো। অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সে বই পড়তে পারতো। কথায় বলে, 'তুমি কি পড়েছো বলো, তুমি কেমন লোক আমি বলে দিতে পারবো।' কথাটা সত্যি হলেও অবলভ যা পড়তো তা দিয়ে

তাকে বিচার করা অসম্ভব। তার সমস্ত ব্যাপারটাই ছিলো কেমন যেন তালগোল পাকানো গোছের। দর্শন, ফরাসী উপন্যাস, রাজনৈতিক-অর্থনীতি, অঙ্কশাস্ত্র, নতুন কবিতার সংকলন—কিছুই সে বাদ দিতো না, এবং যা কিছু পড়তো সবই সমান দ্রুততার সঙ্গে, আর তার দু চোখের প্যাতায় আলতো করে জড়িয়ে থাকতো সেই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস।

রাত দশটার পর সান্ধ্য-পোশাকে দারুণ সাজগোজ করে সে বেরিয়ে পড়তো, ফিরতো সেই ভোররাতে। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো শান্ত আর নির্বিরোধী, ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশই ছিলো না। আমার সঙ্গে সে যখন কথা বলতো, তার মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠতো না ব্যঙ্গের ভাব। আসলে আমি যে একটা মানুষ, সে কথাটাই সে ভুলে যেতো।

আমি কেবল একবারই অবলভকে রাগতে দেখেছিলুম। চাকরিতে ঢোকার সপ্তাখানেক পর, একদিন নৈশভোজ সেরে রাত নটায় সে ঘরে ফিরে এলো। মুখে তার একরাশ বিরক্তি আর ক্লান্তির ছাপ। বাতি জ্বালিয়ে দেবার জন্যে আমি যখন তার পেছনে পেছনে পড়ার ঘরে ঢুকলুম, সে আমাকে বললো, 'কি রকম যেন একটা বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে।'

'কই, না তো!' আমি আস্তে আস্তেই জবাব দিলুম।

বিরক্তির স্বরে সে ঝাঁঝিয়ে উঠলো। 'আমি বলছি বেরুচ্ছে।'

'প্রতিদিনই তো আমি জানলার সার্সিগুলো খুলে দিই।'

'মুখে মুখে এমন জবাব দিও না, উজবুক কোথাকার!' ক্রুদ্ধ স্বরে সে চেঁচিয়ে উঠলো।

সত্যিই আমার খুব খারাপ লাগলো। পলিয়া, আমার চাইতে যে তার মনিবকে খুব ভালো করেই চেনে, হঠাৎ সে এসে না পড়লে আমি হয়তো একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ডই ঘটিয়ে বসতুম।

'হুঁ, সত্যিই তো একটা বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে!' ভ্রূ কুঁচকে শ্বাস টেনে পলিয়া অবাক হবার ভান করলো। 'গন্ধটা কিসের বলো তো? তুমি বরং এক কাজ করো স্তেফান, জানলার সার্সিগুলো সব খুলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও।'

দারুণ ব্যস্ততা দেখিয়ে, নানান বিস্ময়-উক্তি প্রকাশ করে পলিয়া ঘাঘরায় খস্‌খস্ শব্দ তুলে এ ঘর ও ঘর সে ঘর ঘুরে বেড়ালো। তবু কিন্তু অরলভের বিরক্তির ভাবটা রয়েই গেলো। যদিও তাকে সশব্দে প্রকাশ হতে না দেবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখতে বসলো, কিন্তু কয়েক লাইন লেখার পরেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে সে আবার নতুন করে লিখতে শুরু করলো।

চিঠিটা শেষ হবার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে সে আমাকে বললো, 'জামেনস্কি সরণিতে গিয়ে তুমি এই চিঠিখানা ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা ক্রাসনভস্কির হাতে দেবে। অবশ্য তার আগে দরোয়ানকে জিগেস করে জেনে নেবে তাঁর স্বামী মিস্টার ক্রাসনভস্কি ফিরেছেন কিনা। যদি শোনো ফিরেছেন, তাহলে আর চিঠিখানা দেবে না, ফিরে আসবে। আর শোনো··· ভদ্রমহিলা যদি তোমাকে জিগেস করেন আমার সঙ্গে কেউ আছে কিনা, তুমি বলবে দুজন ভদ্রলোক রাত আটটা থেকে বসে বসে কি সব যেন লিখছেন। কি বললুম, বুঝতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ।'

গাড়ি চড়ে আমি জামেনস্কি সরণিতে গেলুম। দরোয়ান বললো মিস্টার ক্রাসনভস্কি এখনও বাড়ি ফেরেননি। আমি তখন সোজা তিন তলায় উঠে গেলুম। লম্বা-চওড়া গাঁট্টাগোট্টা চেহারার পেল্লাই কালো মোচওয়ালা একজন চাপরাসি এসে দরজা খুলে দিলো। ভাঙা ভাঙা গলায় ঢুলুঢুলু চোখে জিগেস করলো কি চাই। আমি জবাব দেবার কোনো ফুরসুৎই পেলুম না, কালো পোশাক পরা ভারি সুন্দর দেখতে একজন মহিলা দ্রুত এগিয়ে এসে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো।

আমি জিগেস করলুম, 'ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা কি ঘরে আছেন?'

'হ্যাঁ, আমিই।'

'গ্রিগরি ইভানিচ এই চিঠিটা আপনাকে দিয়েছেন।'

অধীর আগ্রহে খামের মুখ ছিঁড়ে ও চিঠিখানা পড়তে লাগলো। দু হাতে ঝিকমিক করে উঠলো হীরের আংটিগুলো। চিঠিখানা পড়ার অবকাশে আমি ওকে ভালোকরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেলুম।

কিছুটা ম্লান মনে হলেও মুখখানা কিন্তু ভারি চমৎকার, মসৃণ চিবুক, টানাটানা দীর্ঘ চোখ, ঘন পল্লব, ঢল-ভেঙে-নামা একরাশ কালো চুল। দেখে মেয়েদের বয়েস অনুমান করা খুবই কঠিন, তবু মনে হলো বছর পঁচিশের বেশি নয়।

'ওঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ আর আন্তরিক অভিনন্দন জানিও।' পড়া শেষ করে ভদ্রমহিলা যেন অসম্ভব খুশির সুরে অথচ সলজ্জভঙ্গিতে আস্তে আস্তে জিগেস করলো, 'ওঁর সঙ্গে কি এখন কেউ আছেন?'

'হ্যাঁ, দুজন ভদ্রলোক বসে বসে কিসব যেন লিখছেন।'

'ঠিক আছে, ওঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন আর ধন্যবাদ জানিও।' মাথাটা একপাশে একটু হেলিয়ে মৃদুভাবে ও আবার বললো, তারপর চিঠিটা পড়তে পড়তে নিঃশব্দ পায়ে ফিরে গেলো।

তখনও পর্যন্ত খুব অল্প কয়েকজন নারীই আমার চোখে পড়েছিলো, এবং ক্ষণিকের জন্যে হলেও ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো। বাড়ি ফিরে আসার পথে সারাক্ষণই ওর স্নিগ্ধ মুখশ্রী, সৌরভঘন উষ্ণ উপস্থিতি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠছিলো। আমি যেন স্বপ্নে বিভোর হয়ে গিয়েছিলুম। যখন আমি ঘরে ফিরে এলুম, দেখলুম অরলভ বাইরে বেরিয়ে গেছে

২

আগেই বলেছি মনিবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো শান্ত আর নির্বিরোধী। তবু পরিচারক হওয়ার মধ্যে যে অরুচিকর প্রচ্ছন্ন একটা দূরত্ব থাকে, দিন দিন তা যেন ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। পলিয়ার সঙ্গে আমার আদৌ বনিবনা হচ্ছিলো না। ও ছিল বড়লোক বাড়ির আশ্রয়-প্রাপ্তা গোলগাল চেহারার এক প্রগলভ মহিলা। যেহেতু অরলভ ছিলো ভদ্রলোক, তাই ও তাকে সম্মান করতো আর আমি চাকর বলে ও আমাকে অবজ্ঞা করতো। তবে চাকর-বাকরের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো ও সত্যিই আকর্ষণীয়া ছিলো, কেননা ওর তুলতুলে লালচে চিবুক, খাড়া নাক, ছেনালিভরা বাঁকা চোখের চাউনি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

তাছাড়া ওর ঠাট-ঠমকেরও অন্ত ছিলো না—মুখে পাউডার মাখতো, ভুরুতে রঙ বোলাতো, পোশাকে ঝালর লাগাতো, ঘাঘরা ফোলাবার জন্যে ঘের ব্যবহার করতো, বড় বড় পুঁতির মালা পরতো। সকালবেলায় ওর সঙ্গে আমাকে যখন ঘর ঝাড়মোছ করার কাজ করতে হতো, ওর হেলেদুলে চলা ঘাঘরা আর কাঁচুলির খসখস শব্দ, চুড়ির ঠুংঠাং আওয়াজ, আর মনিবের কাছ থেকে চুরি করা দামী নির্যাসের সুগন্ধ, সব মিলিয়ে আমার মনে হতো আমি যেন ওর সঙ্গে কোনো জঘন্য কাজে লিপ্ত রয়েছি।

যেহেতু আমি ওর মতো চুরি করতুম না, বা ওর প্রেমিক হবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ করতুম না, যাকে ও নিজের প্রতি অপমানকর বলে মনে করতো, কিংবা ও মনে করতো আমি অন্য ধরনের মানুষ, সম্ভবত সেই জন্যেই প্রথম দিন থেকে ও আমাকে ঘেন্না করতো। আমার অনভিজ্ঞতা, আমার অনীহা, আমার অসুস্থতা ওর অনুকম্পা ওর বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। সে সময় আমার কাশিটা দারুণ বেড়ে গিয়েছিলো, এক এক দিন রাত্তিরে আমি ওকে প্রায় ঘুমুতেই দিতুম না, কেননা আমাদের ঘর-দুটো ছিল পাশাপাশি, মাঝখানে কেবল একটা কাঠের দেওয়াল। এবং প্রতি দিনই ভোরবেলায় জেগে উঠে ও আমাকে বলতো, 'আজ রাত্তিরে আবার তুমি আমাকে ঘুমতে দাওনি। কাজ ছেড়ে দিয়ে তোমার এখন হাসপাতালে যাওয়া উচিত।'

আসলে পলিয়া আমাকে মানুষ জ্ঞানই করতো না। আগেকার দিনে সম্ভ্রান্ত রোমান মহিলারা যেমন ক্রীতদাসদের সামনে নগ্ন হয়ে স্নান করতে লজ্জা বোধ করতো না, ও-ও তেমনি কখনও কখনও কেবল অন্তর্বাস পরেই আমার সামনে দিয়ে চলাফেরা করতো।

এক-একদিন মন মেজাজ ভালো থাকলে, নিজেকে স্বপ্নময় মনে হলে, রাত্তিরে খাবার সময় আমি ওকে জিগেস করতুম, 'আচ্ছা পলিয়া, তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো?'

'নিশ্চয়ই। কেন করবো না?'

'তাহলে তুমি নিশ্চয় এ কথাও বিশ্বাস করো যে এমন একদিন আসবে যেদিন আমাদের সবার বিচার হবে, এবং প্রতিটা অন্যায় কাজের

জন্যে ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে ?'

ও আমার কথার কোনো জবাব দিতো না, কেবল অবজ্ঞার ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকতো। ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠতো একজন পাকা দুষ্কৃত-কারীর ছাপ।

অরলভের সামনে আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করা, মিথ্যে কথা বলা, বিশেষ করে মনিব বাড়ি থাকা সত্ত্বেও 'উনি এখন বাড়ি নেই' বলতে বাধ্য হওয়াতে আমি প্রথম প্রথম খুবই অস্বস্তি বোধ করতুম। তখন আমার চাপরাসির উর্দিটাকে মনে হতো কঠিন একটা বর্মের মতো। ক্রমে ক্রমে অবশ্য এতে অভ্যস্ত হয়ে গেলুম। সত্যিকারের খানসামার মতো আমি খাবার টেবিলে পরিচর্যা করতুম, ঘরদোর গুছোতুম, নানা রকম ফাই-ফরমাস খাটতুম। অরলভ যখন ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার সঙ্গে দেখা করতো না বা কথা দিয়েও কথা রাখতে ভুলে যেতো, আমি তখন জামে-নস্কি সরণিতে গিয়ে ভদ্রমহিলার হাতে চিঠি দিয়ে একটা করে মিথ্যে কথা বলে আসতুম। চাপরাসির চাকরি নেবার আগে যেমনটা আশা করেছিলুম, সব মিলিয়ে তার ফল হচ্ছিলো অন্যরকম। আমি যেন আমার উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য থেকে প্রতিদিনই ক্রমশ সরে যাচ্ছিলুম। কেননা অরলভ তার বাবার সম্পর্কে কোন দিনই কিছু বলতো না, এমন কি যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো তারাও না। ফলে আমার সঙ্গী-সাথী-দের কাছ থেকে পাওয়া বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে সেই ঝানু রাজনীতিবিদটির কার্যকলাপ সম্পর্কে যতটুকু জানতুম, তার বেশি কিছু জানা আর আদৌ সম্ভব হয়নি। পড়ার ঘরের প্রায় সমস্ত চিঠিপত্র ঘেঁটেও অরলভের সঙ্গে তার বাবার কোনো দূরতম সম্পর্কও আমি খুঁজে পাইনি। বাবার রাজনৈতিক কার্যকলাপে অরলভ ছিলো সম্পূর্ণ উদাসীন, যেন ওসব সে কোনোকালেই শোনেনি, কিংবা বহুকাল আগেই তার বাবার মৃত্যু ঘটেছে।

৩

প্রতি বৃহস্পতিবারে আমাদের বাড়িতে অতিথি সমাগম হতো। রেস্তোরাঁ

থেকে ঝলসানো গরুর মাংস আনতুম, এলিসিয়েভদের দোকানে ফোন করে হেরিং মাছের জরানো ডিম, পনির আর সুক্তি পাঠিয়ে দেবার কথা জানাতুম। আমি নতুন তাস কিনে আনতুম, পলিযা প্রায় সারাদিনই চায়ের সরঞ্জাম গোছগাছ ও নৈশভোজের বাসনপত্র সাজানোর কাজে ব্যস্ত থাকতো। সত্যি বলতে কি, এই আকস্মিক কর্মতৎপরতা আমাদের অলস জীবনে নিয়ে আসতো একটা মধুর বৈচিত্র্য। সেই কারণে শ্রেস-পতিবারগুলোর জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতুম।

অতিথি বলতে কেবল তিনজনই আসতেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পেকারস্কি। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস, দীর্ঘকায় রোগা লিকলিকে চেহারা, লম্বা বাঁকানো নাক, ঘন কালো দাড়ি, মাথায় সামান্য একটু টাক। গ্রীক দার্শনিকদের মতো ড্যাবড্যাবে চোখ, থমথমে গম্ভীর মুখ। রেলওয়ে পরিচালন-সংস্থার সদস্য, ব্যাঙ্কে কি যেন বড় একটা পদে চাকরিও করতেন। বিশেষ একটা সরকারী প্রতিষ্ঠানে আইনের উপ-দেষ্টা, আবার বিভিন্ন সংস্থার সভাপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বহু বেসরকারী ব্যক্তির সঙ্গেও ওঁর ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিলো অসম্ভব রকমের। অত্যন্ত নম্রভাবে নিজেকে একজন সাধারণ আইনজীবী হিসেবে পরিচয় দিলেও, ওঁর প্রভাব ছিলো সুদূরপ্রসারী। ওঁর কোনো চিঠি বা কার্ড নিয়ে কেউ গেলে যেকোনো নামকরা ডাক্তার, রেলওয়ে সংস্থার পরি-চালক কিংবা বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করা সম্ভব হতো। অনেকে বলতো ওঁর কলমের একটা আঁচড়েই নাকি নিচু শ্রেণীর কোনো চাকরি পাওয়া যেতো এবং যেকোনো রকমের অপ্রীতিকর ব্যাপারকে গোপনে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হতো।

বাইরে থেকে দেখে ওঁকে যতটা বুদ্ধিমানের মতো মনে হতো, প্রকৃত-পক্ষে ওঁর প্রতিভা ছিলো সত্যিই ভারি বিচিত্র ধরনের। মনে মনে উনি ৩৭৩কে ২১৩ দিয়ে গুণ করতে পারতেন এবং কাগজ-কলম ছাড়াই ইংরেজি পাউণ্ডকে জার্মান মার্কে পরিণত করতে পারতেন। রুশ প্রশা-সন যন্ত্রের কোনো কিছুই ওঁর কাছে গোপন ছিলো না। দেওয়ানি মাম-লায় উনি ছিলেন অত্যন্ত সুচতুর উকিল এবং ওঁর সঙ্গে আইনের প্যাঁচ

দেওয়া ছিলো প্রায় দুরূহ। অথচ এই অসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও, নিতান্ত নির্বোধেও যা বুঝতে পারতো, অনেক সময় উনি তা বুঝতে পারতেন না। যেমন, মানুষ কেন হতাশ হয়, কেন কাঁদে, কেন ওরা আত্মহত্যা করে বা অন্যকে খুন করতে চায় কিংবা গোগল পড়ে লোকে কেন হাসে, এসব উনি কিছুই বুঝতে পারতেন না। বধির মানুষের কাছে সংগীতের মতো যাকিছু নিগূঢ় চিন্তা ও চেতনার বস্তু, সবই ওঁর কাছে ছিলো দুর্বোধ্য এবং বিরক্তিকর। স্রেফ ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেই উনি মানুষকে বিচার করতেন এবং তা দিয়েই যোগ্য অযোগ্য স্থির করতেন। পেকারস্কির কাছে অন্য কোনো শ্রেণীবিভাগ ছিলো না, সততা ও ন্যায়পরায়ণতাই যোগ্যতার একমাত্র লক্ষণ। মদ খাওয়া, জুয়োখেলা, এমন কি ব্যভিচারেও কোন আপত্তি নেই, যদি না তা ব্যবসাকে ব্যাহত করে। ভগবানে বিশ্বাস করা মূর্খামি, কিন্তু ধর্মকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে, নইলে শাস্তির ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বাগ মানানো যাবে না। ছুটি কাটানোর জন্যে বাইরে কোথাও যাবার দরকার নেই, শহরেই তা ভালো ভাবে উপভোগ করা যায়। এমনি সব উদ্ভট ওঁর ধ্যান-ধারণা। ভদ্রলোক বিপত্নীক এবং ছেলেপুলেও নেই, অথচ মাসিক তিন হাজার রুবলের বিরাট একটা বাড়ি নিয়ে বসবাস করতেন।

দ্বিতীয় অতিথি কুকুশকিন। বয়সে তরুণ হলেও সত্যিকারের একজন পৌরসভার সদস্য। বেঁটেখাটো, মোটা থলথলে চেহারার সঙ্গে শীর্ণ ছোট্ট মুখখানা আদৌ মিলতো না বলে তাকে আরও কুৎসিত দেখাতো। ওপরের দিকে ঈষৎ কুঁচকে থাকা ঠোঁটের ওপর সরু একফালি গোঁফ, দেখলে মনে হবে বুঝি আঠা দিয়ে আটকানো। লোকটার চালচলন ঠিক গিরগিটির মতন—হাঁটে না, ছোট ছোট পা ফেলে দেহটাকে যেন মাটির ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে গড়িয়ে নিয়ে চলে। মজ্জায় মজ্জায়, এমন কি প্রতিটি রক্তবিন্দুতে তার উচ্চাশা ছিলো অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের ওপরেই বিশ্বাস ফেলে হারিয়ে। ফলে ওপরওয়ালাদের করুণার ওপরে নির্ভর করেই ওকে জীবনের ভিত গড়তে হয়েছে। বিদেশী কোনো সম্মান, সংবাদপত্রে নিজের নাম প্রকাশ কিংবা

বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যলাভের সুযোগের জন্যে হাত পাতা বা তোষামোদ করার মতো এমন কোনো হীন কাজ নেই যা সে করতে পারে না। ভীরু কাপুরুষতার জন্যেই সে অরলভ, পেকারস্কিদের তোয়াজ করতো, কেননা সে ভাবতো ওরা শক্তিমান। এমনকি সে পলিয়া আর আমাকেও তোষামোদ করতো, যেহেতু আমরা একজন শক্তিমান লোকের অধীনে চাকরি করি

আমি যখন তার লোমের কোটটা খোলায় সাহায্য করতুম, সে মুচকি হেসে আমায় জিগেস করতো, 'আচ্ছা স্তেফান, তুমি কি বিবাহিত?' তারপরেই শুরু হয়ে যেতো অশোভন ইতরতার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। অরলভের দুর্বলতাগুলো কুকুশকিন সহ্য করতো, তার বিকৃত হীন চালচলনগুলোর সঙ্গে সমানে তাল মেলাতো। অরলভকে খুশি করার জন্যে অনেক গালাগালি দিতো, নাস্তিকতার ভান করতো, অন্য কোথাও হলে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির পায়ে লুটিয়ে পড়তো তাঁদের সে কুৎসিত সমালোচনা করতো রাতে খাবার সময় ওরা যখন নারী ও প্রেম নিয়ে আলোচনা করতো, কুকুশকিন এমন একটা ভান করতো যেন পিটারসবুর্গের সবচেয়ে লম্পট কামপরায়ণ ব্যক্তি। পৌরসভার তরুণ কোন্ সদস্য তার বাড়ির ঝি কিংবা নেভস্কি প্রসপেক্ট সড়কের কোন্ নৈশ-বিহারিণীর প্রেমালিঙ্গনে ধরা দিয়েছে, তার এই জাতীয় কথাবার্তা শুনে স্পষ্টই বোঝা যেতো কুকুশকিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সবরকম পাপাচারের সঙ্গে লিপ্ত, প্রায় ডজনখানেক অসামাজিক গোপন সংস্থার সম্মানীয় সভ্য এবং সে জন্যে পুলিসের কালো খাতায় ইতিমধ্যেই তার নাম উঠেছে। কুকুশকিন অবলীলাক্রমে নিজের সম্পর্কে কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যে বলে যেতো আর অন্যেরা তাকে যেমন পুরোপুরি অবিশ্বাস করতো না, তেমনি আবার সম্পূর্ণটা মন দিয়ে শুনতোও না।

তৃতীয় অতিথির নাম গ্রুজিন, বিশিষ্ট এবং উচ্চশিক্ষিত একজন সেনাধ্যক্ষের ছেলে। অরলভেরই মতো বয়েস, ঘন কালো চুল, চোখে সোনার চশমা। পিয়ানোবাদকদের মতো শুধু দীর্ঘ আঙুলই নয়, ওর সমস্ত অবয়ব দেখে মনে হতো ও একজন সত্যিকারের সংগীত-শিল্পী। প্রায়ই

কাশতো আর মাথার যন্ত্রণায় ভুগতো। ভারি চমৎকার দেখতে, অথচ এমন ভঙ্গুর স্বাস্থ্য যে দেখে মনে হতো ঠিক বাচ্চাদের মতো বাড়িতে কেউ বুঝি ওর পোশাক পরিয়ে দেয় এবং খুলে নেয়। আইনের পাঠ শেষ করে প্রথমে বিচারবিভাগে চাকরি নেয়, তারপর সেখান থেকে বদলি হয়ে যায় সেনেটে। সে-চাকরির ছেড়ে দিয়ে মুরুব্বির জোরে খাস জমিদারী বিভাগে চাকরি পায়। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে-চাকরিও ছেড়ে দেয়। সম্প্রতি ও অরলভদের দফতরে বড়বাবুর পদে চাকরি করছে। কিন্তু প্রায়ই ওকে বলতে শুনি এ চাকরিও নাকি ছেড়ে দেবে। ওর ছোটখাটো হিস্টিরিয়াগ্রস্ত একটা বউ আর পাঁচটা রোগা ল্যাকপ্যাকে চেহারার ছেলে-মেয়ে আছে। বউয়ের প্রতি ও আদৌ বিশ্বস্ত নয়, শুধু সামনে পড়লেই ও ছেলে-মেয়েদের আদর করতো। পরিবারের প্রতি ও যে শুধু উদাসীনই ছিলো তাই নয়, তা নিয়ে ও রগড় করতেও ছাড়তো না। ওর সমস্ত পরিবারটাই চলতো ধারের টাকায়, এবং ওপরওয়ালা থেকে শুরু করে বাড়ির দরোয়ান পর্যন্ত যখনই যার কাছে সুযোগ পেতো ও টাকা ধার করতো।

গ্রুঝিন এমনই ঢিলেঢালা আর অলস প্রকৃতির যে কোথা দিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে ওর খেয়ালই থাকতো না। ভঙ্গিটা এই রকম অন্ধের মতো, যেখানে ভেসে চলেছে চলুক, কোথাও এক জায়গায় গিয়ে ঠেকলেই হলো। কেউ যদি ওকে কোন বাজে আড্ডায় নিয়ে যেতে চাইতো, ও যেতো। কেউ যদি ওর সামনে মদ ঢেলে দিতো ও খেতো—আর না ঢেলে দিলে ও মদ স্পর্শও করতো না। কেউ যদি ওর সামনে বউদের গালাগালি দিতো, ও ও নিজের বউকে গালাগালি দিয়ে বলতো মাগীটা নাকি ওর জীবনটাকেই নষ্ট করে দিয়েছে। আবার কেউ যখন বউদের সুখ্যাতি করতো, ও-ও আন্তরিক ভঙ্গিতে নিজের বউয়ের প্রশংসা করে বলতো সোনামণিটাকে আমি সত্যিই খুব ভালোবাসি। শিশুদের গায়ের গন্ধওয়ালা ময়লা একটা কোট ছাড়া ওর নিজস্ব কোনো লোমের কোট ছিলো না। নৈশভোজের আসরে ও বেশ কয়েকটা রুটি আর একগাদা লাল মদ গিলতো, তখন মনে হতো ও যেন তন্ময়তার কোন্ অতল গহ্বরে

তলিয়ে গেছে। তেমনি কোনো মুহূর্তে আমার মনে হতো ওর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার সম্পর্কে ওর নিজেরই কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তাছাড়া প্রাত্যহিক কর্মমুখর জীবনে এসব হৃদয়ঙ্গম করার ওর সময়ই বা কোথায়। কখনও কখনও পিয়ানো বাজিয়ে মৃদু গলায় ও গান ধরতো—আমারই লাগিয়া কি আনিবে তুমি আগামীকাল! কখনও বা দু-এক ঘাট বাজিয়েই ও উঠে পড়তো, যেন অসম্ভব ভয় পেয়ে পিয়ানো-টার কাছ থেকে ছিটকে সরে আসতো।

সাধারণতঃ রাত দশটায় অতিথিরা একে একে এসে হাজির হতো। অরলভের পড়ার ঘরে বসে তাস খেলতো। পলিয়া আর আমি ওদের চা পরিবেশন করতুম। কেবল এমনি কোন মুহূর্তেই আমি চাপরাসি-জীবনের পরিপূর্ণ মাধুর্যের সন্ধান পেতুম। ঘন্টার পর ঘন্টা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হতো কারও গেলাস যেন না খালি যায় বা ছাইদানগুলো পোড়া সিগারেটের টুকরোয় না ভরে ওঠে। খড়ি কিংবা কোনো তাস মাটিতে পড়ে গেলে দৌড়ে গিয়ে তুলে দেওয়া, এতটুকুও না কেসে বা হেসে নিবিষ্ট চিত্তে চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা সত্যিই খুব কঠিন—মাঠে ফসল তোলা কাজের চাইতেও কঠিন। শীতের রাতে একটানা চার ঘন্টা আমি সমুদ্রের বুকে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য দেখে কাটি-য়েছি, কিন্তু সেও ছিলো বুঝি এর চাইতে অনেক সহজ কাজ।

কখনও কখনও রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত চলতো তাস খেলা। তার-পর আড়মোড়া ভেঙে নৈশভোজ, অরলভের ভাষায় সামান্য কিছু জল-যোগের জন্যে ওরা খাবার ঘরের দিকে পা বাড়াতো। খাবার সময় চলতো আলাপ-আলোচনা। হাসি-হাসি-ভরা চোখে তাকিয়ে সাধারণত অরলভই প্রথম সদ্য-শেষ-করা কোন বই কিংবা সরকারের নতুন কোনো পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতো। কুকুশকিন সব সময় তার প্রতিটা কথায় সায় দিতো, আমার কাছে মনে হতো সে এক দুর্বিষহ দৃশ্য। অরলভ আর তার বন্ধুদের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতো, এবং ওরা কাউকেই ছেড়ে কথা কইতো না। ধর্ম সম্পর্কে আলো-চনা করলে তাতেও বিদ্রূপের আভাস থাকতো, দর্শন বা জীবনের প্রকৃত

মর্মার্থ ও লক্ষ্যবস্তু নিয়ে আলোচনা করলে তাতেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ছোঁয়া থাকতো, এমন কি কৃষকশ্রেণী সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে শুরু করলে তার মধ্যেও ঠাট্টা-তামাসার কোন অভাব হতো না।

পিটার্সবুর্গে এক জাতের মানুষ আছে, যাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই হলো জীবনের প্রতিটা দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করা, যারা বুভুক্ষু কিংবা আত্ম-হননকারী কোন মানুষ সম্পর্কেও অশ্লীল মন্তব্য না করে পারে না। কিন্তু অরলভ আর তার বন্ধুরা শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপই করতো না, স্তুতি-ব্যঙ্গেও তারা ছিলো নিপুণ পারদর্শী। তাদের ভাষায় ভগবান বলে কিছু নেই, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ব্যক্তিত্ব নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, অমরত্বের যা কিছু নিদর্শন কেবল স্থান পায় যাদুঘরে। প্রকৃত সত্য বলতে কোনো জিনিস নেই, থাকা সম্ভব নয়, তা কেবল মানুষের পরিপূর্ণতার ওপরেই নির্ভরশীল। রাশিয়া পারস্যেরই মতো একটা দারিদ্র নিষ্প্রাণ দেশ। এখানকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অযোগ্য এবং অপদার্থ। দেশের অধিকাংশ মানুষই চোর অলস মাতাল। বিজ্ঞান বলতে আমাদের কিছু নেই, আমাদের সাহিত্য কুরুচিপূর্ণ, বাণিজ্য প্রতারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার মূলমন্ত্রই হলো প্রবঞ্চনা। ওদের সব কথাবার্তাই ছিলো এমনি ধারা এবং সব কিছুর মধ্যেই ওরা খুঁজে পেতো হাসির খোরাক।

নৈশভোজের পর মদ খেয়ে ওরা আরও বেশি প্রগল্‌ভ, আরও বেশি সরস আলোচনায় মেতে উঠতো। গ্রুঝিনের পারিবারিক জীবন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো, কুকুশকিন বা পেকারাস্কির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে রসা-লাপ চালাতো। ওরা বলতো, কোনো স্ত্রীই বিশ্বস্ত নয়। কেননা অদূরেই পড়ার ঘরে স্বামী যখন পড়াশোনায় মগ্ন, তখন এমন কোনো স্ত্রী পাওয়া যাবে না যাকে বৈঠকখানায় সোহাগ-আদর করা যায় না। যুবতী হবার আগেই মেয়েরা সব কিছু জেনে ফেলে এবং কাম-বিকৃতি ঘটে। অর-লভের কাছে চোদ্দ বছর বয়েসের একজন স্কুল-ছাত্রীর চিঠি আছে, যাতে সে লিখেছে—স্কুল থেকে ফেরার পথে নেভস্কি সড়কে একজন তরুণকে সে বঁড়শিতে গেঁথেছিলো, যে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অনেক রাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলো। মেয়েটি এই আনন্দ-সংবাদ চিঠিতে তার

বন্ধুকে না জানিয়ে পারেনি। ওরা বলতো নৈতিক পবিত্রতা বলতে কিছু নেই, এবং প্রকৃতপক্ষে তার কোনো প্রয়োজনই নেই। মানুষের যা কিছু অগ্রগতি নৈতিক পবিত্রতা ছাড়াই ঘটেছে। তথাকথিত পাপের দ্বারাই ক্ষতির পরিমাণকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের আইনের ধারা অনুযায়ী পাপের শাস্তি বিধানের যে ব্যবস্থা আছে, তাতে ডায়োজেনিসের পক্ষে দার্শনিক হবার পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। সিজার এবং সিসিরো একাধারে লম্পট ও মহৎ ছিলেন। কেটো বৃদ্ধ বয়েসে একজন তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন, তবু তাঁকে মহান তপস্বী ও নৈতিকতার স্তম্ভ হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়।

শেষ রাতে ওদের আসর ভাঙতো। তখন ওরা সবাই মিলে চলে যেতো হয় শহরের বাইরে, নয়তো ভার্ভারা ওসিপোভনা নামে একজন মহিলার বাসায়। আর আমি ফিরে আসতুম আমার ঘরে, কাশি আর অসহ্য মাথার যন্ত্রণা নিয়ে অনেকক্ষণ জেগে থাকতুম।

৪

চাকরিতে যোগ দেবার সপ্তা তিনেক পরে, সম্ভবত কোনো এক রোববারের সকাল বেলায় দরজায় ঘন্টি বেজে উঠলো। এগারোটা বাজেনি, অরলভ তখনও ঘুমিয়ে। আমি গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। দরজার সামনে অবগুণ্ঠিতা একজন মহিলাকে দেখে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

মহিলাটি জিগেস করলো, 'গ্রিগরি ইভানিচ কি ঘুম থেকে উঠেছেন?'

কণ্ঠস্বর শুনেই আমি চিনতে পারলুম ও জ্নামেনস্কি সরণির সেই ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা, যার কাছে আমি বহুবার চিঠি পৌঁছে দিয়েছি। আজ আমার মনে পড়ে না ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিতেও পেরেছিলুম কিনা, তবে এটুকু স্পষ্ট মনে আছে ওকে দেখে আমি রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। অবশ্য, সত্যি বলতে কি, আমার জবাবের ওর কোনো প্রয়োজনও ছিলো না। চোখের নিমিষে আমাকে পাশ কাটিয়ে, সারা ঘরে প্রসাধনের স্নিগ্ধ সৌরভ ছড়িয়ে ও ভেতরে প্রবেশ করলো। ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর আধ ঘন্টার মধ্যে আমি আর কিছুই

শুনিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার কে যেন ঘন্টি বাজালো। দরজা খুলে দেখলুম বেশ গুছিয়ে পোশাক পরা একটা মেয়ে, সম্ভবত সম্ভ্রান্ত কোনো পরিবারের ঝি, ওর সঙ্গে আমাদের বাড়ির দরোয়ানও রয়েছে। দুজনেই অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে, আর ওদের পায়ের কাছে নামানো রয়েছে বড় বড় দুটো তোরঙ্গ আর পোশাক রাখার একটা ঝুড়ি।

আমাকে দেখে মেয়েটি বললো, 'এসব আমি ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার জন্যে নিয়ে এসেছি।'

আর একটিও কথা না বলে মেয়েটা ফিরে গেলো। এইসব রহস্যময় ব্যাপার দেখে পলিয়া নিজের মনেই মুচকি মুচকি হাসলো। ওর ভঙ্গি দেখে এইটেই স্পষ্ট মনে হলো যেন বলতে চাইছে—'ও, তাহলে তলে তলে এইসব চলছে!' সারাক্ষণই ও পা টিপে টিপে হাঁটলো। শেষ পর্যন্ত আমরা পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম, ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা দ্রুত হলঘরে প্রবেশ করলো। দরজার সামনে আমাকে দেখতে পেয়ে বললো, 'স্তেফান, শিগগির গ্রিগরি ইভানিচের জামাকাপড়গুলো নিয়ে যাও।'

জামা-জুতো নিয়ে অরলভের ঘরে গিয়ে দেখলুম ভাল্লুকের চামড়ার কম্বলের নিচে থেকে পাদুটো বার করে সে বিছনার ওপর বসে রয়েছে। সমস্ত অবয়বে একটা বিব্রত ভাব। আমাকে সে লক্ষ্যই করলো না, যেন নিজের কাছেই সে নিজেকে লুকতে চাইছে। জামাকাপড় পরে হাত-মুখ ধুয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মাথায় চিরুনি চালাতে লাগলো। এমন কি পেছন থেকে দেখেও মনে হলো সে যেন নিজের ওপর খুবই ক্রুদ্ধ আর উদ্বিগ্ন, এবং নিজের অবস্থাটা স্পষ্ট উপলব্ধি করার জন্যে কিছুটা সময় হাতে নিতে চাইছে।

দুজনে মিলে একসঙ্গে কফি পান করতে বসলো। ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা নিজে হাতে অরলভের জন্যে কফি ঢেলে দিলো, তারপর টেবিলে কনুই রেখে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলো।

'সত্যি, আমার যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না! সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কেউ যখন শেষ পর্যন্ত কোনো সরাইখানায় এসে পৌঁছয়, তখন সে যেমন বিশ্বাস করতে পারে না আবার তাকে যাত্রা শুরু করতে হবে,

আমারও অবস্থা হয়েছে ঠিক সেই রকম। সত্যি, কি যে ভালো লাগছে!'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঝিনাইদা বাচ্চাদের মতো দুষ্টুমি ভরা চোখে হাসলো।

'আমায় তুমি মাফ করো ঝিনাইদা,' ওর দিকে তাকিয়ে অরলভ আস্তে আস্তে বললো। 'প্রাতরাশের সময় পড়ার অভ্যেসটা এখনও ছাড়তে পারিনি। তবে পড়া আর শোনা—দুটো কাজই আমি একসঙ্গে চালিয়ে যেতে পারি।'

'তাই করো সোনামণি তোমার স্বভাব আর স্বাধীনতায় আমি এতটুকুও বাধা দিতে চাই না। কিন্তু তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? রোজই সকালে এমন থাকো বুঝি, না কেবল আজকের জন্যে? আমি এসেছি বলে তুমি খুশি হওনি?'

'হুঁ, হয়েছি তবে সত্যি বলতে কি, আমি ঠিক এর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না।'

'কেন সোনামণি, প্রস্তুত হবার জন্যে তোমাকে তো অনেক সময় দিয়েছি? তোমাকে তো বহুবার বলেছি আমি যে কোনো দিন এসে পড়তে পারি।'

'হুঁ, তা অবশ্য বলেছো। কিন্তু আজই যে আসবে সেটা বুঝতে ঠিক পারিনি।'

'আমি নিজেও পারিনি সোনামণি। কিন্তু এ বেশ ভালোই হলো। নড়া দাঁত তুলে ফেলাই ভালো, তাই নয় কিনা বলো?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'তুমি যা-ই বলো, যার শেষ ভালো তার সব ভালো।' অস্তুত একটা আবেগে ওর চোখের পাতাদুটো মুদে আসে। 'কিন্তু এই মধুর পরিসমাপ্তিতে এসে পৌঁছতে আমাকে কি কষ্টটাই না পেতে হয়েছে। যদিও আমি খুব সুখী, তবু আমাকে হাসতে দেখে ভেবো না যেন আমি সত্যিই হাসছি। হাসার চেয়ে এখন আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। গতকাল তো রীতিমতো একটা লড়াই হয়ে গেলো। উঃ, একমাত্র ভগবানই জানেন আমি কি দুর্ভাগা! কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না, তাই আমি হাসছি।

জানো, এই যে তোমার সঙ্গে বসে কফি খাচ্ছি, মনে হচ্ছে এ সত্যি নয়, এ যেন স্বপ্ন।'

তারপর ঝিনাইদা বর্ণনা করে গতকাল কেমন করে স্বামীর সঙ্গে ওর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বলতে বলতে ওর সুন্দর টানাটানা চোখদুটো সজল হয়ে ওঠে, পরমুহূর্তেই অরলভের দিকে তাকিয়ে তা আবার চাপা হাসির ছটায় ঝিকমিক করতে থাকে। ওর স্বামী বহুদিন ধরেই ওকে সন্দেহ করছিলেন, কিন্তু কোনোদিন কৈফিয়ত চাননি। ওদের মধ্যে প্রায়ই মনোমালিন্য হতো, কিন্তু উত্তেজনার চরম মুহূর্তে ভদ্রলোক নীরব হয়ে গিয়ে তাঁর পড়ার ঘরে চলে যেতেন, পাছে অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর সন্দেহের কথা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে, কি বা অপ্রত্যাশিত ভাবে ঝিনাইদা নিজেই খোলাখুলি সব বলতে শুরু করে। এ সবকিছুর জন্যে অবশ্য ঝিনাইদার নিজেকেই নিজের কাছে অপরাধী বলে মনে হতো, কিন্তু বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাবের জন্যে ও এতদিন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কিন্তু গতকাল ভদ্রলোক যখন ঝগড়ার মাঝখানেই অসহায় আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠেন—'উফ্ ভগবান, কবে যে এর শেষ হবে,' ঝিনাইদা তখন ইঁদুরের পেছনে ছোটা বেড়ালের মতো। স্বামীকে অনুসরণ করে পড়ার ঘর পর্যন্ত আসে। সেখানে দাঁড়িয়ে বন্ধ দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে চিৎকার করে স্বামীকে বলে হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে সে ওঁকে ঘৃণা করে। তখন উনি দরজা খুলে ঝিনাইদাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেন। ঝিনাইদা ওঁকে সব কথা খুলে বলে, স্পষ্টই স্বীকার করে যে সে অন্য আর একজনকে ভালোবাসে এবং সেই ভদ্রলোকই তার প্রকৃত স্বামী। তাই যেখানে যা-ই ঘটুক না কেন, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে চলে যাওয়াই তার পক্ষে শ্রেয় এবং তার জন্যে যদি বুকে গুলি বেঁধে সেও ভালো।

'বাঃ, তোমার মধ্যে তো বেশ একটা অভিসারিণী-অভিসারিণী ভাব আছে।' খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই অরলভ ছোট্ট কোরে মন্তব্য করে।

কফির পেয়ালা স্পর্শ না করেই ঝিনাইদা হাসতে হাসতে কথা বলে চলে এবং মাঝে মাঝে বিব্রত চোখে পলিয়া আর আমার মুখের দিকে

তাকায়। ওর কথাবার্তা শুনে আমি বুঝতে পারি—ঝিনাইদা নয়, ওর স্বামীটিই এই ঘটনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

'হ্যা সোনামণি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি উত্তেজিত ছিলুম, ততক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু বেশ ভালোই চলছিলো। কিন্তু যত রাত বাড়তে লাগলো, আমি যেন ততই নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলম। 'হ্যাঁ গ্রিগরি, তুমি ভগবান মানো না, কিন্তু আমি মানি, আমি তাঁর শাস্তিকে ভয় পাই। ভগবান চান আমাদের ধৈর্য, উদারতা আর আত্মদান। অথচ আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না, নিজের খেয়ালখুশি মতো জীবনকে তুলে সাজাতে চাই। এটা কি ঠিক, বলো? ভগবানের দৃষ্টিতে এটা যদি অন্যায় হয়, তখন এ হবে? রাত দুটোর সময় আমার স্বামী আমার দোরে এসে বললে, 'তোমার সাহস তো কম নয়। পালালে তোমাকে আমি আবার পুলিস দিয়ে ধরে নিয়ে আসবো, তোমার নামে কুৎসা রটাবো।' আমি কোনো জবাব দিলুম না, দেখলুম আমার দরজার সামনে ও চুপচাপ ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু পরে মিনতির মতো করুণ স্বরে ও বললো, 'আমার কথাটা একবার ভেবে দ্যাখো। দোহাই তোমার, এভাবে পালিও না, এতে আমার চাকরির খুব ক্ষতি হবে।' ওর কথাগুলো আমার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো, আমার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় কঠিন হয়ে উঠলো। আমার মনে হলো ভগবানের শাস্তিদান বুঝি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গ্যাছে—ও যদি সত্যিসত্যিই আমাকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। ভয়ে আমি কেঁদে ফেললুম, ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলুম। একবার ইচ্ছে হলো নির্জন কোনো আশ্রমে চলে যাই, সুখের সমস্ত ভাবনা ছুঁড়ে ফেলে দিই, কিন্তু তখনই মনে পড়লো তুমি আমায় ভালোবাসো, তোমাকে না জানিয়ে নিজেকে কোথাও বিলিয়ে দেবার কোনো অধিকার আমার নেই। আমার মনের মধ্যে তখন সব তালগোল পাকিয়ে গ্যাছে, হতাশায় বেদনায় কি করবো না করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু একটু পরেই আকাশে সূর্য উঠলো, নিজেকে তখন অনেকটা সুস্থ মনে হলো, আমি যেন আবার সুখী হয়ে উঠলুম। সকাল হতে না হতেই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি সোনামণি। উঃ,

আমার ওপর দিয়ে কি ঝড়টাই না বয়ে গ্যাছে! দু রাত আমি ঘুমতে পারিনি!'

ঝিনাইদাকে সত্যিই খুব ক্লান্ত আর উত্তেজিত মনে হচ্ছে। দু চোখে ওর ঘুমের আবেশ, তবু অনর্গল কথা বলে চলেছে। কখনও হাসছে, কখনও বা কাঁদছে।

প্রাতরাশ শেষ করে দুজনে একসঙ্গে ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। 'না গ্রিগরি, তোমার এই বাড়িটা সত্যিই খুব আরামপ্রদ, কিন্তু আমাদের দুজনের পক্ষে বড্ড বেশি ছোট হবে বলে মনে হচ্ছে।' ঝিনাইদা আদুরে গলায় বায়না ধরে, 'আমাকে তুমি কোন্ ঘরটা দেবে সোনামণি? তোমার পড়ার ঘরের পাশেরটাই আমার সবচেয়ে পছন্দ '

বেলা একটা নাগাদ পড়ার ঘরের পাশের কামরায় গিয়ে ঝিনাইদা পোশাক পালটায়, কেননা তখন থেকেই ও ওটাকে নিজের ঘর বলে ভাবতে শুরু করেছে। তারপর অরলভের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের জন্যে বেরিয়ে পড়ে। নৈশভোজটাও সেরে আসে নামজাদা একটা রেস্তোরাঁ থেকে। এই দুই ভোজের মাঝের দীর্ঘ সময়টুকু ওরা বিভিন্ন দোকান ঘুরেফিরে নানান কিছু কেনাকাটা করে। অনেক রাত পর্যন্ত দোকানের ছোকরা মালবাহকদের জন্যে আমাকে বার বার দরজা খুলে দিতে হয়েছে। ওদের কেনাকাটা করা অজস্র জিনিসপত্রের মধ্যে ছিলো দু-পাশে ভাঁজ-করা ভারি চমৎকার একটা বড় আয়না, সাজগোজ করার একটা টেবিল, একটা খাট আর আমাদের যা আদৌ প্রয়োজন ছিলো না, রীতিমতো জমকালো একটা চায়ের সরঞ্জাম। মোড়ক খুলে চায়ের সাজ-সরঞ্জাম দেখেই পলিয়ার চোখ কপালে উঠে গেলো। আমার দিকে দু-তিন-বার ও এমন ভয়মিশ্রিত ঘৃণার চোখে তাকালো—যার অর্থ হলো এই সুন্দর চায়ের পেয়ালাগুলোর কোনোটা চুরি গেলে আমিই করবো, ও নয়। মেয়েদের লেখার অত্যন্ত দামী একটা টেবিলও এসেছিলো। এটা থেকে একটা জিনিস আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই বাড়িটাকে নিজের বাড়িতে পরিণত করার চেষ্টা করছে।

রাত নটায় ও অরলাভের সঙ্গে ঘরে ফিরে এলো। কিছুটা অবসন্ন আর নিদ্রাতুর দেখালেও, ঝিনাইদাকে দেখে মনে হলো ও যেন গভীর প্রেমে মজে রয়েছে। এই নতুন জীবনের জন্যে ঝিনাইদা সচেতনভাবেই গর্বিত এবং দীপ্তিময়তা উচ্ছ্বসিত। আনন্দের এই অভিব্যক্তিকে ধরে রাখার জন্যে ও ঠোঁট টিপে মুচকি মুচকি হাসে আর শপথ করে অরলভাকে সারা জীবন ভালোবাসবে। ওর এই শিশুসুলভ চপলতা দেখে মনে হলো যেন ওর বয়েস আরও পাঁচ বছর কমে গেছে।

'হাই বলো, মুক্তির চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কিছু নেই।' উচ্ছল আবেগে দারুণ দারুণ কথাগুলো ও বেশ সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে বললে। 'সত্যি, ভাবতেই কেমন যেন অবাক লাগে। আমরা যত বড় পণ্ডিতই হই না কেন আনন্দের মতামতের কোনো দাম নেই, অথচ কতকগুলো নির্বোধ লোকের মতামতের ভয়ে আমরা কাঁপি। কেননা লোকে কি বলবে সেই ভয়েই আমি এতদিন চুপ করে ছিলুম। কিন্তু যেই আমি মক্কেল বুঝিনে, কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলুম, আমার নিজের পথে এগিয়ে গেলুম, এখনই অন্তর দৃষ্টি খুলে গেলো, আমার অর্থহীন ভয়কে জয় করলুম। আজ আমি সত্যই সুখী সোনামণি, আমি চাই সবাই আমার মতো সুখী হোক।'

কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর ভাবনা অন্য দিকে মোড় নিলো। ও বড় একটা বাড়ি, দেওয়াল ঢাকার সুন্দর সুন্দর সব কাগজ, ঘোড়া গাড়ি আর সুইজারল্যাণ্ড কিংবা ইতালি ভ্রমণের কথা বলতে লাগলো। সারাদিন রেস্তোরাঁ আর দোকান ঘুরে ঘুরে অরলভ ক্লান্ত হয়ে গেছে। সকালে তার চোখে-মুখে যে অস্বস্তির ছাপ লক্ষ্য করেছিলুম এখনও তার রেশ রয়েছে। মাঝে মাঝে সে হাসছে বটে, কিন্তু যতটা না আনন্দের তার চাইতে অনেক বেশি নিয়মরক্ষার খাতিরে। যখনই ঝিনাইদা আন্তরিকভাবে কিছু বলছে, অরলভ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে ছোট্ট করে সায় দিচ্ছে, 'নিশ্চয়ই! তা তো বটেই!'

'না স্তেফান, শোনো,' ঝিনাইদা সরাসরি আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের একটা ভালো বাবুর্চি খুঁজে

বাস করতে হবে।'

'না না, রান্নাবান্নার ব্যবস্থার জন্যে এত তাড়াহুড়ো করবার কোনো দরকার নেই।' আমার দিকে হিম চোখে তাকিয়ে অরলভ বললো। 'আগে আমাদের আর একটা বাসার খোঁজ করতে হবে।'

এর আগে আমরা কখনও বাড়িতে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিনি বা ঘোড়াও রাখিনি, কেননা অরলভ এসব 'বিশৃঙ্খলা' পছন্দ করতো না। কেবল প্রয়োজনের খাতিরেই আমার আর পলয়ার উপস্থিতিকে সে সহ্য করে যেতো। রান্নাঘরের ব্যবস্থাকে সে অরুচিকর বলে মনে করতো। শিশু নিয়ে থাকা বা শিশুর জনক হওয়া কিংবা তাদের সম্পর্কে আলোচন করাটাকে সে নিতান্তই নগণ্য মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাব বলে মনে করতো। তাই আমি অবাক হয়ে ভাবলুম এ রকম অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা কেমন করে ঘরকন্না করবে। কেননা সংসারের সবকিছু নিয়ে ও যেমন সুন্দর একটা নীড়ের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, অরলভ তেমনি তার বন্ধুদের বলে বেড়াতে ভালোবাসে যে রুচিসম্পন্ন সুশৃঙ্খল কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি হবে ঠিক যুদ্ধ-জাহাজের মতো — সেখানে নারী, শিশু, রান্নাঘরের বাসন-কোসন বা ছেড়া ন্যাকড়ার মতো বাড়তি কোনো জিনিসপত্র থাকবে না।

৫

এবার পরের বৃহস্পতিবারের ঘটনাটা আপনাদের বলছি। সেদিন সন্ধ্যা বেলায় অরলভ একা ঘরে ফিরে এলো, ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা পিটার্সবুর্গে গিয়েছিলো। পরে আমি জানতে পেরেছিলুম প্রতি বৃহস্পতিবারে আমাদের বাড়িতে অতিথি সমাগম শুরু হবার আগেই ও পিটার্সবুর্গে ওর পুরনো গৃহ-শিক্ষিকার কাছে চলে যেতো। অরলভ তার বন্ধুদের সঙ্গে ওর পরিচয় না করিয়ে দেবার জন্যেই সকালে প্রাতরাশের সময় ওকে বুঝিয়েছিলো নিজের মানসিক প্রশান্তির জন্যেই ঝিনাইদার উচিত বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যেগুলো অন্য কোথাও কাটানো।

সেদিন প্রায় একই সময়ে যথারীতি অতিথি সমাগম শুরু হলো।

কুকুশকিন আমাকে চুপিচুপি জিগেস করলো, 'তোমার মনিবানিও কি ঘরে আছেন ?'

আমি বেশ বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দিলুম, 'না।'

ঠাণ্ডায় কালিয়ে যাওয়া হাতদুটো ঘষতে ঘষতে ও ধূর্তামি ভরা চোখে অদ্ভুত রহস্যময় একটা দৃষ্টি হেনে ভেতরে চলে গেলো। অনুগ্রহপ্রার্থীর মতো হাসতে হাসতে অরলভের কাছে গিয়ে বললো, 'আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করো অরলভ। লেবাননের চিরসবুজ দারুবৃক্ষের মতো তোমার সন্তানসন্ততির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাক।'

শোবার ঘরে এসে এক জোড়া মেয়েদের চপ্পল, দু' বিছনার মাঝে ঝোলানো কম্বল আর খাটের পায়ের দিকে রাখা একটা পোশাকের ঝুড়ি দেখে অতিথিরা অতিরিক্তমাত্রায় রসিক হয়ে উঠলো। প্রেমের চিরাচরিত ধারাগুলোকে যে মানুষ এতদিন নির্মমভাবে উপেক্ষা করে এসেছে আজ তাকে এত সহজে নারীর জালে ধরা পড়তে দেখে ওরা কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

'এতদিন যিনি অবজ্ঞাভরে অঙ্গুলি সংকেতে আদেশ দিতেন, আজ তিনি আভূমি নতজানু হয়ে অভিবাদনরত।' কুকুশকিন বেশ কয়েকবারই এই জাতীয় গুরুগম্ভীর ভাষা ব্যবহার করলো। শোবার ঘর থেকে পাশের পড়ার ঘরে যাবার সময় ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে সংকেত করলো, 'চুপ চুপ! এখানে গ্রেচেন এখন তার ফাউস্টের স্বপ্ন দেখছে!'

যেন দারুণ মজার কথা বলছে এমনি ভঙ্গিতে কুকুশকিন ক্রমাগত হেসেই চলেছে। আমি গ্রুঝিনকে লক্ষ্য করছিলুম, ভেবেছিলুম ওর সংগীতপ্রিয় মন বোধহয় এই হালকা রঙ্গ-তামাশাকে সহ্য করবে না, কিন্তু ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। ওর সুন্দর শীর্ণ মুখখানাকে বরং অবাধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলুম। সবাই যখন তাস খেলতে বসলো, গ্রুঝিন তখন চাপা ঠোঁটে হাসতে হাসতে বললো, 'না অরলভ, পারিবারিক আনন্দকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে গেলে চেরি কাঠের বাঁশি আর একটা গিটার দরকার।'

পেকারস্কির থমথমে গম্ভীর মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেলো অরলভের এই নতুন প্রেমঘটিত ব্যাপারে উনি খুবই উদ্বিগ্ন। সম্ভবত প্রকৃত ঘটনাটা

উনি আদৌ অনুধাবন করতে পারেননি। বার তিনেক বাজির পর উনি জিগেসই করে ফেললেন, 'আচ্ছা ওর স্বামীর খবর কি ?'

'আমি জানি না।' অরলভ জবাব দিলো।

ঘন দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে পেকারস্কি গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেলেন, নৈশভোজের আগে পর্যন্ত আর একটা কথাও বলেননি। খেতে বসে প্রতিটা কথা ওজন করে বেশ ভেবেচিন্তে বলতে শুরু করলেন, 'সত্যি বলতে কি, তুমি যেন আবার কিছু মনে কোরো না, তোমাদের দুজনের কাউকেই আমি বুঝতে পারছি না। হয়তো তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো এবং বাইবেলের সপ্তম প্রত্যাদেশকে যেমন খুশি লঙ্ঘন করতে পারো, কিন্তু তোমাদের এই গোপন অভিসারে স্বামীবেচারির কি ভূমিকা আমি সেইটেই বুঝতে পারছি না।'

'এখানে ওর কোথাও কোনো ভূমিকা নেই।'

'হুঁ, তা না হয় বুঝলুম।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পেকারস্কি তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবলেন। 'কিন্তু ধরো, আমি বিয়ে করলুম, অমনি তোমার মাথায় পোকা কিলবিল করে উঠলো যে তুমি আমার স্ত্রীকে চরিত্রভ্রষ্টা করবে। বেশ, করো, কিন্তু এমন ভাবে করবে যাতে আমার নজরে না পড়ে। এবং এই প্রতারণা কোনো লোকের পারিবারিক জীবন-কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া বা তার সুনামকে নষ্ট করার চাইতে অনেক বেশি সম্মানজনক, এ পর্যন্ত না হয় বুঝলুম। কিন্তু ধরো, তোমরা দুজনেই যদি ভেবে থাকো একসঙ্গে প্রকাশ্যে বসবাস করাটা অদ্ভুত একটা প্রগতি-শীল কিছু, আমি তোমাদের সঙ্গে আদৌ একমত নই···এটা নিতান্তই একটা স্বপ্নবিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

অরলভ চুপ করে থাকে। মেজাজ ভালো না থাকায় তার কথা বলার কোনো ইচ্ছেই ছিলো না। আঙুল দিয়ে টেবিলে তাল ঠুকতে ঠুকতে পেকারস্কি কি যেন ভাবেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'তোমার বুদ্ধিগোরটাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অরলভ। তুমি এখন আর স্কুলপড়ি ছাত্র নও, আর মেয়েটিও পোশাক তৈরি করে না। আর্থিক দিক দিয়ে তোমরা দুজনেই সচ্ছল। আমার পক্ষে এটা ভাবা অন্যায় হবে না

যে মেয়েটির জন্তে তুমি অন্ত একটা বাসার ব্যবস্থা করতে পারতে না।'

'না, পারতুম না। তুর্গেনিভ পড়েছো?'

'হ্যা। কিন্তু হঠাৎ তুর্গেনিভের প্রশ্ন এলো কেন?'

'তুর্গেনিভ তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই আমাদের শিখিয়েছেন প্রকৃত সৎ উন্নতমনা সব মেয়েই তার প্রেমিককে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করে এবং তার ইচ্ছেমতোই চলে।' ভ্রূ কঁচকে কিছুটা বিদ্রূপের স্বরেই অরলভ বলে ওঠে, 'অবশ্য পৃথিবীর শেষ প্রান্ত কথাটা এখানে কবির কল্পনা এবং তা ক্রমশ ছোট হতে হতে একটা গৃহকোণে এসে ঠেকেছে। তা বলে তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে তুমি অন্য কোনো বাসায় ঠেলে দিতে পারো না বা তার যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করতে পারো না। হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যে নয়, তুর্গেনিভের জন্যেই আজ আমাকে এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে।'

'কিন্তু তুর্গেনিভের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আমি সেটাই বুঝতে পারছি না' কাঁধ ঝাঁকিয়ে গ্রুঝিন বিস্ময় প্রকাশ করে। 'অবশ্য 'তিন সাক্ষাৎকার' উপন্যাসের সেইখানটা তোমার মনে পড়ে গ্রিগরি, যেখানে নায়িকাকে ইতালির কোনো পথ চলতে চলতে কানে ভেসে এসেছিলো, 'আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো'? এই জায়গাটা কিন্তু সত্যিই ভারি চমৎকার!'

'কিন্তু মেয়েটা তো আর জোর কোরে তোমার সঙ্গে থাকতে আসেনি, এসেছে তোমার ইচ্ছেতেই!' পেকারস্কি বাধা দেন।

'থামো থামো, খুব হয়েছে!' অরলভ চটে ওঠে। 'ইচ্ছে তো দূরের কথা, এমনটা যে ঘটবে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। মেয়েটা যখন এসে আমার কাছে থাকার প্রস্তাব করলো, আমি ভাবলুম ও বুঝি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে।'

তার কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

'সত্যি, বিশ্বাস করো, এমনটা যে ঘটবে আমি ভাবতেই পারিনি।' আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে অরলভ বলে চলে, 'আমি তুর্গেনিভের উপন্যাসের কোনো নায়ক নই, এবং বুলগেরিয়াকে স্বাধীন করার জন্তে কোনো

মহিলার সাহচর্যের প্রয়োজনও নেই। প্রেমকে আমি নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনের হাতিয়ার হিসেবেই দেখি। অবশ্য তাকে সুন্দর করে তোলার জন্যে আমি একটা মায়ার আবরণ দিয়ে ঘিরে রাখি, নইলে তা কোনো-দিনই আনন্দের হবে না, বেদনাটাই বড় হয়ে দেখা দেবে। সুন্দরী এবং মনোলোভা কি না আগে থেকে না জেনে আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবো না। না হলে পরস্পরকে ভালোবেসে সুখী হয়েছি ভেবে আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রবঞ্চনা করবো। হাত-মুখ না ধুলে বা মেজাজ ভালো না থাকলে আমি যেমন কারুর সঙ্গে দেখা করাটা পছন্দ করি না, তেমনি আবার চাঁড়ি কড়া বা এলোমেলো রুক্ষ চুলও পছন্দ করি না। সারা জীবন ধরে যা কিছু ঘৃণা করেছি, ঝিনাইদা ফিও-দ্রোভনা তার হৃদয়ের সরল মাধুর্য দিয়ে কামনা করেছে আমি যেন সেই সব ভালোবাসি। ও চায় আমাদের ঘর ধোয়ামোছা আর রান্নার গন্ধে ভরে উঠুক, আমরা অন্য কোনো বাসায় উঠে যাই এবং নিজেদের কেনা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াই। ও চায় আমার জামাকাপড়ের হিসেব রাখবে, আমার স্বাস্থ্যের ওপর খবরদারী করবে, অর্থাৎ প্রতি পদে আমার ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করবে···আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রতিজ্ঞাও করবে যে আমার অভ্যেস ও স্বাধীনতা কখনও ক্ষুণ্ণ হবে না। ও ধরেই নিয়েছে নব-পরিণীত দম্পতির মতো আমরা খুব শিগগিরই কোথাও মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যাবো—তার মানে ট্রেনে আর হোটেলে ও সারাক্ষণই আমার সঙ্গে থাকবে, অথচ ভ্রমণের সময় আমি সারাক্ষণই বই পড়তে ভালো-বাসি এবং রেলগাড়িতে পায়রার মতো বকবকম্ করাটা আমার আদৌ সহ্য হয় না।'

'তোমার উচিত এ প্রসঙ্গে সরাসরি ওর সঙ্গে কথা বলা।' পেকারস্কি পরামর্শ দেন।

'খেপেছো! তুমি কি ভাবো ও আমার কথা বুঝতে পারবে? আমাদের দুজনের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওর ধারণা কোনো পুরুষকে ভালোবাসার জন্যে বাবা-মা, এমন কি স্বামীকে পরিত্যাগ করাটাও গৌরবের, অথচ আমার কাছে ওটা ছেলেমানুষী। ওর ধারণা প্রেমে পড়ে কোনো পুরুষের

সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো নতুন একটা জীবনের সূচনা হওয়া, অথচ আমার কাছে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। ওর কাছে জীবনের প্রধান লক্ষ্যই হলো প্রেম আর পুরুষ। সম্ভবত এটা ওর অবচেতন মনেরই দর্শন। হাজার চেষ্টা করেও বোঝানো যাবে না যে প্রেম ভাত-কাপড়ের মতোই সাধারণ একটা দৈহিক প্রয়োজন, এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি বনিবনা না-ও হয় তাহলে পৃথিবী রসাতলে যাবে না। লম্পট অসচ্চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও কোনো মানুষ মহৎ এবং প্রতিভাবান হতে পারে, আবার অন্যদিকে প্রেমে ভরপুর হওয়া সত্ত্বেও সে মূর্খ নীচ হতে পারে। আজকালকার দিনের সভ্য মানুষ, এমন কি নিচু শ্রেণীর মানুষরাও, যেমন ফরাসী মজুররা তাদের দৈনিক আয়ের চার ভাগের দু ভাগ খরচ করে খাওয়ার জন্যে, এক ভাগ মদের জন্যে আর বাকি এক ভাগ মেয়েমানুষের জন্যে। কিন্তু ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা প্রেমের জন্যে ওটুকুও ভাগ করতে রাজি নয়, ও চায় সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতে। এ প্রসঙ্গে হয়তো আমি ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারি, কিন্তু প্রত্যুত্তরে বিলাপ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাবে না, কিংবা হয়তো শুনতে হবে আমিই ওর জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছি এবং ওর আর বেঁচে থাকার কোনো অর্থই হয় না।'

'ঠিক আছে, ওকে আর কিছু বলার দরকার নেই। ওর জন্যে স্রেফ একটা আলাদা ঘর ভাড়া করে দাও, তাহলেই হবে।' পেকার্বস্কি গম্ভীর স্বরে বললেন।

'মুখে বলা সহজ, কিন্তু '

'যাই বলো, মেয়েটাকে কিন্তু ভারি চমৎকার দেখতে!' কুকুশকিন নড়েচড়ে উঠলো। 'খাসা চেহারা। এইসব মেয়েরা সারা জীবন ভালো-বাসার কল্পনায় মশগুল হয়ে থাকে।'

'কিন্তু প্রত্যেকের ঘাড়ে তো একটা করে মাথা, না কি?' অরলভ রেগে ওঠে। 'প্রত্যেকেরই বিবেচনা বলে একটা জিনিস থাকে। বাস্তব অভিজ্ঞতা, এমন কি নাটক উপন্যাস থেকেও এটা খুব সহজেই বোঝা যায় —যে কোনো ভদ্র দুজন মানব-মানবীর মধ্যে ব্যভিচার বা যৌন-সম্ভোগ দু-তিন বছরের বেশি টিঁকতে পারে না, তা সে যত গভীর প্রেমই হোক

না কেন। এটা ওর বোঝা উচিত। তাই ঘরকন্না, শাশ্বত প্রেম বা মিলনের স্বপ্ন আমাদের দুজনেরই কাছে প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। ও যে আশ্চর্য রূপসী, কে তা অস্বীকার করছে? কিন্তু ও আমার জীবনটাকে সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে দিয়েছে। এতদিন আমার কাছে যা ছিলো তুচ্ছ অর্থহীন, সেগুলোকে ও একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে আমাকে ভাবাতে বাধ্য করিয়েছে। ও যে আশ্চর্য রূপসী, কেউ তা অস্বীকার করছে না। কিন্তু আমি যখন ঘরে ফিরতে চাই, যখন আমার খুব খারাপ লাগছে, তখন দেখি স্তূপাকার ইঁট দিয়ে কে যেন আমার রাস্তাটা বন্ধ করে রেখেছে। আসলে আমি প্রেমের জন্যে একটা কানাকড়িও খরচ করতে রাজি নই, অথচ আমার মানসিক শান্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গ্যাছে। এইটেই আমার সবচাইতে খারাপ লাগছে।'

'জিনাইদা ফিওদোরোভনা যে আমার মতো এই দুর্বৃত্তের কথা শুনবে না,' নাটকীয় ভঙ্গিতে কুকুশকিন বলে ওঠে। 'নইলে ওই অপূর্ব বস্তুটিকে ভালোবাসার কঠিন দায়িত্ব থেকে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারতুম। ওকে আমি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতুম।'

অরলভ শুকনো ঠোঁটে হাসে। 'যত খুশি ছিনিয়ে নাও, আমার কোথাও কোনো আপত্তি নেই।'

সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে কুকুশকিন হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর হাসির দমক একটু কমতে কপট ভঙ্গিতে বলে, 'ছাখো, আমি কিন্তু সত্যি বলছি। পরে তুমি যেন আবার ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় কোরো না!'

তারপরেই শুরু হয়ে গেলো প্রেমের ব্যাপারে কুকুশকিনের অদম্য উৎসাহ, মেয়েদের কাছে সে কেমন দুর্নিবার, স্বামীদের কাছে সে কি আতঙ্কের বস্তু, আর তার এই ভ্রষ্টামির জন্যে কেমন করে নরকের আগুনে পুড়ে মরতে হবে সে-সম্পর্কে সরস আলাপ-আলোচনা। ওরা সবাই যখন পরিচিত মেয়েদের নাম উল্লেখ করতে থাকে, কুকুশকিন তখন নিঃশব্দে ভ্রূ কুঁচকে কড়ে আঙুলটা এমন ভঙ্গিতে তুলে ধরে—যার অর্থ হলো, আর যাই করো বাপু, অপরের গোপন কথাটা যেন ফাঁস করে দিও না।

অরলভ ঘড়ির দিকে তাকায়।

তার বন্ধুরা এর অর্থ বুঝতে পারে এবং একে একে বিদায় নিতে শুরু করে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, কিছুটা মাতাল হয়ে পড়ায় শিশুদের গায়ের গন্ধওয়ালা কোটটা পরতে গ্রুঝিনের বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। তাছাড়া আপন মনে টেনে টেনে আবোলতাবোল কি যেন বকেও চলেছিলো, কিন্তু কেউ শুনছে না দেখে ও আমাকে টুপিটা খুঁজে দেবার জন্যে অনুরোধ করলো।

'আমার কথাটা ভেবে ছাখো গ্রিগরি,' আস্তে আস্তে অরলভকে ও বললো। 'তুমি বরং আমাদের সঙ্গে শহরের বাইরেই চলো।'

'তা হয় না গ্রুঝিন, আমার অবস্থা এখন বিবাহিত মানুষের মতন।'

'মেয়েটা খুব ভালো, ও একটুও রাগ করবে না। আরে চলো চলো! এমন চমৎকার আবহাওয়া, বাইরে তুষার পড়ছে···আসলে কি জানো, তোমার মেজাজ এখন বিগড়ে আছে, একটু ঝাঁকুনি খাওয়া দরকার। সত্যি, তোমার কাঁধে কি যে ভর করেছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না!'

হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে অরলভ পেকারস্কির দিকে তাকালো। একটু ইতস্তত করে সে জিগেস করলো, 'কি, তুমিও যাচ্ছো তো?'

'কি জানি, হয়তো যেতেও পারি।'

'আমার আর একটু মাতাল হওয়া দরকার। ঠিক আছে, চলো··· না, দাঁড়াও, কিছু টাকা নিয়ে আসি।' অরলভ উঠে পড়লো।

একটু পরেই সে আবার ফিরে এলো। 'নাঃ, কালই এই ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবো! ঝিনাইদা খুব ভালো মেয়ে, ও কিছু মনে করবে না।' তারপর খুশিতে হাসতে হাসতে সে পেকারস্কির পিঠে মুখ ঘষলো। 'সত্যি, আমার এই বিজ্ঞ বন্ধুটিকে বিস্কুটের মতো শুকনো খটখটে দেখতে হলে কি হবে, ও-ও মেয়েমানুষ পছন্দ করে···তাও আবার থলথলে মোটা মেয়েমানুষদের!'

লোমের কোটটা অরলভ গায়ে চড়িয়ে নিলো। 'চলো, এখনই বেরিয়ে পড়া যাক, না হলে আবার দরজার কাছেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

স্ফূর্তিতে গ্রুঝিন গুনগুনিয়ে উঠলো। তারপর গাড়ি নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়লো।

সে রাতে আর অরলভ ফিরে আসেনি, ফিরে এসেছিলো পরের দিন রাত্তিরে খাবার সময়।

৬

বাবার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া সোনার হাতঘড়িটা ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে। এই ক্ষতিতে ও বিস্মিত এবং সতর্ক হয়ে উঠলো। দিনের প্রায় অর্ধেকটাই ও সারা ঘর, দরজা-জানলা অসহায়ের মতো খুঁজে খুঁজে কাটিয়ে দিলো। কিন্তু আশ্চর্য, ঘড়িটা কোথাও পাওয়া গেলো না।

এর তিনদিন পরে ঘরে ফিরে ঝিনাইদা হলঘরে তার টাকাপয়সা রাখার ছোট ব্যাগটা ফেলে রেখেছিলো, সৌভাগ্যবশত সে সময়ে আমি বাইরে গিয়েছিলুম, পলিয়া ওকে পোশাক পালটাতে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ব্যাগটা কোথাও পাওয়া গেলো না।

'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!' ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়লো একরাশ স্তব্ধ বিস্ময়। 'আমার স্পষ্ট মনে আছে কোচোয়ানকে ভাড়া দেবার জন্যে আমি ব্যাগটা বার করেছিলুম···তারপর তো ওটা চশমার পাশে হলঘরের টেবিলে রেখে দিলুম। সত্যি, ভারি বিশ্রী ব্যাপার!'

আমি চুরি করিনি, তবু মনে হচ্ছিলো ওটা যেন আমিই চুরি করেছি এবং হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছি। সত্যিই দু চোখ আমার জলে ভরে উঠেছিলো।

রাত্তিরে খেতে বসে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা অরলভকে ফরাসীতে বললো, 'ভূতুড়ে এই বাড়িটাতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে। আজ সকালে টাকা-পয়সা রাখার ছোট ব্যাগটা আমি হলঘরে হারিয়ে ফেলেছিলুম, ওই গ্যাখো, এখন ওটা টেবিলে পড়ে রয়েছে। তবে যাই বলো, ভূতটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়। ওর মধ্যে থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা আর কুড়ি রুবলের নোটটা সরিয়ে রেখেছে।'

'তুমি তো সব সময়েই কিছু না কিছু হারাচ্ছো,' অরলভ বিরক্তি প্রকাশ করে। 'প্রথমে হারালে ঘড়িটা, আজ আবার টাকাপয়সা রাখার

ব্যাপটা। কই আমার তো কখনও কিছু হারায়নি।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই ঝিনাইদা চুরির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে হাসতে হাসতে বললো কেমন করে গত সপ্তায় একটা চিঠি লেখার জন্যে কিছু কাগজপত্রের ফরমাশ দেয় এবং সেখানে তার নতুন ঠিকানাটা দিতে ভুলে যায়। পরে দোকানি যখন কাগজপত্র পুরনো বাসায় পাঠিয়ে দেয়, স্বামী বেচারিকে তখন বারো রুবল গচ্চা দিতে হয়। হঠাৎ পলিয়ার ওপর চোখ পড়তেই ঝিনাইদা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে এবং এমন বিচলিত হয়ে পড়ে যে কি প্রসঙ্গে কথা বলছিলো সম্পূর্ণ ভুলেই যায়।

পড়ার ঘরে আমি যখন কফি নিয়ে ঢুকলুম, অরলভ তখন অগ্নিকুণ্ডের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো, আর ঝিনাইদা বসেছিলো তার মুখোমুখি অন্য একটা আরামকুর্শিতে।

'মেজাজ আমার আদৌ খারাপ নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে আমি এখন যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' দ্রুতভাবে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা ফরাসীতেই বলে চলে। 'ও কখন আমার ঘড়িটা চুরি করেছে আমি তোমাকে দিনক্ষণ পর্যন্ত বলে দিতে পারবো। আর টাকাটার ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহই নেই।' নিঃশব্দ ঠোঁটে হাসতে হাসতে ঝিনাইদা আমার হাত থেকে কফির পেয়ালাটা নামিয়ে নিলো। 'এখন আমি বুঝতে পারছি কেন আমার যখন-তখন রুমাল দস্তানা হারিয়ে যায়। তুমি যাই বলো, কালই আমি ওই বাচাল মেয়েমানুষটাকে দূর কোরে দেবো, স্তেফানকে পাঠাবো আমার সোফিয়াকে নিয়ে আসার জন্যে। সে ওর মতো এমন চোর নয়, আর তার চেহারাটাও অমন বীভৎস নয়।'

'তোমার মেজাজ এখন সত্যিই ভালো নেই। কাল যখন মন ভালো থাকবে, তখন বুঝতে পারবে কেবল সন্দেহের বশেই কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যায় না।'

'এটা সন্দেহ নয়, এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত। যতক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহ করেছিলুম, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছু বলিনি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না, এইটেই সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার।'

'কোনো ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হলো না বলেই যে তোমাকে অবিশ্বাস করি, এটা ঠিক নয়।' সিগারেটের টুকরোটা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে অরলভ ঘুরে দাঁড়ায়। 'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু তা নিয়ে এত উত্তেজিত হবার কোনো কারণ নেই। সত্যি বলতে কি, আমার অত্যন্ত সাধারণ এই ছোট্ট গৃহস্থালিও যে তোমাকে এমন ক্ষুব্ধ করে তুলবে আমি ভাবতেই পারিনি। একটা স্বর্ণমুদ্রা হারিয়েছো, তার বদলে আমি তোমাকে একশোটা স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি—কিন্তু তার জন্যে আমার অভ্যেসকে পালটাতে হবে, নতুন একজন ঝিকে কাজে ঢুকিয়ে সবকিছু না শিখে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এসব ধিক্কারজনক ব্যাপার আমার ধাতে সয় না। হ্যাঁ, আমাদের পলিয়া নিঃসন্দেহে একটু মোটাসোটা, এবং রুমাল বা দস্তানার ওপর হয়তো ওর কিছু দুর্বলতা থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু কাজকর্মে ও খুবই পটু, আর কুকুশকিন যখন ওকে চিমটি কাটে, ও কখনও চেঁচিয়ে হাট বসায় না।'

'তার মানে বলতে চাইছো তুমি ওকে ছাড়িয়ে দিতে পারবে না, এই তো?'

'কেন, তোমার হিংসে হচ্ছে?'

'হুঁ, তা হচ্ছে বইকি।'

'ধন্যবাদ।'

'সত্যিই আমার হিংসে হচ্ছে গ্রেগরি...' সজল চোখে ঝিনাইদা বললো। 'হয়তো তার চাইতেও খারাপ ...আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না। সত্যি, তোমরা পুরুষরা এমন ভয়ংকর!'

'এর মধ্যে ভয়ংকরতার কিছু নেই ঝিনাইদা।'

'নিজে চোখে আমি কখনও দেখিনি, ঠিক জানিও না, তবে শুনেছি পুরুষরা খুব অল্প বয়েস থেকেই বাড়ির ঝিদের সঙ্গে এসব শুরু করে। পরে এমন অভ্যেস হয়ে যায় যে এর জন্যে তাদের কখনো খারাপও লাগে না। তবে আমি সত্যিই জানি না গ্রেগরি, হয়তো বইয়েতেই পড়েছি...'

উঠে দাঁড়িয়ে ঝিনাইদা একান্ত অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, 'হয়তো আমার সত্যিই মেজাজটা আজ ভালো নেই। তবু তোমাকে বুঝতে হবে

গ্রিগরি···ওকে আমি ঠিক সহ্য করতে পারছি না, ও আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে···'

'ছোটোখাটো এইসব তুচ্ছতা তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে ঝিনাইদা।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে অরলভ অগ্নিকুণ্ডের পাশ থেকে সরে আসে। 'ওকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করো, দেখবে তখন আর খারাপ লাগবে না।'

পড়ার ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলুম, তাই ঝিনাইদা কি জবাব দিয়েছিলো শুনতে পাইনি। তবে পলিয়া রয়ে গেলো। এই ঘটনার পর থেকে ফিওদ্রোভনা ওকে আর কিছু করতে বলতো না, বরং পারতপক্ষে ওকে এড়িয়েই চলতো। পলিয়া যখন নিজে থেকে ওকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসতো, ওর চুড়ির ঠুং ঠাং শব্দ আর ঘাঘরার খস্ খস্ আওয়াজে ঝিনাইদা কেঁপে উঠতো।

আমার ধারণা পেকারস্কি কিংবা গ্রুঝিন যদি পলিয়াকে চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের কথা বলতো, অরলভ এতটুকু দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে ওকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতো। কেননা নির্লিপ্ত মানুষের মতো সহজেই সে অন্যের মতকে মেনে নিতো। কিন্তু ঝিনাইদার সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে, মাঝে মাঝে, এমন কি নিতান্ত তুচ্ছ কারণেও সে এমন জেদ প্রকাশ করতো যে অনেক সময় আমার কাছে তা অহেতুক মনে হতো। আমি আগে থেকেই বুঝে ফেলেছিলুম, ঝিনাইদার যদি কিছু ভালো লাগে, নিশ্চয়ই অরলভের তা পছন্দ হবে না। দোকান থেকে নতুন কিছু কিনে ও যখন সউৎসাহে অরলভকে দেখাতো, অরলভ উপেক্ষার ভঙ্গিতে তাকিয়ে নিরুত্তাপ গলায় বলতো, 'এইসব জিনিসের সংখ্যা যত বাড়াবে, ঘরের হাওয়া চলাচলের ততই অসুবিধে হবে।'

এমন ঘটনাও বহুবার ঘটেছে, হয়তো কোথাও যাবে বলে সাজগোজ করেছে, ঝিনাইদার কাছে বিদায় নেওয়াও হয়ে গেছে, কিন্তু হঠাৎ তার মত বদলে গেলো, নিছক খামখেয়ালিপনার জন্যেই ঘরে রয়ে গেলো। আমার ধারণা, নিজেকে ব্যথিত বোধ করার জন্যেই সে ঘরে বসে থাকতো।

'কেন তুমি মিছিমিছি ঘরে রয়ে গেলে বলো তো?' কিছুটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলেও, ঝিনাইদার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠতো এক্ষুর

একটা খুশির আমেজ। 'সন্ধ্যেবেলায় ঘরে বসে থাকা তো স্বভাব নয়, আর আমি চাই না আমার জন্যে তুমি তোমার স্বভাব বদলাও। মিছি-মিছি আমার ওপর রাগ না করে রোজ যেমন যাও আজও তেমনি বেড়িয়ে এসো।'

'কেউ তোমার ওপর রাগ করছে না।'

পড়ার ঘরের আরামকুর্শিতে বসে অরলভ অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করে, আর হাত দিয়ে রোদ আড়াল করার ভঙ্গিতে একটা বই মুখের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু একটু পরে বেড়াতে না বেরুনোর জন্যে তার নিজেরই খারাপ লাগে।

ত্রস্ত পায়ে পড়ার ঘরে ঢুকে ঝিনাইদা জিগেস করে, 'আমি কি ভেতরে আসতে পারি? কি পড়ছো? একা একা আমার খুব খারাপ লাগছিলো, তাই শুধু তোমাকে একটুখানির জন্যে দেখতে এলুম।'

মনে আছে, সেদিন সন্ধ্যেবেলায় অশান্ত পায়ে ভেতরে প্রবেশ করে ঝিনাইদা অরলভের পায়ের কাছে কম্বলের ওপর বসলো। ওর কোমল ভীরু ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই বোঝা গেলো ও অরলভের মেজাজটা আদৌ বুঝতে পারেনি এবং সে জন্যে ও রীতিমতো শঙ্কিত।

'সব সময় কি এত পড়ো বলো তো?' আবদারের সুরে, অরলভকে খুশি করার ভঙ্গিতে ঝিনাইদা বলে উঠলো। 'সত্যিই তুমি বুদ্ধিমান গ্রিগরি। তোমার এত বই, সব পড়ছো তুমি?'

অরলভ কোন জবাব দিলো না। নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত মনে হলো যেন সুদীর্ঘকাল। পড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলুম বলে আমি ওদের দুজনকে স্পষ্ট দেখতে পাইনি আর তখন আমার কাশতেও ভয় করছিলো।

'তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই গ্রিগরি, শুনবে?' চাপা ঠোঁটে ঝিনাইদা মুচকি মুচকি হাসলো। 'আমার কথা শুনে তুমি হয়তো হাসবে, ভাববে আমি আত্মপ্রশংসা করছি। তুমি জানো, আমি চাই…মানে, একান্তভাবেই আমি বিশ্বাস করতে চাই, আজ সন্ধ্যেবেলায় তুমি যে বাড়ি রয়ে গ্যালে সে শুধু আমারই জন্যে…আমরা দুজনে সন্ধ্যেটা একসঙ্গে

কাটাবো বলে। আমি কি তা ভাবতে পারি না গ্রিগরি, বলো?'

'নিশ্চয়ই, ভাবতে পারো বইকি।' চোখের ওপর থেকে বইটা না সরিয়েই অরলভ জবাব দেয়। 'সত্যিকারের সুখী সে-ই, যে শুধু যা আছে তা-ই ভাবে না, যা নেই তা-ও ভাবতে পারে।'

'এসব বড় বড় কথা বুঝতে পারি না গ্রিগরি। তার মানে তুমি কি বলতে চাইছো সুখী মানুষরা কেবল তাদের কল্পনার মধ্যেই বাস করে? হ্যাঁ, একদিক থেকে তা অবশ্য সত্যি। সন্ধ্যেবেলায় তোমার পড়ার ঘরে বসে আমার কল্পনাকে দূরদূরান্তে ভাসিয়ে দিতে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে···ভালো লাগে কখনও বা স্বপ্ন দেখতে। এসো না গ্রিগরি, আমরা দুজনে এক সঙ্গে স্বপ্ন দেখি।'

'আমি কখনও বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে থাকিনি, তাই ওই বিদ্যেটা আমার শেখা হয়নি।'

'তোমার মনটা কি আজ ভালো নেই গ্রিগরি?' অরলভের একটা হাত ঝিনাইদা নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নেয়। 'কি হয়েছে বলো তো? তোমাকে এমন দেখলে আমার ভীষণ ভয় করে। আমি বুঝতে পারছি না, তোমার মাথা ধরেছে, না তুমি আমার ওপর রাগ করেছো···'

আবার সুদীর্ঘ কয়েকটি মুহূর্তের নিটোল নিস্তব্ধতা।

'কেন তুমি এমন বদলে গ্যালে গ্রিগরি?' মৃদুভাবে ঝিনাইদা শুধায়। জামেনস্কি সরণিতে থাকার সময়ে তুমি তো কখনও এমন মনমরা ছিলে না? আজ প্রায় এক মাস তোমার এখানে এসে রয়েছি, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের জীবন যেন এখনও শুরুই হয়নি, যা বলার ছিলো যেন এখনও কিছু বলাই হয়নি। আমার প্রতিটা কথায় তুমি ঠাট্টা করো, নয়তো জ্ঞান দাও। আর তোমার ঠাট্টাগুলো পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্প্রাণ···কেন তুমি আমার সঙ্গে একটু ভালো করে কথা বলো না গ্রিগরি?'

'আমি তো সব সময়েই ভালো করে কথা বলি।'

'বেশ, তাহলে এখন বলো।'

'কি সম্পর্কে?'

'আমাদের জীবন, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।' ঘুমজড়ানো গলায়

ঝিনাইদা বলে ওঠে। 'আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে আমার যে কত পরিকল্পনা আছে, সে তুমি ভাবতেই পারবে না। কবে তুমি তোমার এই চাকরি ছেড়ে দেবে গ্রিগরি?'

ওর মুঠোর মধ্যে থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রিগরি অবাক চোখে তাকায়। 'কেন?'

'তোমার যা দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে ও চাকরি তোমার শোভা পায় না।'

'আমার দৃষ্টিভঙ্গি? বিশ্বাস আর মেজাজের দিক থেকে আমি নিতান্তই সাধারণ একজন কর্মচারী, শ্চেদ্রিনের উপন্যাসের সাদামাঠা একজন নায়ক। তুমিই বরং আমাকে অসাধারণ একটা কিছু ধরে নিয়েছো।'

'আবার ঠাট্টা করছো তো?'

'মোটেই না। হয়তো আমার চাকরিটা মনোমতো নয়, কিন্তু তা অন্য কিছু করার চাইতে অনেক ভালো। তা ছাড়া আমার অভ্যেস হয়ে গ্যাছে। এতে আমি আমার মতো মানুষদের সঙ্গে মিশতে পারি।'

'কিন্তু চাকরি করাটাকেই তো তুমি ঘৃণা করো গ্রিগরি।'

'তাই নাকি! ধরো চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আমি যদি সোচ্চারের স্বপ্ন দেখি আর অন্য একটা জগতে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে দিই, তুমি কি মনে করো চাকরির চাইতে সে পৃথিবীটা আমার কাছে কম ঘৃণ্য বলে মনে হবে?'

'তুমি আমার প্রতিটি কথা উপহাস করে উড়িয়ে দাও, বিদ্রূপ করো,' ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা ব্যথা পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। 'সত্যি, কথা বলতে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে।'

'তুমি কিন্তু মিছিমিছি রাগ করছো। প্রত্যেকেই তার সাধ্যমতো জীবন কাটাবার চেষ্টা করে।'

'কিন্তু তুমি যেভাবে চাও, তেমন করে কি জীবন কাটাতে পারছো? নিজের মতের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নতি স্বীকার করছো, ওপরওয়ালাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছো আর বাকিটা সময় তাস খেলে কাটাচ্ছো। সবচেয়ে বড় কথা, এমন এক ব্যবস্থার হয়ে কাজ করছো যা তোমার খুবই অপ্রীতিকর। না গ্রিগরি, না, এমন উৎকট আপোসে তুমি

শিশু হতে পারো না। এ ভয়ংকর। তুমি হলে একজন চিন্তাশীল মানুষ, তোমার উচিত কেবল নীতির জন্যে কাজ করে যাওয়া।'

হতাশ হয়ে অরলভ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'আমি প্রকৃত যা, তুমি কিন্তু তার থেকে আমাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখছো।'

'তার মানে স্পষ্টাস্পষ্টিই বলো যে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না। আমাকে তোমাব ভালো লাগে না, এই তো?' অশ্রুসজল চোখে ঝিনাইদা প্রশ্ন কবে।

'লক্ষ্মীটি শোনো,' কিছুটা চড়া স্ববেই অবলভ বলে ওঠে। 'তুমি তো নিজে মুখেই স্বীকাব কবেছো যে আমি লেখাপড়া-জানা একজন বুদ্ধিমান মানুষ, এবং তাকে শিক্ষা দিতে যাওযাটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। হ্যাঁ, যত বড় বা ছোটই হোক না কেন, আমি নিজস্ব একটা মনোভাব পোষণ কবি, এবং সেদিক থেকে তাস খেলাটা আমার খুবই পছন্দ। এ তো গ্যালো এক কথা, দ্বিতীয়ত, আমি যতটা জানি জীবনে কখনও তোমাকে চাকরি কবতে হয়নি। লোকের মুখে শুনে বা উপন্যাস পড়ে তুমি সবকারী চাকবি সম্পর্কে একটা মনগড়া ধারণা গড়ে নিয়েছো। তাই প্রথম থেকেই আমাদেব মধ্যে পাকাপাকি একটা বোঝাপড়া হয়ে গেলে ভালো হয় যে যেসব বিষয় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি কিংবা যে সব বিষয়ে আমরা কথা বলাব উপযুক্ত নই, সেসব বিষয়ে আমরা কখনও আলোচনা কববো না।'

'আমার সঙ্গে তুমি এভাবে কেন কথা বলছো গ্রিগরি?' যেন ভীষণ ভয় পেয়ে ঝিনাইদা দু পা পেছিয়ে আসে। 'দোহাই তোমার, কি বলছো, তুমি নিজে একবার ভেবে ছাখো।'

মৃদু কেঁপে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর। স্পষ্টই বোঝা যায় চোখের জল ঠেকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ও। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। অরলভের হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ফরাসীতে বলে, 'দুঃখে বেদনায় সমস্ত বুক আমার ভেঙে যাচ্ছে···আমি আর সহ্য করতে পারছি না গ্রিগরি। আমার শৈশব কেটেছে অসহ্য ঘৃণার মধ্যে, সৎ-মা আমাকে সহ্য করতে পারতো না, আমার স্বামীও না···আর এখন তুমি···তুমি

আমার গভীর ভালোবাসার প্রতিদান দিচ্ছো ব্যঙ্গের ছলে, নির্মম উদাসীন ভাবে···তাও কিনা ভয়ংকর জাঁহাবাজ একটা ঝিয়ের জন্যে।' ফুলে ফুলে ওঠা কান্নায় ঝিনাইদার গলার স্বর প্রায় বুজে আসে। 'হ্যাঁ গ্রিগরি, আমি খুব ভালো করেই জানি, তোমার স্ত্রী আমি নই, বন্ধুও নই—আমি কেবল একজন মেয়েমানুষ, তোমার রক্ষিতা, যার ওপর তোমার কোনো শ্রদ্ধা নেই। বেশ, আমি আত্মহত্যাই করবো।'

আমি কল্পনাও করতে পারিনি ওর চোখের জল অরলভের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করবে। রক্তিম হয়ে, কিছুটা বিব্রতভাবে সে চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো। ব্যঙ্গের পরিবর্তে তার চোখেমুখে ফুটে উঠলো কিশোরদের মতো আতংকজনিত একটা বিভ্রান্তি।

ওর মাথায় কাঁধে হাত বোলাতে বোলাতে অরলভ ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমাকে তুমি ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি। অন্যায় হয়েছে, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।'

'না না, আমিই বরং নানান অভিযোগ নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে তোমাকে অপমান করেছি। তুমি সত্যিকারের খাঁটি মানুষ···বিরল মানুষ—আমি জানি, তবু কয়েকদিন ধরে আমার এমন ভীষণ খারাপ লাগছিলো··'

আবেগভরে অরলভকে জড়িয়ে ধরে ঝিনাইদা তার গালে চুমু দেয়।

অরলভ বলে, 'দোহাই তোমার, তুমি শুধু কেঁদো না, লক্ষ্মীটি।'

'না না, আমি কাঁদছি না, এখন আমার খুব ভালো লাগছে।'

'আর পলিয়ার কথা বলছিলে ন্যা, কালই ও বিদায় নেবে।'

'না না, ও থাক। এখন আমি আর ওকে ভয় পাই না। তোমার কথাই ঠিক গ্রিগরি। এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামানোই ভালো। তুমি খুব ভালো গ্রিগরি!'

শিগগিরই ওর কান্না থেমে যায়। সজল চোখে অরলভের কোলের ওপর বসে আবেগবিধুর ভাষায় অনর্গল বকে চলে আর অরলভের হাত-খানা তুলে নিয়ে মুখে বোলায়, চুমু খায়, আংটিগুলো পরীক্ষা করে দেখে, ঘড়ির শেকলের সঙ্গে ঝোলানো কবচগুলো নাড়াচাড়া করে। শৈশব আর যৌবনের স্মৃতিচারণায় ও নিজেকে হারিয়ে ফেলে। চোখের জলে

যাকে জয় করেছে সেই ভালোবাসার মানুষের কাছে পেয়ে নিজেকে এখন ওর ভারমুক্ত মনে হচ্ছে, আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছে নারী-হৃদয়ের সরল মাধুর্য। অন্যদিকে অরলভ ওর বাদামী চুলের গুচ্ছ নিয়ে খেলছে, হাতটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁটের ওপব রাখছে, চুমু খাচ্ছে।

সেদিন ওরা দুজনে পড়ার ঘরেই বসে চা খেলো। জিনাইদা ফিওদ্রোভনা সুদীর্ঘ কয়েকটা চিঠি লিখে তা থেকে আবার খান কয়েক অরলভকে পড়ে শোনালো। তারপর অনেক রাত্তিরে ওরা শুতে গেলো।

সেদিন রাত্তিরে বুকের পাশটায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিলো, কিছুতেই ঘুমতে পারছিলুম না। পায়ের শব্দ শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম অরলভ শোবার ঘর থেকে পড়ার ঘরে চলে এলো। ঘণ্টাখানেক পরেই ঘন্টি বেজে উঠলো। অবসন্ন বেদনায় সমস্ত রীতিনীতি ভুলে আমি খালি পায়ে রাতের পোশাক পরেই গিয়ে হাজির হলুম পড়ার ঘরের সামনে।

অরলভ সেখানে দাঁড়িয়ে শোবার পোশাক পরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। রুক্ষ স্বরে সে বললো, 'যখনই তোমাকে ডাকা হবে, ঠিক-মতো পোশাক পরে হাজির হবে। যাও, কয়েকটা নতুন মোমবাতি নিয়ে এসো।'

সবে ক্ষমা চাইতে যাবো, হঠাৎ এমন প্রচণ্ড কাশি এলো যে দরজার চৌকাঠটা ধরে না ফেললে হয়তো পড়েই যেতুম।

অরলভ জিগেস করলো, 'তুমি কি অসুস্থ?'

আমার বিশ্বাস, এখানে আসার পর এই প্রথম সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করলো—কেন তা ভগবানই জানেন। সম্ভবত ঘরোয়া পোশাকে, কাশির দমকে বিকৃত হয়ে যাওয়া মুখে আমি হয়তো চাকরের ভূমিকায় ঠিকমতো অভিনয় করতে পারিনি।

'এতই যদি অসুস্থ, তা এখানে চাকরি করতে এলে কেন?' ভর্ৎসনার স্বরে সে ধমকে উঠলো।

'যেহেতু না খেয়ে মরতে চাই না, সেই জন্যে।' আমি আস্তে আস্তে জবাব দিলুম।

'উঃ, কি জঘন্য!' আপন মনেই বিড়বিড় করতে করতে সে টেবিলের

কাছে ফিরে গেলো।

ঘর থেকে তাড়াতাড়ি উর্দিটা পরে এসে আমি নতুন কয়েকটা মোমবাতি বসিয়ে জ্বালিয়ে দিলুম। নিচু একটা কুর্শিতে বসে নিবিষ্ট চিত্তে সে বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলো। এবার আর সন্ধ্যেবেলার মতো তার হাত থেকে বইটা খসে পড়লো না মেঝেতে।

৭

আজ আমি যখন এই কাহিনী লিখেত বসেছি, নিজেকে ভাবপ্রবণ বা হাস্যাস্পদ না করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তবে যখনই স্নেহ বা কোমল মাধুর্য দিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেছি, আদৌ বাস্তব করে তুলতে পারিনি। কেননা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বলতে আমার কিছুই ছিলো না, তাছাড়া মানসিক বিচ্ছিন্নতা সে সময়ে আমাকে প্রায় পঙ্গু করে তুলেছিলো।

না, জিনাইদা ফিওদ্রোভনার প্রেমে আমি কোনোদিনই হাবুডুবু খাইনি। কিন্তু ওর প্রতি আমার সহজাত মানবিক বোধ অরলভের ভালোবাসার চাইতে অনেক অনেক বেশি উজ্জ্বল আর গভীর ছিলো।

ভোর হতে না হতেই আমার কাজ শুরু হয়ে যেতো—জুতো পরিষ্কার করতুম, ঘর ঝাঁট দিতুম আর অধীর আগ্রহে সেই মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষা করতুম, কখন জিনাইদা ফিওদ্রোভনার কণ্ঠস্বর বা পায়ের শব্দ শুনতে পাবো। সকালে কফি বা দুপুরে খাবার সময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করা, হলঘরে ওর লোমের কোটটা এগিয়ে দেওয়া, জুতো পরিয়ে দেবার সময় আমার কাঁধে হাত রাখা, তুষার-ঝড় মাথায় নিয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বাইরে থেকে ফিরে এলে দরজা খুলে দেওয়া, কোচোয়ানদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য শোনা—আমার কাছে এসবের যে কি মূল্য কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো আমাকেও কেউ ভালোবাসুক, আমার নিজের স্ত্রী-পুত্র ঘর-সংসার থাকুক। মনে মনে কল্পনা করতুম আমার প্রিয়তমার মুখটাও ঠিক জিনাইদার মুখের মতো এমন দুর্লভ সুন্দর হোক, তার কণ্ঠস্বরটাও ঠিক ওর কণ্ঠস্বরের মতো আশ্চর্য মিষ্টি। রাত্তিরে খেতে খেতে, একা পথ

চলতে চলতে কিংবা নিদ্রাবিহীন রাতে বিছনায় ছটফট করতে করতে আমি এইসবই রঙিন স্বপ্ন দেখতুম। ছেলেপুলে, রান্নার সাজসরঞ্জাম, ঘর-সংসারের মেয়েলি খুঁটিনাটি, অর্থাৎ যেগুলোকে অরলভ দূরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতো, সেগুলোকেই আমি কোমল ভালোবাসার নিবিড় স্বপ্নে পরম মমতায় বুকের মধ্যে লালন করতুম। আমার স্বপ্ন ছিলো কেবল স্ত্রী, পুত্র আর ফুলের বাগানওয়ালা ছোট্ট একটা নীড়…

আমি জানি ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনাকে ভালোবাসলে উনি যে আমার প্রেমের যোগ্য প্রতিদান দেবেন এমন অলৌকিক কাণ্ড আমি কল্পনাও করতে পারতুম না। তবু আমি এসবই ভাবতুম। মামুলি ভালো লাগার মতো আমার শান্ত নির্লিপ্ত ভাবনায় অরলভের জন্যে ঈর্ষা বা পরস্ত্রীকাতরতার কোনো চিহ্নও ছিলো না। কেননা আমি খুব ভালো করেই জানি আমার মতো ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষের পক্ষে কেবল স্বপ্নেই সুখী হওয়া সম্ভব।

ঝিনাইদা যখন গ্রিগরির জন্যে রাতের পর রাত জেগে বিছনায় বসে থাকতো, একটাও পাতা না উলটিয়ে স্থির চোখে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতো, কিংবা হঠাৎ করে ঘরের ভেতর দিয়ে পলিয়াকে হেঁটে যেতে দেখে যখন থরথর করে কেঁপে উঠতো বা বিবর্ণ হয়ে যেতো, আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে বেদনা বোধ না করে পারতাম না। প্রতি বেসপতিবার অতিথি সমাগমের আসরে ওকে নিয়ে যেসব আলোচনা হতো, সেইসব কথা ওকে জানিয়ে দিয়ে নিজের মনের দূষিত ক্ষতটাকে উপশমিত করার দুর্মর একটা বাসনা আমাকে পেয়ে বসতো—কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব! প্রায়ই যে আমি ওকে কাঁদতে দেখতুম। অরলভ যখন ঘরে থাকতো না—প্রথম প্রথম ওকে হাসতে, আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতে দেখতুম। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো ও যেন ততই নিস্তব্ধ করুণ হয়ে উঠতে লাগলো।

অরলভকে ও তোষামোদ করতো, কৃত্রিম হাসি বা একটা চুম্বনের জন্যে তার পায়ে পড়তো, পোষা কুকুরের মতো সোহাগ করতে চাইতো। সারাটা মন যখন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতো, তখনও যেতে যেতে হঠাৎ আয়নার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে চুলটা অন্তত একবার আঁচড়ে না

দিয়ে পারতো না। আমি অবাক হয়ে ভাবতুম তখনও ও নিজের পোশাক-আশাক, কেনাকাটা নিয়ে কেমন করে বিভোর হয়ে থাকতো। মাঝে মাঝে মনে হতো ও বুঝি সত্যিকারের বেদনার্ত হয়নি। না হলে ও কেমন করে এত দামী দামী সব হাল ফ্যাশানের পোশাক তৈরি করাতে পারতো? বেশ মনে আছে, একবার ওর একটা পোশাকের দাম পড়েছিলো চারশো রুবল। মেয়েরা যখন সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে মাত্র কুড়ি কোপেক রোজগার করে, তখন সাধারণ একটা পোশাকের জন্যে কি করে চারশো রুবল খরচ করা সম্ভব কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকতো না। সম্ভবত ঝিনাইদা এ ব্যাপারে আদৌ সচেতন ছিলো না। তবু আমি চাইতুম ও বাইরে থেকে খানিকটা ঘুরে আসুক, আর আমি ফিরে এসে ওর ঘন্টি বাজানোর প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করি।

ও অবশ্য আমাকে একজন চাপরাসি হিসেবেই দেখতো, ভাবতো বুঝি নীচ বংশজাত। পোষা কুকুরটার দিকে না তাকিয়েই লোকে যেমন তাকে আদর করে, ও ঠিক তেমনি ভাবে আমার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করেই আমাকে প্রশ্ন করতো, হুকুম দিতো। একজন চাকরের সঙ্গে যতটুকু কথা বলা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি বলাটাকে আমার মনিব এবং মনিবানি দুজনেই অশোভন মনে করতো। সান্ধ্যভোজের সময় আমি যদি হাসতুম বা তাদের কথাবার্তায় যোগ দিতুম, ওরা আমাকে নির্ঘাত বরখাস্ত করে দিতো। তবু এদিক থেকে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা আমার প্রতি কিছুটা সুপ্রসন্ন ছিলো। ও যখন আমাকে বাইরে কোথাও পাঠাতো, নতুন কেনা মোমবাতি কেমন করে জ্বালাতে হয় শেখাতো বা ওই রকম একটা কিছু করতে বলতো, তখন ওর মুখটা কোমল আন্তরিকতায় ভরে উঠতো। ও তখন সোজা আমার মুখের দিকে তাকাতো। তখন হয়তো ওর জামেনস্কি সরণিতে আমার চিঠি বয়ে নিয়ে যাওয়ার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যেতো। এর জন্যে অবশ্য যখনই সদর-দরজার ঘন্টি বেজে উঠতো, পলিয়া আমাকে বিদ্রূপ করে বলতো, 'যাও যাও, তোমার 'পেয়ারের মনিবানি তোমাকে ডাকছেন।'

ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা আমাকে নীচ বংশজাত একজন সাধারণ

চাকর হিসেবে ভাবতো বটে, কিন্তু ও ধারণাই করতে পারতো না যে এ বাড়িতে ওর চাইতে অবমাননাকর অবস্থায় আর কেউ নেই। ও জানতো না, চাকর হয়েও আমি ওর জন্যে কত উদ্বিগ্ন, দিনে অন্তত কুড়ি বার নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন করতুম—ওর কি হবে, এর শেষ পরিণতি কোথায়? স্পষ্টতই অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। সেদিনের সেই ঘটনার পর অরলভ চোখের জল সহ্য করতে পারতো না। যখনই মতবিরোধ বা কান্নাকাটি শুরু হবার উপক্রম দেখতো—ওকে সে এড়িয়ে চলতো, নয়তো পড়ার ঘরে কিংবা বাইরে বেরিয়ে যেতো। ফলে একটু একটু করে বাড়িতে ঘুমনো বা খাওয়া-দাওয়া করা খুব কমিয়ে দিলো। প্রতি বৃহস্পতিবার সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে বন্ধুদের ভ্রমণ-অভিযানের প্রস্তাব দিতো। ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা কিন্তু তখনও ঘরে রান্নাবান্না করা, নতুন কোনো বাড়িতে উঠে যাওয়া আর বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে চলেছে। কিন্তু সে কেবল শুধু স্বপ্নই। ঘরে রান্নাবান্নার পরিবর্তে খাবার-দাবার আসতো রেস্তোরাঁ থেকে, বিদেশ থেকে ঘুরে আসার আগে নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়ার কথা অরলভ গায়েই মাখতো না, আর বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তাবে তার ছোট ছোট ছাঁটা চুলগুলো বড় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলতো। কেননা এরকম ছোট ছোট ছাঁটা চুল নিয়ে হোটেলে হোটেলে ঘোরাটা নাকি তার আদৌ পছন্দ নয়।

এর ওপর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, সন্ধ্যেবেলায় অরলভের অনুপস্থিতিতে কুকুশকিন যাতায়াত শুরু করলো। ওর ব্যবহারে অবশ্য আপত্তিজনক কিছুই ছিলো না, কিন্তু মাঝে মাঝে ওর কথাবার্তা শুনে বোঝা যেতো ও অরলভের স্থলাভিষিক্ত হতে চাইছে। কয়েক পেয়ালা পানীয় পেটে পড়ার পর উল্লসিত হয়ে ও প্রায়ই মজার মজার সব কথা বলতো, সদর্পে ঘোষণা করতো—আইনসংগত বিয়ের চাইতে স্বাধীন মিলন সব দিক থেকে উন্নত এবং প্রতিটা সৎ রুচিবান মানুষের উচিত ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়া।

৮

চরম দুঃখের আশংকায় বড়দিনটা কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার মধ্যেই কেটে গেলো। নববর্ষের আগের দিন প্রাতরাশের টেবিলে বসে অরলভ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘোষণা করলো একজন পরিষদ-সদস্যকে সাহায্য করার জন্যে তাকে অন্য একটা প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিরক্তির সুরে একটু জোর দিয়েই সে বললো, 'যাবার আমার কোনো ইচ্ছেই ছিলো না, কিন্তু না যাবারও কোনো অজুহাত খুঁজে পাচ্ছি না। ফলে না গিয়ে এখন আর কোনো উপায় নেই।'

খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার চোখদুটো সজল হয়ে উঠলো। চোখের পাতাদুটো নামিয়ে নিয়ে ও মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলো, 'অনেক দিনের জন্যে কি যেতে হবে?'

'দিন পাঁচেকের জন্যে।'

একটু চুপ করে থেকে ও কি যেন ভাবলো। 'তুমি যাচ্ছো বলে আমি খুব খুশি হয়েছি গ্রিগরি··সত্যি, দারুণ হবে! বলা যায় না, পথে হয়তো কারুর প্রেমেও পড়ে যেতে পারো, আর তখন ফিরে এসে আমাকে বেশ বলতে পারবে।'

প্রতিপদেই ও অরলভকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতো—ওর স্বাধীনতায় সে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে চায় না, ওর যা খুশি তাই করুক। কিন্তু নিপুণতাবিহীন এই মেয়েলি চাতুর্য অহেতুক ভাবেই অরলভকে স্মরণ করিয়ে দিতো যে সে স্বাধীন নয়।

'আমি কিন্তু আজ রাতের ট্রেনেই যাচ্ছি।' কথাটা বলে অরলভ আবার খবরের কাগজ পড়ায় মন দিলো।

ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা চেয়েছিলো তার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যেতে, কিন্তু অরলভই ওকে বাধা দিয়েছিলো, 'আমি তো আর আমেরিকায় যাচ্ছি না, কিংবা বছর পাঁচেকের জন্যেও নয়। যাচ্ছি মাত্র পাঁচদিনের জন্যে—হয়তো তার চেয়ে কমও হতে পারে।'

আটটার সময় ওরা দুজন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলো। অরলভ এক হাতে ঝিনাইদার কোমরটা জড়িয়ে ধরে ওর কপালে

ঠোঁটে চুমু দিলো।

'সত্যি, তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আমি যখন থাকবো না তখন যেন আবার মিছিমিছি মন খারাপ কোরো না।' এমন উষ্ণ আবেগবিধুর গলায় কথাগুলো সে বললো যে তার উত্তাপ আমাকেও স্পর্শ না করে পারলো না।

মুহূর্তের জন্যে ঝিনাইদা মুগ্ধ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন তার মুখের প্রতিটা রেখা ওর নিভৃত স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে চায়। অপলক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ও দু হাত দিয়ে অরলভের গলাটা মালার মতো জড়িয়ে ধরে তার বুকের মধ্যে মুখ লুকলো।

'তুমি আমাকে ক্ষমা করো গ্রিগরি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালো-বাসা থাকলে মাঝেমধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও হয়, তার জন্যে তুমি কিছু মনে কোরো না সোনামণি। আমি তোমাকে ভালোবাসি···সত্যিই পাগলের মতো ভালোবাসি '

কোনো কথা না বলে অরলভ ওর কপালে আর একবার চুমু দেয়, তারপর অভিভূতের মতো নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজার শব্দ শুনে সিঁড়ির মাঝখানে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, এমন বিহ্বল ভাবে ওপরের দিকে তাকালো, আমার মনে হলো ভেতর থেকে কোনো ডাক এলে সেই মুহূর্তে সে ফিরে যেতো। কিন্তু কোথা থেকে কোনো সাড়া এলো না। কোটটা ভালো করে বুকের ওপর টেনে দিয়ে আনমনে সে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেলো।

অনেকক্ষণ ধরে দরজার সামনে দুটো স্লেজ অপেক্ষা করছিলো। একটাতে অরলভ উঠলো, অন্যটাতে টিনের বড় দুটো বাক্স নিয়ে আমি উঠলুম। তখন বেশ ঘন তুষার পড়ছিলো, রাস্তার মোড়ে মোড়ে জ্বালানো আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছিলো। গাড়িটা দ্রুত ছুটে চলার ফলে হিমেল বাতাসের ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ছে আমার চোখে মুখে, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। চোখের পাতা বন্ধ করতেই ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার মুখটা স্পষ্ট ভেসে উঠলো, মনে হলো—সত্যিই ও কি চমৎকার, আর অরলভকে কি ভালোটাই না বাসে। আজকাল উঠোনে জমানো প্রতিটা

আবর্জনাকেও কোনো না কোনো কাজে লাগানো হচ্ছে, অথচ সত্যি-কারের প্রেমিক এমন দুর্লভ বিদুষী তরুণীর প্রতিভা কি ভীষণ অব-হেলাতেই না নষ্ট হচ্ছে। প্রাচীন কালে সমাজ-বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করতেন প্রতিটা অশুভ আবেগও একটা শক্তি, যাকে সুসংহত করতে পারলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়, আর আজকালকার দিনে আমাদের কত মধুময় উন্নত আবেগ ভুল বোঝাবুঝি বা নীচতার আবর্তে পড়েই না লীন হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হয়?

এক সময় হঠাৎ করেই স্লেজছুটো দাঁড়িয়ে পড়লো। আমি চোখ মেললুম, দেখলুম পেকারস্কি যেখানে থাকেন সারগিয়েভস্কি সরণির সেই বিরাট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। স্লেজ থেকে নেমে অরলভ বাড়িটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। মিনিট পাঁচেক পরে পেকারস্কির চাপরাসি খালি মাথায় আমার সামনে এসে হাজির হলো, তিরিক্ষি মেজাজে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'কালা নাকি, কানে শুনতে পাও না? গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ওপরে যাও। মনিব তোমাকে ডাকছেন।'

রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমি ওপরে গেলুম। এর আগেও আমি পেকারস্কির বাড়িতে এসেছি, তাই কাউকে জিগেস না করে সোজা হলঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বৈঠকখানার ভেতরে তাকালুম। আবছা আঁধারে তুষারঝড়ের মধ্যে দিয়ে এসে ঘরের ভেতরে দামী দামী সব আসবাবপত্র, ব্রোঞ্জের মূর্তি আর হাতে আঁকা উজ্জ্বল ছবিগুলো আমাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিলো। জমকালো সেই পরিবেশের মধ্যে আমি গ্রুজিন, কুকুশকিন আর অরলভকে দেখতে পেলুম।

'এই স্তেফান,' আমাকে দেখে অরলভ এগিয়ে এলো। 'আগামী শুক্কুর কিংবা শনিবার পর্যন্ত আমি এখানে থাকবো। যদি কোনো চিঠি বা তার আসে রোজ এখানে নিয়ে আসবে। বাড়িতে অবশ্য বলবে আমি চলে গেছি। ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো।'

ঘরে ফিরে এসে দেখলুম জিনাইদা ফিওদ্রোভনা বৈঠকখানার সোফায় শুয়ে নাশপাতি খাচ্ছে। মোমবাতির ঝাড়ে কেবল একটাই মোমবাতি জ্বলছে। আমাকে দেখে জিনাইদা জিগেস করলো, 'তোমরা ঠিক সময়ে

ট্রেনটা ধরতে পেরেছিলে তো ?'

'হ্যাঁ।'

আমি আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। তখন আর কিছু করার ছিলো না, পড়তেও ভালো লাগছিলো না। বিরক্তি বা অবাক, কোনোটাই হইনি। তবু ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলুম না—সত্যিই এই হঠকারিতার কোনো প্রয়োজন ছিলো কিনা। নিতান্ত অল্পবয়েসী ছেলে-ছোকরারাই তাদের রক্ষিতাদের ঠকাবার জন্যে এই ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নেয়। লেখাপড়া-জানা একজন চিন্তাশীল মানুষ কেন এর চাইতে উন্নত কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারলো না ? আর যাই হোক, অরলভের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমার কোথাও কোনো দ্বিধা ছিলো না। ইচ্ছে করলে সে অনায়াসেই কোনো মন্ত্রী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিকে প্রতারিত করতে পারতো, কিন্তু একজন নারীকে প্রতারিত করার পেছনে সে প্রথমে যা ভেবেছিলো তা-ই যথেষ্ট। যদি সফল হতো তো ভালো, না হলেও কোনো ক্ষতি ছিলো না—মিথ্যের ওপর খুব সহজেই আর একটা মিথ্যে চাপিয়ে দিতে পারতো, এতে মানসিক শক্তির কোনো অপচয় হতো না।

মাঝরাতে চেয়ার-টেবিল টানাটানির শব্দে সবাই যখন নববর্ষকে স্বাগত জানাচ্ছিলো, আমি তখন পড়ার ঘরের পাশের ঘর থেকে ঘন্টি বাজানোর শব্দ শুনতে পেলুম। গিয়ে দেখলুম ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা টেবিলের সামনে বসে কি যেন লিখছে।

আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'ওকে একটা তারবার্তা পাঠাবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টেশনে গিয়ে তুমি এটা ডাকঘরে দিয়ে এসো।'

রাস্তায় নেমে আমি কাগজখানা পড়ে দেখলুম :

"নববর্ষ তোমার নিঃসীম সুখের হোক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে তার কোরো সোনামনি। তোমার অভাবে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন কত যুগ তুমি আমার কাছে নেই। চিঠিতে আমার হৃদয়, আমার হাজারো উষ্ণ চুম্বন পাঠাতে পারলুম না বলে সত্যিই আমার দুঃখের অন্ত নেই। যেখানেই থাকো না কেন, উজ্জ্বল আনন্দ আর সুখে

থেকো সোনামনি।

—ঝিনা।"

তারবার্তাটা পাঠিয়ে দিয়ে আমি ফিরে এলুম, পরের দিন ভোরে রসিদটা দিলুম ওর হাতে।

৯

অরলভের হঠকারিতার সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনা হলো, এই আত্মগোপন করার ব্যাপারটা সে পলিয়াকে জানতে দিয়েছিলো, কেননা তার কামিজ-গুলো সে ওকে সারগিয়েভস্কি সরণিতে পৌঁছে দেবার কথা বলেছিলো। এর পর থেকে ও এমন বিদ্বেষপূর্ণ উল্লাস আর ঘৃণার চোখে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার দিকে তাকাতো যার কারণ আমি বুঝতে পারতুম না। সারাক্ষণই ও যেন নিজের খুশিতে উপচে উঠতো।

মাঝে-মধ্যে ও আমাকে প্রায়ই বলতো, 'মেয়েটার বোঝা উচিত ছিলো, তার সোহাগের দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গ্যাছে।'

ইতিমধ্যেই মেয়েলি বুদ্ধি দিয়ে পলিয়া আন্দাজ করে নিয়েছে যে ঝিনাইদা আমাদের মধ্যে আর বেশিদিন নেই, এবং যাতে এই সুযোগ হাতছাড়া না হয়ে যায়, সেইজন্যে ও সুগন্ধি নির্যাসের শিশি, কচ্ছপের খোলের তৈরি চুল আটকাবার ক্লিপ, সুন্দর কাজ করা রুমাল, জুতো—যা চোখে পড়ছে তা-ই সরিয়ে ফেলতে শুরু করেছে।

নববর্ষের পরের দিনই ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা আমাকে ওর নিজের ঘরে ডেকে চাপাস্বরে বললো যে কালো পোশাকটা ও খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর ভয়ে বেদনায় ম্লান হয়ে ও এঘর ওঘর খুঁজতে শুরু করলো।

এক সময়ে হতাশ হয়ে বললো, 'নাঃ, সব কিছুর একটা সীমা থাকে। এ ঔদ্ধত্য একেবারেই অসহ্য!'

রাত্তিরে খেতে বসে ও নিজেই ঝোল তুলে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু হাত কাঁপতে থাকায় তা আর পারে না। অসহায়ের মতো ছোট ছোট কড়াইশুঁটির দানাগুলোর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে, কাঁপুনিটা থেকে

যাবার আশায় অপেক্ষা করে। হঠাৎ পলিয়ার ওপর চোখ পড়তেই ওর ঠোঁটদুটো মৃদু কেঁপে ওঠে। 'ঠিক আছে পলিয়া, তুমি এখন যেতে পারো। স্তেফান একাই পারবে।'

'আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।' প লয়া সাদামাঠা গলায় জবাব দেয়।

'তোমার এখানে থাকার কোনো দরকার নেই, তুমি একেবারেই বেরিয়ে যাও।' উত্তেজনায় ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা উঠে দাঁড়ালো। 'অন্য কোথাও চাকরি দ্যাখো· ·যাও, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।'

'মনিবের হুকুম ছাড়া আমি কোথাও যেতে পারি না। উনি আমাকে এখানে এনেছেন, ওঁর হুকুম দরকার।'

ঝিনাইদা রাগে রাঙা হয়ে উঠলো 'তুমি আমার কাছ থেকেও হুকুম নিতে পারো। আমি এ বাড়ির কর্ত্রী '

'হয়তো আপনি কর্ত্রী, কিন্তু একমাত্র মনিবই আমাকে বরখাস্ত করতে পারেন।'

'আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়াবে না·· বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' প্লেটের ওপর ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও চিৎকার করে উঠলো। 'তুমি চোর, তুমি মিথ্যেবাদী। কি বললুম, শুনতে পেয়েছো?'

খাবার ছোট তোয়ালেখানা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ও দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলো। বিলাপের মতো সুরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কি সব যেন বলতে বলতে পলিয়াও খাবার-ঘর ছেড়ে চলে গেলো। রেস্তোরাঁ থেকে আনা মুরগীর মাংসের ঝোল আর দামী দামী সব খাবার টেবিলে পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হতে লাগলো।

'ইশ, কত দেমাক···উনি আবার বাড়ির কর্ত্রী হয়েছেন!' পলিয়ার ঘর থেকে আমি ওর গজগজানি শুনতে পেলুম। 'ইচ্ছে থাকলে অনেক আগে আমিও ওঁর মতো কর্ত্রী হতে পারতুম, কিন্তু আমার নিজের একটা আত্মসম্মানবোধ আছে। ঠিক আছে, দেখি আমাদের মধ্যে কাকে আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়!'

ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার ঘর থেকে ঘণ্টি বেজে উঠলো। গিয়ে দেখি

ঘরের এক কোণে ও এমন ভাবে বসে রয়েছে যেন কেউ ওকে শাস্তি দিয়েছে।

আমাকে দেখে জিগেস করলো, 'আমার নামে কোনো তারবার্তা আসেনি?'

'না।'

'দরোয়ানকে জিগেস করে এসো কোনো তারবার্তা এসেছে কিনা। আর শোনো, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেও না যেন। আমার একা থাকতে ভয় করছে।'

তার পর থেকে প্রায় এক ঘণ্টা অন্তর দরোয়ানের কাছে গিয়ে জিগেস করে আসতে হয়েছে কোনো তারবার্তা এসেছে কিনা। স্বীকার করতে আপত্তি নেই, তখন ওর সত্যিই ভয়ঙ্কর একটা দুঃসময় চলছে। পলিয়াকে এড়িয়ে চলার জন্যে ও খাওয়াদাওয়া আর চায়ের ব্যবস্থা সব নিজের ঘরেই গুছিয়ে নিয়েছে। প্রথম প্রথম ওর তারবার্তাগুলো আমিই ডাকঘরে দিয়ে আসতুম, কিন্তু তার জবাব না পেয়ে ও আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললো, তার পর থেকে ওগুলো ও নিজে হাতে পাঠাতে শুরু করলো। ওর বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে আমিও মনে মনে তারবার্তার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতুম। অবলভের ঘটে যদি আর একটু বুদ্ধি থাকতো, অন্য কোনো স্টেশন থেকেও সে একটা তারবার্তা পাঠাতে পারতো। তাস বা অন্য কোনো মেয়ের মোহে সে যদি এতই মত্ত থাকে, গ্রুজিন কিংবা কুকুশকিন অন্তত তাকে একটু মনে করিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু আমাদের সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

দিনে অন্তত পাঁচবার আমি জিনাইদা ফিওদ্রোভনার সঙ্গে দেখা করে ওকে সত্যি ঘটনাটা বলতে চেয়েছি, কিন্তু হরিণের মতো ছলছল দুটো চোখ, নুয়ে-পড়া কাঁধ আর কেঁপে-ওঠা নরম ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে আমি একটা কথাও বলতে পারিনি। মমতা আর সহানুভূতি যেন আমার সমস্ত মানবিকতাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। পলিয়া আগেরই মতো উল্লসিত, যেন কিছুই ঘটেনি। সযত্নে ও মনিবের ঘরদোর গুছিয়ে রাখে, পেয়ালা-পিরিচ পরিষ্কার করার সময় অহেতুক শব্দ করে, জিনাইদা ফিওদ্রোভনার

ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় খুক খুক করে কাশে আর আপন মনে কি সব যেন বিড়বিড় করে। বাড়ির কর্ত্রী যে ওকে এড়িয়ে চলে এতে ও খুশি। সন্ধ্যেবেলায় ও যেন কোথায় যায় আর রাত দুপুরে এসে ঘণ্টি বাজায়। ওর জন্যে রোজ রাত্তিরে আমাকেই দরজা খুলে দিতে হয়। একটু পরেই আবার অন্য একটা ঘন্টির শব্দ শুনে আমি পড়ার ঘরের পাশের ঘরে ছুটে যাই, দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা জিগেস করে, 'কে ঘণ্টা বাজালো?' মুখে বললেও ওর চোখ থাকে আমার হাতের দিকে কোনো তারবার্তা আছে কিনা দেখার জন্যে।

তারপর এক শনিবার নিচের তলায় যখন ঘন্টি বেজে উঠলো, সিঁড়িতে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ও আনন্দের আতিশয্যে কেঁদেই ফেললো। দৌড়ে এসে অরলভকে দু হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো, তার চোখে মুখে কপালে পাগলের মতো চুমু দিতে দিতে অস্পষ্ট স্বরে কি সব যেন বললো। বাড়ির দরোয়ান বড় বড় টিনের বাক্সদুটো ওপরে নিয়ে এলো, পলিয়ার উল্লসিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, যেন দীর্ঘদিন ছুটি কাটিয়ে কেউ ঘরে ফিরে এসেছে।

'তুমি আমায় তার করোনি কেন?' আবেগ-উচ্ছল স্বরে ঝিনাইদা জিগেস করে। 'এ কটা দিন যে আমার কি কষ্টের মধ্যে কেটেছে, সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না।'

'একদম সময় পাইনি···এত কাজের ঝামেলা···রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর তোমাকে আমি সব বুঝিয়ে বলবো সোনামণি। এখন ক্লান্তিতে ঘুমে দু চোখের পাতা আমার জুড়ে আসছে।'

সারা রাত সে যে ঘুমোয়নি এটা কিন্তু স্পষ্ট, হয়তো তাস খেলেছে আর পড়ে পড়ে মদ গিলেছে। ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা নিজে হাতে তার বিছনা করে দিলো, আর আমরা সারাটা দিন পা টিপে টিপে এঘর ওঘর করলুম। সান্ধ্যভোজ বেশ ভালো ভাবেই শেষ হলো। কিন্তু পড়ার ঘরে বসে কফি পানের সময় শুরু হলো কৈফিয়তের পালা। ফরাসীতে দ্রুত বলে চলা ঝিনাইদার উত্তেজিত শব্দগুলো আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি, কিন্তু অরলভের গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ আমার কান

এড়িয়ে যায়নি।

'হা ভগবান! সামান্য একজন বাড়ির ঝি···আর তার সেই পুরনো বস্তাপচা কাহিনী ছাড়া তোমার কি এখন নতুন কিছুই বলার নেই?'

'কিন্তু সোনামণি, আমি হলফ করে বলতে পারি ও আমার দামী কালো পোশাকটা চুরি করেছে, আমাকে অনেক অপমানকর কথা বলেছে।'

'কিন্তু কই, ও তো আমার কোনো জিনিস কখনও চুরি করেনি বা আমাকে অপমানকর কথা বলেনি? কেননা আমি চাকরবাকরদের দিকে কখনও নজরই দিই না। আসলে কি জানো, তুমি বড্ড খেয়ালী, নিজের মনকে কখনও বোঝার চেষ্টা করোনি। আমি যখন ওকে বরখাস্ত করতে চাইলুম, তুমি ওকে রাখার জন্যে জেদ করলে·· আবার এখন আমাকে বলছো ওকে তাড়িয়ে দিতে। তোমার মাথার রোগ সারাবার জন্যে আমি চাই ও এখানেই থাকুক।'

'বেশ, থাক্। এ নিয়ে আমি আর কিচ্ছু বলবো না।' ঝিনাইদা মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলো। 'তুমি বরং এখন মস্কোর কথা বলো।'

১০

পরের দিন সাতই জানুয়ারি, সেণ্ট জন দিবস। নামকরণের দিনে বাবাকে অভিবাদন জানাবে বলে অরলভ তার কালো পোশাকে সুন্দর করে সাজগোজ করলো, বুকে পদক ঝোলালো। যেতে হবে দুটোয়, দেড়টা থেকে সে সেজেগুজে বসে রইলো। এখন এই আধঘণ্টা সে কি করবে? বৈঠকখানায় পায়চারি করতে করতে ছেলেবেলায় সে বাবা-মাকে যে সব অভিনন্দনসূচক ছড়া শোনাতো, সেগুলোই মনে করার চেষ্টা করলো।

ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা সবে দর্জির 'দোকানে কোনো কিছু কেনা-কাটা করবে বলে বেরুচ্ছিলো, অরলভকে ওই ভাবে একা একা পায়চারি করতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ওদের দুজনের মধ্যে কি ভাবে কথা-বার্তা শুরু হয়েছিলো আমি ঠিক জানি না, তবে রীতিমতো মিনতিভরা সুরে তাকে বলতে শুনলুম, 'দোহাই তোমার, নিতান্ত সাধারণ একজন

মেয়েমানুষও যা জানে, সেসব কথা আমাকে আর কখনও শোনাতে এসো না। আমাদের দাম্পত্য কর্মসূচীর মধ্যে থেকে যদি এসব বাদ দিতে পারো, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।'

'তার মানে তুমি কি বলতে চাও, মেয়েদের নিজস্ব কোনো মতামত থাকবে না?'

'নিশ্চয় থাকবে। তার জন্যে যত খুশি স্বাধীনতার প্রয়োজন তুমি নিতে পারো। কিন্তু একটা কথা, আমার সামনে দুটো জিনিস সম্পর্কে কখনো আলোচনা করবে না—এক, উঁচু শ্রেণীর দুর্নীতি সম্পর্কে, দুই, বিবাহ প্রথার ক্ষতি সম্পর্কে। কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে উঁচু শ্রেণীর বিরোধ চিরকালই আছে। দুটো শ্রেণীকেই আমি ঘৃণা করি। তবু আন্তরিক ভাবে যদি কোনো শ্রেণীকে বেছে নিতে বলা হয়, আমি নির্দ্বিধায় উঁচু শ্রেণীকেই বেছে নেবো। এর মধ্যে মিথ্যে বা ছলনার কোনো ব্যাপার নেই কেননা ওদের সঙ্গেই আমার রুচির কিছুটা মিল আছে। আমাদের জগৎ নিঃসন্দেহে অন্তঃসারশূন্য আর ফাঁপা, তবু আমরা স্বচ্ছন্দে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে পারি, পড়াশোনা করি, কথায় কথায় কারুর পাঁজরায় ঘুষি চালাই না। অথচ কৃষক আর কৃষক শ্রেণীর লোকেরা ঠিক শুঁড়িখানার মাতালদের মতো সব সময় হৈ-হল্লা করে।'

'কিন্তু কৃষক আর শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাই তোমাদের খাওয়ায়।'

'তাতে কি এসে গেলো? সে ত্রুটি তো ওদেরও। ওরা আমাদের খাওয়ায় আবার আমাদের দেখলেই টুপি খুলে সেলাম জানায়। অর্থাৎ প্রতিভা বলতে যা বোঝায়, তার কোনো বালাই নেই ওদের। আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না বা প্রশংসা করছি না, দু শ্রেণীর লোকেরাই সমান পাজি। তবু আমার রুচি টানে উঁচু শ্রেণীর লোকদের প্রতি বেশি। আর বিয়ে করা সম্পর্কে,' অরলভ আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর আবার বলতে শুরু করে, 'এতদিনে তোমার নিশ্চয়ই বোঝা উচিত ছিলো যে এর মধ্যে ক্ষতিকর কিছু নেই। আসল কথা হলো, তুমি এর মধ্যে থেকে কি চাও? বৈধ বা অবৈধ, ভালো বা মন্দ, কিংবা যে কোনো রকমের সম্বন্ধের মধ্যে বাস্তবতা একই। ওই মূলগত বাস্তবতার জন্যেই মেয়েরা

বেঁচে থাকে, ওইটেই তাদের কাছে সব। এ ছাড়া তোমাদের অস্তিত্বের কোনো মূল্য নেই। অথচ উপন্যাস পড়ে পড়ে তোমরা এমন চঞ্চল আর বেপরোয়া হয়ে গ্যাছো, যে যখন-তখন পুরুষ পালটাও, আর এই খামখেয়ালিপনাকে যথার্থ প্রতিপন্ন করার জন্যে তোমরা বিয়ে করার ক্ষতি সম্পর্কে নানা রকম কথা বলতে শুরু করো। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রকৃত শত্রু সম্পর্কে সচেতন হচ্ছো, অশুভ শক্তির খোলাখুলি নিন্দে করতে পারছো—ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার কেনা গোলামের মতো অনুগত হয়ে থাকবে। ফলে এসব নিয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। আমাকে তুমি যা-ই বলো না কেন, সেটা মিথ্যে, কৃত্রিম…এবং আমি তোমাকে তখন আদৌ বিশ্বাস করবো না।'

দরোয়ানের কাছে জানতে গিয়েছিলুম স্লেজ এসেছে কিনা, ফিরে এসে দেখি রীতিমতো ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। নার্বিকি ভাষায় যাকে বলে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে।

'বুঝতে পেরেছি, আজ তুমি ঘৃণা দিয়ে আমাকে আঘাত করতে চাইছো।' পারচারি করতে করতে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা রুদ্ধ আবেগে বলে ওঠে, 'তোমার কথা শুনে আমি সত্যিই মর্মাহত হয়েছি। তবু কারুর কাছে আমার অনুতাপ করার কিছু নেই। স্বামীকে ছেড়ে তোমার কাছে চলে এসেছি, এ জন্যে আমি গর্বিত। আমার সম্মানের নামে শপথ করে বলছি, এ জন্যে আমি সত্যিই গর্বিত।'

'বেশ, তা না হয় হলো। তারপর?'

'সত্যিকারের সৎ মানুষ হলে তুমিও গর্বিত হতে পারতে। আমি যা করেছি তুমি তা করতে পারলে হাজার হাজার মানুষের ঊর্ধ্বে উঠতে পারতে, কিন্তু পারোনি তোমার কাপুরুষতার জন্যে। মুক্তিকে তুমি কোনোদিনই আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করোনি। মানুষের যে অকৃত্রিম অনুভূতি, তাকে তুমি চিরদিনই উপহাস করেছো, পাছে কোনো নির্বোধও তোমার আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করে। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিতে তুমি ভয় পাও, আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরুতে তুমি লজ্জা পাও…বলো, কথাটা সত্যি নয়? কেন তুমি

এত দিনেও তোমার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে না?'

'এতই যদি ইচ্ছে থাকে, যাও, তুমি নিজে গিয়ে ওঁর সঙ্গে পরিচয় করো গে যাও। প্রতিদিন সকাল বেলায় দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত উনি সবার সঙ্গে দেখা করেন।'

'সত্যিই তুমি নীচ!' হতাশায় জিনাইদা ফিওদ্রোভনা নিজের হাত মোচড়ায়। 'যদিও জানি তুমি আদৌ আন্তরিক নও, এবং মনে মনে যা ভাবো কোনোদিনও তা মুখে বলো না, তবু এই নিষ্ঠুরতার জন্যে আমি তোমাকে ঘৃণা করি গ্রেগরি। সত্যিই তুমি ভীষণ নীচ!'

'আমরা কেবল ঘুরপাকই খেয়ে চলেছি, প্রকৃত লক্ষ্যকেন্দ্রে এসে পৌঁছতে পারছি না। পারছি না যেহেতু তুমি গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছো আমি একজন নায়ক এবং ভাবাদর্শের দিক থেকে একজন অসাধারণ কেউ। কিন্তু পরে দেখলে যে আমি একজন সাধারণ কর্মচারি, জুয়াড়ি, আদর্শের কোনো বালাই নেই। গলিত যে সমাজের অন্তঃসারশূন্য সংকীর্ণতা দেখে তুমি বিরক্ত হয়ে পালিয়ে এসেছো, আমি সেই সমাজেরই একজন যোগ্য প্রতিনিধি। আমার ওপর মিছিমিছি রাগ না করে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত ব্যাপারটাকে যাচাই করে দেখার চেষ্টা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে ভুলটা আমার নয়, ভুলটা তোমার।'

'হ্যাঁ, স্বীকার করছি, আমারই ভুল হয়েছে।'

'বেশ, নিজে মুখে যখন স্বীকার করলে, তখন আমাদের লক্ষ্যকেন্দ্রে পৌঁছবার জন্যে তোমাকে আরও কয়েকটা কথা বলি—আমি নীচ, তুমি আমার স্তরে নেমে আসতে পারো না, কেননা তুমি মহীয়সী। তাই তোমার সামনে এখন একটিই মাত্র পথ খোলা আছে…'

'কি ব-ল-লে!' রুদ্ধ শ্বাসে কথাটা বলেই জিনাইদা ফিওদ্রোভনা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেলো।

'আমি শুধু তর্কশাস্ত্রের সাহায্য নেবার কথাই বলছি…'

'কেন, কেন, কেন তুমি আমাকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছো, গ্রেগরি?' বেদনার্ত গলায় জিনাইদা বলে উঠলো। 'আমার দুঃখের কথাটা একবার ভেবে দেখার…'

চোখের জলের ভয়ে অরলভ তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে চলে গেলো, এবং কেন জানি না…হয়তো ওকে আরও বেশি কষ্ট দেবার জন্যে, কিংবা এসব ক্ষেত্রে বুঝি এমনটাই করতে হয় ভেবে সে ঘরের ভেতরে ঢুকেই ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। ঘাঘরায় মৃদু স্পন্দন তুলে জিনাইদাও তার পেছন পেছন চিৎকার করতে করতে ছুটলো।

'এসবের অর্থ কি? তাহলে মনে মনে তুমি এইটেই চেয়েছিলে?' দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে জিনাইদা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে। 'তাহলে তোমাকে এটাও বলে রাখি—আমি তোমাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি! আজ থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলো।'

বিক্ষিপ্ত হাসির সঙ্গে মেশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠা একটা কান্নার ধ্বনি আমার কানে এলো। বৈঠকখানার টেবিল থেকে একটা কাচের গেলাস মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে ঝন ঝন শব্দে ভেঙে গেলো। অন্য একটা দরজা খুলে অরলভ চারদিকে করুণ চোখে তাকিয়ে দেখলো, তারপর হাঁটু-অব্দি-লম্বা গাবদা কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা পার হয়ে গেলো, ওর কান্না থামলো না। আমি যতটা জানি, ওর বাবা-মা বা অন্য কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। ওকে এখানে থাকতে হচ্ছে এমন একজন পুরুষের সঙ্গে যাকে ও ঘৃণা করে, তার ওপর আছে পলিয়া, যে ওকে লুটেপুটে শেষ করে দিচ্ছে। আমার মনে হলো—সত্যিই, কি নিঃসঙ্গ ওর জীবন। জানি না কেন, বৈঠকখানায় আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখি চূর্ণ কুন্তল, কমনীয় লাবণ্যের সমস্ত সৌন্দর্য উজাড় করে দিয়ে এক বিষণ্ণ প্রতিমার মতো ও দু হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

কিছুক্ষণ ওই ভাবে চুপচাপ তাকিয়ে থাকার পর আমি চোরের মতো নিঃসাড়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এলুম। সে রাতে ও মুহূর্তের জন্যেও দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি।

অরলভ ফিরে এলো পরের দিন রাত্তিরে খাবার সময়। দুজনের মধ্যে আবার মিটমাট হয়ে গেলো।

পরের ব্রেস্পতিবার অরলভ বন্ধুদের কাছে জানালো, 'উঃ, কি দুঃসহ জীবন! আসলে এভাবে বেঁচে থাকাটা কোনো বাঁচাই নয়, এ এক কঠিন শাস্তি। চোখের জল, বিলাপ, বুদ্ধিদীপ্ত কিছু সংলাপ, ক্ষমা চাওয়া, তার পরেই আবার সেই চোখের জল আর বিলাপ! এক কথায় বলতে গেলে এখন আমার আর নিজের কোনো ঘর নেই। আমি নিজে যেমন বিধ্বস্ত, মেয়েটার অবস্থাও ঠিক সেই রকম। এভাবে চলা অসম্ভব, তবু এর মধ্যেই আমাকে থাকতে হবে।'

'তাহলে ওকে সব খুলে বলো না কেন?' পেকারস্কিই প্রথম উপদেশ দিলেন।

'চেষ্টা তো করেছি, কিন্তু পারিনি। স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী একজন মানুষের কাছে সত্যি কথাটা সাহস করে বলা যায়। কিন্তু যে দুর্বল, যার নিজস্ব কোনো চিন্তাধারা নেই, চরিত্র নেই, যে কোনো যুক্তি মানে না তাকে কিছু বলা না-বলা দুই-ই সমান। চোখের জল আমি সইতে পারি না, কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়ি ও যখন কাঁদে, বাধ্য হয়ে আমি শাশ্বত প্রেমের শপথ করি, কখনও কখনও আমি নিজেই কেঁদে ফেলি।'

সম্ভবত প্রকৃত ব্যাপারটা পেকারস্কি কিছুই বুঝতে পারেননি। তাই বিহ্বল ভঙ্গিতে কপালটা দু আঙুলে টিপতে টিপতে বললেন, 'ওর জন্যে তুমি একটা আলাদা ঘর ভাড়া করে দিলেই পারতে। সেইটেই বরং সব চেয়ে সহজ হতো।'

'হতো না!' অরলভ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'ও ঘর চায় না, ও চায় আমাকে। কিন্তু এখন আর এসব বলে কি লাভ, এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ নেই। এ যেন কোনো দোষ না করেই দোষী হবার মতো অবস্থা। আর যাই হই, উপন্যাসের নায়ক হবার শখ আমার কোনো কালেই ছিলো না···তুর্গেনিভের উপন্যাস আমার একদম সহ্য হয় না। অথচ এখন আমার ঘাড়ে সেইটেই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে ওকে আমি বহুবার বলেছি, ও কিন্তু বিশ্বাস করেনি। কি জানি, হয়তো আমার মধ্যে নায়কত্বের কোনো লক্ষণ আছে।'

কুকুশকিন হাসতে হাসতে বলে, 'তুমি বরং এক কাজ করো, প্রদেশ

সফরের জন্যে আবার বেরিয়ে যাও।'

'হুঁ, ঠিক বলেছো। এখন দেখছি আমার জন্যে ওই একটাই মাত্র পথ খোলা আছে।'

এই ঘটনার এক সপ্তা পরে অরলভ ঘোষণা করলো পরিষদ-সদস্যের সঙ্গে আবার তাকে প্রদেশ সফরে বেরুতে হবে। সেই দিনই সন্ধ্যেবেলায় সে তার বাক্স-পেঁটরা নিয়ে পেকার্‌স্কির বাড়িতে উঠে গেলো।

১১

ঘন্টি বাজার শব্দে দরজা খুলে দেখলুম মাথায় কান-ঢাকা টুপি, গায়ে পা-পর্যন্ত-লম্বা লোমের দামী কোট-পরা বছর ষাটেকের এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাকে দেখে উনি সন্তর্পণে জিগেস করলেন, 'গ্রেগরি ইভানিচ কি ঘরে আছে?'

আমি প্রথমে ভেবে ছিলুম ভদ্রলোক বোধহয় মহাজন কিংবা গ্রুঝিনের কোনো পাওনাদার। মাঝে মাঝে ওরা অরলভের কাছে টাকা চাইতে আসে। কিন্তু বৃদ্ধ যখন হলঘরে এসে কোটটা খুলে ফেললেন, ওঁর বুকের কাছে দু সারি তারকাচিহ্ন, ঘন ভ্রূ আর আশ্চর্য লক্ষণীয় সেই পাতলা চাপা-ঠোঁট দেখে আমি ওঁকে চিনতে পারলুম। ছবিতেও ওঁকে বহুবার দেখেছি। উনি হলেন সেই প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, অরলভের বাবা।

আমি জানালুম গ্রেগরি ইভানিচ এখন ঘরে নেই। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক পাতলা ঠোঁটদুটো শক্ত করে চেপে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আমাকে ভেতরে নিয়ে চলো, আমি একটা চিঠি লিখে রেখে যাবো।'

আমি ওঁকে পড়ার ঘরে নিয়ে গেলুম। টেবিলে বসে কলমটা তুলে নেবার আগে মুহূর্তের জন্যে উনি কি যেন ভাবলেন। চোখের ওপর হাত রেখে ওঁর চিন্তা করার ভঙ্গিটা ঠিক ছেলেরই মতো। ধর্মভীরু লোকদের মতো ওঁর মুখেও ম্লান একটা বিষাদের ছাপ। পেছন থেকে জানালার

সামনে দাঁড়িয়ে আমি ওঁর টাক-পড়া মাথা আর ঘাড়ের কাছের ভাঁজ-গুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম। এটা আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে দুর্বল লোকটা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। এখন আমি আর আমার শত্রু ছাড়া এ ঘরে আর কেউ নেই। সামান্য একটু বলপ্রয়োগ করলেই কাজ হাঁসিল হয়ে যাবে। তারপর ঘড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলে কেউ কিচ্ছু জানতে পারবে না। এ বাড়িতে চাকরের কাজ নিয়ে যতটা সফল হবো ভেবেছিলুম, এতে তার চাইতে অনেক বেশি লাভবান হবো। এমন দুর্লভ সুযোগ বড় একটা আসে না। কিন্তু কিছু না করে আমি উদাস চোখে ওঁর টাকের দিকে তাকিয়ে রইলুম, আর তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগ-লুম—ক্ষমতাবান ধনী এই মানুষটার সঙ্গে তাঁর ছেলের প্রকৃত সম্পর্ক কি।

লিখতে লিখতে মুখ না তুলেই উনি জিগেস করলেন, 'তুমি কি আমার ছেলের এখানে অনেক দিন ধরে কাজ করছো ?'

'না হুজুর, মাস তিনেক হলো এখানে কাজ করছি।'

চিঠি লেখা শেষ করে উনি উঠে দাঁড়ালেন। এখনও সময় আছে। হাতের মুঠো শক্ত করে আমি নিজেকে প্রস্তুত করলুম, চেষ্টা করলুম বুকের অতল থেকে অতীতের গভীর ঘৃণাটাকে টেনে হিঁচড়ে বার করে আনতে। স্মরণ করার চেষ্টা করলুম এই কিছু দিন আগেও ওঁর বিরুদ্ধে কি তীব্র অসহ্য ঘৃণাই না পোষণ করতুম…কিন্তু এবড়োখেবড়ো পাথরে দেশলাইয়ের কাঠি ঘষা যায় না। বৃদ্ধের এই বিষণ্ণ ম্লান মুখ, নিষ্প্রভ তারকাচিহ্ন দেখে আমার কেমন যেন করুণাই হলো, মনে হলো এই সব যাকিছু পার্থিব, এমন কি মৃত্যুও কত তুচ্ছ…

'ঠিক আছে, আমি এখন চলি ভাই।' টুপিটা তুলে নিয়ে বৃদ্ধ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

নিঃসন্দেহে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এলো, আমি কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেলুম। মনকে বোঝাবার জন্যে আমি অতীতের কথা-গুলো স্মরণ করতে লাগলুম, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্বস্তিবোধ

আমাকে ঘিরে ধরলো, যেন আমি ভুল করে কোনো অন্ধকার গুহায় উঁকি মেরেছি। তখনই আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কথা মনে পড়লো। প্রথমেই মনে হলো যদি ওদের কারুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় আমি লজ্জায় মরে যাবো। সত্যি, আমি কত পালটে গেছি! এখন আমি কি করবো, কি করা উচিত, কোথায় যাবো, কিসের জন্যে বেঁচে আছি—কিছুই বুঝতে পারলুম না।

তবে একটা জিনিস আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে আমাকে তল্পিতল্পা গোটাতে হবে। বৃদ্ধ এ বাড়িতে আসার আগে পর্যন্ত আমার চাকর হয়ে থাকার একটা অর্থ ছিলো, কিন্তু এখন তা অসম্ভব। দুঃসহ একটা যন্ত্রণায় আমার দু চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, অথচ বাঁচার কি দুর্মর আকাঙ্ক্ষা! আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে মানুষের পক্ষে যাকিছু পরম রমণীয় তাকেই আমি দু হাতে আঁকড়ে ধরতে চাই। আমি কথা বলতে চাই, পড়াশোনা করতে চাই, বড় কোনো কারখানায় হাতুড়ি চালাতে চাই, কিংবা নিজের জমিতে হাল চালাতে। সমুদ্র আর উন্মুক্ত প্রান্তর আমার স্বপ্ন, কল্পনায় যত দূর সম্ভব আমি ঘুরে বেড়াতে চাই। ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা যখন বেড়িয়ে ফিরে এলো, আমি দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলুম, অসীম মমতায় ওর গা থেকে লোমের কোটটা খুলে নিলুম। এই শেষ বার।

বৃদ্ধ ছাড়া সেদিন আরও দুজন অতিথি এসেছিলো। সন্ধ্যেবেলায় আঁধার ঘনিয়ে ওঠার পর গ্রুঝিন এসেছিলো অরলভের জন্যে কিছু কাগজপত্র নিয়ে যেতে। টেবিলের টানা খুলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ভাঁজ করে আমার হাতে দিয়েছিলো হলঘরে তার টুপির পাশে ওগুলো রেখে দেবার জন্যে, তারপর গিয়েছিলো ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার সঙ্গে দেখা করতে। মাথার নিচে হাত রেখে ও তখন বৈঠকখানার সোফায় শুয়ে ছিলো। পাঁচ ছ দিন হয়ে গেছে অরলভ সফরে বেরিয়েছে, কেউ জানে না কবে ফিরবে। এবার আর ঝিনাইদা তাকে কোনো তারবার্তা পাঠায়নি, তারবার্তা পাবে এমনটা আশাও করেনি। পলিয়া এখনও আমাদের সঙ্গে রয়েছে, অথচ ওর উপস্থিতি ও যেন সম্পূর্ণ ভুলেই

গেছে। ওর বিষণ্ণ ম্লান মুখ দেখে মনে হলো যেন বলতে চাইছে—'যা হবার হোগ্‌গে! অরলভের মতো ও যেন অসুখী হবার জন্যেই জেদ ধরে বসে আছে। নিজেকে কষ্ট দেবার জন্যেই দিনের পর দিন সোফায় রাত জেগে কাটিয়েছে, যেন জীবনে অশুভ ছাড়া ও আর কিছুই ভাবতে পারছে না। হয়তো অরলভ ফিরে এলে তার সঙ্গে অবহেলা ও অবিশ্বস্ততা প্রসঙ্গে আবার কেমন করে ঝগড়া বাধাবে বা বিচ্ছিন্ন হবে, সেই সব কথা ভেবেই মনে মনে কিছুটা তৃপ্তি পাচ্ছে। কিন্তু ও যদি কখনও প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায় তখন কি বলবে?

অভিবাদন জানিয়ে ওর হাতে চুমু দিয়ে গ্রুঝিন বললো, 'আমি আপনাকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে এলুম ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা। সত্যি, আপনি এত ভালো, অথচ গ্রেগরিটা আপনাকে ফেলে পালিয়ে গেলো। উজবুক আর কাকে বলে!'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রুঝিন ওর পাশে বসলো, তারপর ওর নরম হাতখানা নিয়ে মৃদু নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

'আমাকে ঘণ্টাখানেক আপনার কাছে কাটাতে দিন, লক্ষ্মীটি। আমি এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে চাই না। তাছাড়া বিরসভদের বাড়িতেও এখন যাওয়া যায় না, আজ ওদের বাড়িতে কাতিয়ার জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। সত্যি, মেয়েটা ভারি চমৎকার!'

আমি চা এনে দিলুম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে পান করলো। তারপর গেলাসটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নম্রভাবে বললো, 'আমাকে কিছু খেতে দিতে পারো? আজ সারাদিন আমার খাওয়া হয়নি।'

ঘরে কিছুই ছিলো না, তাই রেস্তোরাঁ থেকে গ্রুঝিনের জন্যে সস্তা কিছু খাবার কিনে নিয়ে এলুম।

ভদকার গেলাসটা তুলে নিয়ে সে বললো, 'আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্যে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা।' খানিকটা পান করে ভদকার গেলাসটা সে আবার নামিয়ে রাখলো, তারপর লোভীর মতো গোগ্রাসে গিলতে লাগলো। মাঝে মাঝে ছোট ছেলের মতো প্রথমে ঝিনাইদা পরে আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলো যে আমি যদি ঝোল বা জেলির

পাত্রটা না এগিয়ে দিই হয়তো সে কেঁদেই ফেলবে। খিদের ভাবটা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো এবং হাসতে হাসতে বিরুসভ পরিবারের নানান কাহিনী বলতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ সে যখন টের পেলো যে তার কথাগুলো অত্যন্ত নিরস হয়ে যাচ্ছে এবং ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা আদৌ হাসছে না, তখন সে চুপ করলো। সত্যিই, সে এক রীতিমতো অস্বস্তিকর অবস্থা। খাওয়াদাওয়ার পর বৈঠকখানায় একটা বাতির পাশে দুজনে চুপচাপ বসে রইলো। ওর কাছে মিথ্যে কথা বলা গ্রুঝিনের পক্ষে অসম্ভব, আবার অন্য দিকে ঝিনাইদা তাকে কিছু জিগেস করতে চায়, কিন্তু কি জিগেস করবে কিছু ভেবে পায় না। এমনি ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে যায়। এক সময়ে গ্রুঝিন তার ঘড়ির দিকে তাকায়। 'আমার মনে হয় এবার ওঠা উচিত।'

'না, আর একটু বসুন·· দুজনে কিছুক্ষণ গল্প করি।'

আবার সারা ঘর জুড়ে নেমে আসে একটুকরো নিতল নিস্তব্ধতা। গ্রুঝিন উঠে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসে দু-একটা ঘাট টেপে, তারপর বাজাতে শুরু করে, তার সঙ্গে আস্তে আস্তে গানও ধরে—আমারই লাগিয়া কি আনিবে তুমি আগামী কাল! কিন্তু বরাবরের মতো এবারেও সে হঠাৎ করেই উঠে পড়ে।

'না না, আর একটা কিছু বাজান।' ঝিনাইদা মিনতি করে।

গ্রুঝিন কাঁধ ঝাঁকায়। 'কি বাজাবো! অনেক দিন চর্চা নেই, আজকাল প্রায় সব ভুলেই গেছি।'

ছাদের দিকে তাকিয়ে সে ভাববার চেষ্টা করলো, তারপর সমস্ত অন্তর উজাড় করে চেইকভস্কির আশ্চর্য মিষ্টি দুটো সুর বাজালো। তার অনঙ্গসুন্দর মুখাবয়বে ফুটে উঠলো কোমল একটা মাধুর্য। আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়ের মনে হলো—যে মানুষটাকে এতদিন নৈতিকতাবিহীন জঘন্য একটা পরিবেশে দেখে এসেছি, তার মধ্যে কেমন করে স্নিগ্ধ কোমল এই পবিত্র ভাবের সমাবেশ হলো! কেমন করে সে অনুভূতির এমন এক চরম পর্যায়ে উঠতে পারলো, আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকলো না। এই অনুভূতির আবেগ ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনাকেও স্পর্শ করলো, হাস্যোজ্জ্বল

মুখে ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় পায়চারি করতে লাগলো।

'সত্যি, ভারি মিষ্টি আপনার হাত! অনুগ্রহ করে আর একটা কিছু বাজান।' ঝিনাইদা আবার করুণ স্বরে গ্রুঝিনকে মিনতি করলো।

প্রথমে আস্তে আস্তে, পরে নিপুণ আত্মবিশ্বাসে সে সেন্ট-সিয়ানের 'মরাল-সংগীত' বাজিয়ে শোনালো। সম্পূর্ণ সুরটা বাজানোর পর সে সুরটা আর একবার বাজিয়ে শোনালো।

সুরমূর্ছনায় মুগ্ধ ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা পায়ে পায়ে গ্রুঝিনের এক পাশে এসে দাঁড়ালো। 'আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, আমার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

গ্রুঝিন মুখ তুলে তাকালো। 'আমি কি বলবো? আপনাকে আমার খুবই ভালো লাগে, এবং আপনার শুভ ছাড়া আমি আর অন্য কিছু কামনা করতে পারি না। তবে যেসব বিষয়ে আপনি আগ্রহী, সে সম্পর্কে যদি কিছু শুনতে চান···তাহলে স্পষ্টই বলি—হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে মানুষ কোনদিনই সুখী হতে পারে না। একই সঙ্গে সুখী এবং স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা জীবন খুবই নির্মম। তাই আমার মনে হয়, যার যা প্রাপ্য তাই দিয়েই প্রতিশোধ নিতে হবে—অর্থাৎ নিজের স্বাধীনতার জন্যে তাকেও নির্মম নিষ্ঠুর হতে হবে।

'আমার পক্ষে তা অসম্ভব!' বিষাদমাখা ঠোঁটে ঝিনাইদা করুণ করে হাসলো। 'আসলে আমি এমনই ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়েছি যে নিজের সান্ত্বনার জন্যে আমার আর একটা আঙুলও হেলানোর শক্তি নেই।'

'আমার মনে হয় আপনার কোনো আশ্রমে চলে যাওয়া উচিত।'

অনেকটা ঠাট্টার সুরে কথাটা বললেও, ঝিনাইদার চোখ দেখে গ্রুঝিনের চোখদুটোও ছলছল করে উঠলো। একটু নিস্তব্ধতার পর সে বললো, 'আর নয়, অনেকক্ষণ গল্প করেছি, এবার চলি। ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রাখুন। বিদায়।'

ঝিনাইদার দু হাতেই চুমু দিয়ে গ্রুঝিন জানায় আবার দু-একদিনের মধ্যে এসে সে ওকে দেখে যাবে। তারপর নিচের হলঘরে এসে শিশু-

দের গায়ের গন্ধওয়ালা ওভারকোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতেই আমাকে বকশিশ দেবে বলে পকেট হাতড়ায়, কিন্তু কিছুই খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে আমাকে বিদায় জানিয়ে সে চলে যায়।

তার এই আন্তরিকতা আমাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে।

সোফায় শুয়ে না পড়ে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা তখনও নিজের ঘরে পায়চারি করছে। এক দিক থেকে অবশ্য ভালোই হয়েছে, আমি ওর সঙ্গে খোলাখুলি কিছু আলোচনা করার সুযোগ পাবো। কিন্তু গ্রুঝিনকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় আবার ঘন্টির শব্দ শুনলুম।

দরজা খুললুম।

কুকুশকিন জিগেস করলো, 'গ্রিগরি কি ফিরে এসেছে ? আসেনি ? সত্যি, খুবই আফসোসের কথা ! ঠিক আছে, আমি বরং ওপরে গিয়ে ঝিনাইদার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি ' ওপরে উঠতে উঠতে ও চেঁচিয়ে বলে, 'ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা, আমি কি ভেতরে আসতে পারি ? দেরি করে ফেলার জন্যে আমি সত্যিই খুব লজ্জিত।'

মিনিট দশেকের বেশি ও বৈঠকখানায় ছিলো না, কিন্তু আমার মনে হলো সে যেন অনেকক্ষণ রয়েছে এবং আর কখনও বেরিয়ে আসবে না। রাগে দুঃখে বিরক্তিতে আমি ঠোঁট কামড়াতে লাগলুম। ঝিনাইদা কেন ওকে এখনও দূর করে দিচ্ছে না ? কেননা আমি খুব ভালো করেই জানি ওর সান্নিধ্য ঝিনাইদার কাছে রীতিমতো বিরক্তিকর।

নিচের হলঘরে আমি যখন ওর লোমের কোটটা এগিয়ে দিলুম, শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে ও জিগেস করলো, 'বউ ছাড়া তোমার চলে কি করে ? আমার তো মনে হয় পলিয়া আর তুমি দিন দিন চোরের মতো বেশ ঘনই হয়ে উঠছো।'

জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ধারণা তখন আমার খুব অল্পই ছিলো—যা নিতান্ত তুচ্ছ তাকে প্রায়ই খুব বড় করে দেখতুম, আর যা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তাকে প্রায় লক্ষ্যই করতুম না। আমার মনে হলো কুকুশকিনের কথাটা নিতান্ত ঠাট্টা বা উদ্দেশ্য-

বিহীন নয়। ও ভেবেই নিয়েছে অন্যান্য চাকরবাকরদের মতো আমি চাকরানিদের ঘরে আড্ডা মারবো আর সেই সুযোগে সন্ধ্যেবেলায় যখন অরলভ বাড়ি থাকবে না, গভীর রাত পর্যন্ত ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার সঙ্গে কাটিয়ে যাওয়াটা আমার চোখে পড়বে না? ওর ভালো মানুষের মতো মুখ দেখে আমার তো মনে হলো আজই ও তাসের আসরে বসে সদর্পে ঘোষণা করবে—ইতিমধ্যেই ও অরলভের কাছ থেকে ঝিনাইদাকে জয় করে নিয়েছে।

দুপুরে যখন অরলভের বুড়ো বাপটা এসেছিলো, ঘৃণায় আমি উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারিনি, এখন সেই গ্লানি আমাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেললো। কুকুশকিনের জুতোর মশমশ শব্দ শুনে আমার দুর্মর ইচ্ছে হলো অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় ওকে গালাগালি দিই, কিন্তু কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলুম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর হঠাৎ হলঘরের টেবিলে গোল করে পাকিয়ে রাখা গ্রুঝিনের কাগজগুলো আমার নজরে পড়লো। টুপি বা ওভারকোট না পরেই তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা তুলে নিয়ে আমি রাস্তায় নেমে এলুম, তারপর বড় বড় কণায় তুষারপাতের মধ্যে দিয়েই পড়ি কি মরি ছুটতে লাগলুম।

'এই যে, শুনছেন? গ্রিগরি ইভানিচের জন্যে এই কাগজগুলো নিয়ে যান!'

গোল করে পাকানো কাগজের মোড়কটা কুকুশকিনের হাতে গুঁজে দিয়ে এক সময়ে হাঁফাতে হাঁফাতে আমি ঘরে ফিরে এলুম।

১২

তুষারে মাথা আমার ভিজে গেছে। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকেই চাকরের উর্দিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে নিলুম, জামাকাপড় রাখার বড় বাক্সটা টেনে এনে রাখলুম দরজার সামনে। চলে আমাকে যেতেই হবে। তার আগে অরলভকে চিঠি লিখতে বসলুম।

এই ভাবে শুরু করলুম: "নকল ছাড়পত্রটা তোমার কাছে রেখে গেলাম। বিনীত অনুরোধ অভিজ্ঞান হিসেবেই ওটা তোমার কাছে রেখে

দিও।

"ছদ্মনামে, চাকরের ছদ্মবেশে কোনো মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা, সবকিছু দেখা ও শোনা, এমনকি মিথ্যে ভাষণের দোষে কাউকে অভিযুক্ত করা—তুমি হয়তো বলবে এসব চৌর্যবৃত্তিরই নামান্তর। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক, কিন্তু এখন এসব সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পর্কে আমি আর মাথা ঘামাই না। বহু মধ্যাহ্ন আর সান্ধ্যভোজের আসরে যখনই তোমার মুখে যা এসেছে বলেছো, যা খুশি করেছো—আমি সব নীরবে লক্ষ্য করেছি আর মুখ বুজে সহ্য করে গেছি। আমার নীরব উপস্থিতি মুহূর্তের জন্যে তোমাকে টের পেতে দিইনি। কিন্তু হাতের কাছে ছলনাবিহীন সত্যি কথা বলার সাহস যদি কোনো মানুষের না থাকে, তাহলে তোমার পরিচারক স্তেফানই তোমার অনন্ত মুখোশটা সবার সামনে টেনে খুলে দেবে।"

ঠিক এভাবে চিঠিটা শুরু করতে চাইনি, কিন্তু তা পালটাবার কোনো আর্তিই অনুভব করলুম না। তাছাড়া, তাতে কিইবা এসে যাবে?

কালো পরদা লাগানো বড় বড় জানলা, নিঃসঙ্গ শয্যা, মেঝেতে অবহেলায় পড়ে থাকা চাপরাসির উর্দি আর আমার ভিজে পায়ের ছাপ—সব মিলিয়ে কেমন যেন বিষণ্ণ আর নিঃসঙ্গ মনে হলো। চারদিক জুড়ে অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ্য।

সম্ভবত খালি পায়ে টুপি না পরে বাইরে বেরুনোর ফলেই তেড়ে জ্বর উঠলো। আমার মুখ-চোখ জ্বালা করতে লাগলো, পাদুটো মনে হলো অবসন্ন, ভারি মাথাটা নুয়ে পড়লো টেবিলের ওপর, আর সব কিছুই কেমন যেন ছায়ার মতো মনে হলো।

আমি লিখে চললুম: "আমি অসুস্থ দুর্বল, নৈতিক দিক থেকেই অবনমিত। যেমন করে লেখা উচিত ছিলো তেমন ভাবে লিখতে পারছি না। প্রথমে ইচ্ছে ছিলো তোমাকে চরম অপমান করবো, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার সে অধিকার নেই। তুমি আমি আমরা দুজনেই খলিত। আমরা আর কোনোদিনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না। শবাধারের ঢাকনার ওপর কেউ যতই আঘাত করুক না কেন, মৃতকে কেউ কোনো

দিন বাঁচিয়ে তুলতে পারে না। আমার চেয়ে তুমি খুব ভালো করেই জানো—তোমার অভিশপ্ত হিমেল রক্ত আর কোনোদিনই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে না। তবু না লিখে কোনো উপায় নেই, কেননা এ চিঠি এখনও তোমাকে বাঁচাতে পারে। এমনই শ্রান্ত, আর জ্বরতপ্ত যে লিখতে পারছি না, সমস্ত ভাবনা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তবু যে প্রশ্ন তোমার সামনে তুলে ধরতে চাই তা অগ্নিস্বাক্ষরেরই মতো সুস্পষ্ট।

"আমি অসুস্থ দুর্বল। ঘর-বাড়ি, এমনকি নিজস্ব স্মৃতি বলতে আমার কিছু নেই। কিন্তু তোমার এই অধঃপতন কেন? সম্পূর্ণ ফুটে ওঠার আগে কেন অকালে ঝরে গেলো তোমার হৃদয়-কুসুম? জীবনের প্রায় শুরুতেই যাকিছু সুন্দর আর ঈশ্বরকে কেন এমন করে বর্জন করলে, কেন অন্যকে ভয় দেখাতে গিয়ে নিজেকে এমন এক ভীরু পশুতে পরিণত করলে? সত্যিই ভাই—প্রাচ্যের অলস মানুষের মতো তুমি এক জীবন-ভীরু। হ্যাঁ, তুমি অনেক পড়েছো ঠিকই, ইউরোপীয় কোট তোমার গায়ে খুব ভালোই মানায়, কিন্তু গভীর মমতায় ঠিক পাশাদের মতো ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত দুঃখ দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাও? কত অকালেই না তোমার সত্তাকে পোশাকী আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছো। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যখন বাস্তব জীবন আর প্রকৃতির বিরুদ্ধে দুর্মর সংগ্রাম করছে, তখন তুমি ভীরু কাপুরুষের মতো কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো। কত নরম, কত আরামপ্রিয়, কত উষ্ণ আর আয়েসী তুমি—কি ভীষণ একঘেয়ে তোমার জীবন! এই একঘেয়েমি ভয়ঙ্কর রুদ্ধ একটা নির্জন কক্ষের মতন, যার মধ্যে একটাও আলোক-রশ্মি কখনও প্রবেশ করে না। হ্যাঁ, শত্রুর হাত এড়িয়ে পালাবার জন্যেই তুমি দিনের মধ্যে প্রায় আট ঘণ্টা তাস খেলে কাটাও।

"আর তোমার বিদ্রূপগুলো? হ্যাঁ, ওগুলো আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি। ওগুলো এমনই স্বচ্ছ, নির্মম আর মর্মভেদী যে দুর্বল শ্লথ মনের পক্ষে তা সত্যিই দুর্বিষহ। অসংখ্য সঙ্গীসাথীদের মতো যাতে তোমার শান্তি কোথাও বিঘ্নিত না হয় সেই জন্যে যৌবনেই তুমি নিজেকে কঠিন আবরণে রুদ্ধ করে ফেলেছো। জীবনের প্রতি এই বিদ্রূপাত্মক মনোভাবই তোমার

একমাত্র বর্ম, যার আড়াল থেকে তোমার সন্ত্রস্ত ভীরু শৃঙ্খলিত মনটা কিছুতেই বাইরে বেরিয়ে আসতে সাহস পায় না। যে সমস্ত ধারণা সম্পর্কে তুমি সবকিছু জানার ভান করো, তাকে যখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো তখন তোমার অবস্থা ঠিক রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া সৈনিকের মতো, নিজের লজ্জাকে ঢাকার জন্যে যে যুদ্ধ ও শৌর্য-বীর্যকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দেয়। দস্তেয়ভস্কির কোনো এক উপন্যাসে এক বৃদ্ধ পিতা তার পরম স্নেহের কন্যার প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে পারেননি বলেই উনি ওর ছবিটাকে দু পায়ে পদদলিত করেছিলেন। তুমিও ঠিক তেমনি প্রকৃত সত্যকে অনুসরণ করতে পারো না বলেই তাকে অকথ্য কুৎসিত ভাষায় বিদ্রূপ করো। প্রতিটা সৎ সত্যের আভাসেই তুমি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠো। তাই যারা তোমাকে তোষামোদ করে, তোমার দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়, তুমি ইচ্ছে করেই তাদের দ্বারা পরিবৃত থাকো। হয়তো সেই জন্যেই তুমি চোখের জলকে ভয় পাও।

"এবার মেয়েদের প্রতি তোমাব মনোভাব প্রসঙ্গে আসি। উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদেব রক্তমাংসে কিছুটা নির্লজ্জতা আমবা অবশ্যই পেয়েছি। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের মূল্য হলো এই পাশব প্রবৃত্তিকে দমন করা। তুমি যখন পরিণত হয়ে উঠলে, এবং 'সমস্ত' ব্যাপারটা তোমার জানা হয়ে গেলো, প্রকৃত সত্যকে তখন তুমি উপলব্ধি না করে পারো না। উপলব্ধি করলে ঠিকই, কিন্তু তাকে তুমি অনুসরণ করলে না। তুমি ভয় পেলে, তারস্বরে ঘোষণা করলে—দোষ তোমার নয়, দোষ মেয়েদের। মেয়েদের প্রতি তোমার হীন মনোভাবের মতো ওরাও অধঃপতিত।

"এখন প্রশ্ন হলো, কেন আমাদের এই দুরবস্থা? আবেগ-উদ্দীপ্ত, দুঃসাহসী আর প্রত্যয়-ভরা যে মানুষ, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সে কেন এমন দেউলিয়া হয়ে গেলো? কেন কেউ একজন ক্ষয়রোগে ভোগে, কেউ গুলি চালিয়ে নিজের মাথার খুলিটাই উড়িয়ে দেয়, কেউ তাস আর ভদকার মধ্যে নিজের বিস্মৃতি খোঁজে, কেউ আবার অবজ্ঞাভরে যৌবনের অমলিন স্মৃতিটাকে পদদলিত করে যায়? কেন, কেন

এমন হয়? কেন এমন হয় না যে একবার মুখ থুবড়ে পড়ার পর আমরা আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি না, কোনো কিছুকে হারিয়ে কেন আর একবার তাকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করি না? কেন এমন হয়?

"যে দুর্বৃত্তকে ক্রুশ কাঠে ঝোলানো হয়েছে, হয়তো আর মাত্র ঘণ্টা খানেক বাঁচবে, সে-ও ইচ্ছে করলে ক্ষণিকের জন্যে তার জীবনের আনন্দ আর বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তোমার সামনে এখনও বহু বছর পড়ে রয়েছে, এবং যে যতই ভাবুক, আমিও খুব শিগগির মরছি না। সত্যি যদি এমন কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে—বর্তমানটা একটা স্বপ্নে পরিণত হলো, ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্নে, আর আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা শক্তি আর পবিত্রতা নিয়ে জেগে উঠলাম? মধুর একটা আশায় আমি উদ্বেলিত হয়ে উঠছি, আবেগে শ্বাস আমার রুদ্ধ হয়ে আসছে। জীবনের প্রতি আমার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। আমি চাই জীবন হোক উন্মুক্ত নীলিম আকাশেরই মতো পবিত্র, অবাধ। এসো, আমরা সবাই আবার বাঁচার চেষ্টা করি। দিনে দুবার যেমন সূর্য ওঠে না, এ জীবনও তেমনি আমরা আর কখনও ফিরে পাবো না। তাই তোমার জীবনের এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাকে তুমি দু হাতে আঁকড়ে ধরো, তাকে বাঁচাও···"

ব্যস, আর একটাও শব্দ আমি লিখিনি। অজস্র চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেলেও, কাগজে-কলমে তাকে বাস্তব রূপ দিতে পারিনি। চিঠিটা শেষ না করেই নাম আর পদমর্যাদা লিখে আমি পড়ার ঘরে গেলুম। ঘরটা অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে টেবিলটা খুঁজে তার ওপর চিঠিখানা রেখে দিলুম। ফিরে আসার সময় কি যেন একটা আসবাব-পত্রের গায়ে ধাক্কা খেলুম।

বৈঠকখানা থেকে ঝিনাইদার শংকিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'কে, কে ওখানে?'

ঠিক সেই সময় টেবিল-ঘড়িতে ঢং করে রাত একটা বাজালো।

·

১৩

সদরজার হাতলটা খুঁজে পাবার জন্যে প্রায় মিনিট খানেক ধরে আমি

হাতড়ে বেড়ালুম। তারপর ধীরে ধীরে দরজা খুলে আমি প্রবেশ করলুম বৈঠকখানার ভেতরে। ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা সোফায় শুয়েছিলো, আমাকে দেখে কনুইয়ের ওপর ভর রেখে অবাক চোখে তাকালো। কথা বলার শক্তি হারিয়ে আমি আস্তে আস্তে ওর দিকে এগিয়ে গেলুম, আর ও আতংক-বিস্ফারিত চোখে আমাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

অবশেষে থমকে দাঁড়িয়ে আমি কোনরকমে বললুম, 'ও আর আসবে না।'

ঝিনাইদা চকিতে উঠে দাঁড়ালো, এমন ভাবে আমার দিকে তাকালো যেন চিনতেই পারছে না।

'সত্যিই অরলভ আর ফিরবে না,' দুরু দুরু বুকে আমি আবার বললুম। 'কেন না পিটারসবুর্গ ছেড়ে ও কোথাও যায়নি। পেকারস্কির বাড়িতে এখন লুকিয়ে রয়েছে।'

এবার ঝিনাইদা আমাকে আর অবিশ্বাস করলো না। ওর মুখ-চোখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে ওঠার ভঙ্গি দেখেই আমি তা বুঝলুম। সেই মুহূর্তে সমস্ত ঘটনাগুলো ওর স্পষ্ট মনে পড়ে গেলো। ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর হঠাৎ করেই যেন নির্মম সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। অথচ পরক্ষণেই আমার উসকো-খুসকো চুল, মাতালদের মতো জরতপ্ত মুখ আর নিচু স্তরের চাকরদের মতো বেশবাস-পরা একজন অচেনা মানুষকে হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেখে ও ক্রুদ্ধ, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, 'ঠিক আছে, এ নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

'সত্যি, বিশ্বাস করুন, আমি আদৌ চাকর নই···আপনারই মতো একজন মুক্ত স্বাধীন মানুষ।'

উদ্দীপ্ত আবেগে আমি বলে উঠলুম, তার সঙ্গে আমার নাম আর পদমর্যাদাটাও উল্লেখ করলুম। যাতে আমাকে বাধা না দেয় বা চলে না যায়, সেই জন্যে আমি তাড়াতাড়ি ওকে বুঝিয়ে দিলুম আমি কে এবং কেন এখানে রয়েছি। আমার এই স্বীকারোক্তিতে ও আগের চাইতেও বিস্মিত হলো। অসুখী চোখে-মুখে তখনও যেটুকু কমনীয় লাবণ্য অব-

শিষ্ট ছিলো, তা যেন নিমিষে উধাও হয়ে গিয়ে ফুটে উঠলো বার্ধক্যের ছাপ। বুঝতে পারলুম এ রকম চরম বেদনাদায়ক একটা মুহূর্তে ওর সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই, তবু আবেগদীপ্ত গলায় বললুম, 'ওর প্রদেশ-ভ্রমণের কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যে, কেবল আপনাকে প্রবঞ্চিত করার জন্যেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। এবারের মতো জানুয়ারিতেও ও কোথাও যায়নি, ওই পেকারস্কির বাড়িতেই লুকিয়ে ছিলো। আমি রোজ ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতুম, এই প্রতারণায় অংশ গ্রহণ করেছিলুম। আসলে ও আপনাকে নিয়ে খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিলো, আপনার এখানে থাকাটাকে ঘৃণা করতো, আপনাকে নিয়ে সব সময় ও বন্ধুদের কাছে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো···আপনি যদি নিজে কানে সেসব শুনতেন, এক মুহূর্তও আর এখানে টিঁকতে পারতেন না। দোহাই আপনার, এখানে থাকবেন না। আপনি চলে যান।'

'বেশ, তাই হোক।' মৃদু কেঁপে উঠলো ঝিনাইদার গলার স্বর।

চোখদুটো ভরে উঠেছে জলে, ঠোঁটদুটো কাঁপছে, ক্রোধে অপ-মানে মুখটা হয়ে গেছে বিবর্ণ। অরলভের স্থূল কপট মিথ্যাচার ওকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। চুলে হাত বোলাতে বোলাতে অদ্ভুত বাঁকা ঠোঁটে ও হাসলো, যে হাসিটা আমার আদৌ ভালো ঠেকলো না।

'আমি চলেই যাবো। ও ভেবেছে অপমানে অপমানে আমি নিঃশেষ হয়ে যাবো···কিন্তু তার বদলে এখন আমার মজাই লাগছে। কিন্তু আমার কাছে লুকোবার কোনো দরকার ছিলো না, অন্যের বাড়িতে লুকিয়ে না থেকে ও আমাকে স্পষ্টই বলতে পারতো। আমার চোখ আছে, অনেক দিন আগে থেকেই আমি এসব লক্ষ্য করেছি···আমি শুধু ওর ফিরে আসার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।'

তারপর সোফার হাতলে মাথা রেখে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। বৈঠকখানার বাতিদানে কেবল মাত্র একখানাই মোমবাতি জ্বলছিলো, আর সোফাটা ছিলো অস্পষ্ট আঁধারে মোড়া। আমি সেই আলো-আঁধারিতে লক্ষ্য করলুম শিথিল কবরী ভেঙে চূর্ণ কুন্তলে ওর ঘাড় মুখ হাত সব ঢেকে গেছে, কেবল থেকে থেকে কেঁপে উঠছে শুভ্র নিটোল

কাঁদছেটো। একটানা নিঃশব্দ এই ক্রন্দন কোনো বিকৃতির নয়, এ কান্না বেদনাহত অপমানিত সাধারণ এক নারীর, নিজের হতাশা থেকে যে কখনও মুক্তি পায়নি, যার মূল্যও কেউ কখনও দেবার চেষ্টা করেনি। ওর এই চোখের জল এই নিঃসঙ্গতা আমার ক্ষুব্ধ অসুস্থ হৃদয়কেও গভীর ভাবে স্পর্শ করলো, এ ছুনিয়ার সবকিছু আমি ভুলে গেলুম। বৈঠকখানায় পায়চারি করতে করতে ম্লান স্বরে বললুম, 'এ অপমান সহ্য করে কেউ বাঁচতে পারে না, বাঁচা যায় না। এ ভাবে বাঁচাটা জীবন নয়, এ এক ধরনের পাগলামি।'

জিনাইদা ধীরে ধীরে মুখ তুললো, গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুলের মধ্যে দিয়েই সজল চোখে তাকালো আমার দিকে। আমাকে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে বলে চোখের জলে ভিজে যাওয়া চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে বললো, 'সত্যিই তাই। দিন দিন ওর কাছে আমি ছুর্বিষহ হয়ে উঠেছি। এ অপমান সহ্য করে আমরা কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে পারি না। ও যে আমাকে নিয়ে সবার কাছে হাসি-ঠাট্টা করবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'শুধু আপনি নন, আপনার প্রেম, তুর্গেনিভ—সবকিছু নিয়েই ওরা হাসি-ঠাট্টা করতো। এমন কি হতাশায় আমাদের ছুজনের যদি মৃত্যুও হয়, তা নিয়েও ওরা সব মজাব মজার গল্প কাঁদবে। কিন্তু ওদের কথা বলে কি লাভ হবে? আমাদের ছুজনকেই এখান থেকে চলে যেতে হবে, আমার পক্ষে এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা সম্ভব নয়।'

জিনাইদা আবার কাঁদতে শুরু করে, আমি পায়ে পায়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ছোট্ট করে বলি, 'ছুটো তো বাজে, মিছিমিছি আর অপেক্ষা করে কি লাভ?'

'আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। আমি আর কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছি না।'

'না না, এভাবে বলবেন না। বরং আসুন, ছুজনে মিলে ঠিক করি এখন আমরা কি করবো। আর যা-ই হোক, আপনি বা আমি, কেউই আমরা এখানে থাকতে পারি না। আপনি কোথায় যেতে চান বলুন?'

হঠাৎ দরজায় ঘণ্টি বেজে উঠলো। বুকের স্পন্দন আমার যেন স্তব্ধ

হয়ে গেলো। অরলভ নাকি! নিশ্চয়ই কুকুশকিন আমার বিরুদ্ধে তার কাছে নালিশ করেছে! সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে কি হবে? আমি গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। পলিয়া। ঘাঘরার প্রান্ত থেকে তুষারকণা ঝাড়তে ঝাড়তে ও নিজের ঘরের দিকে চলে গেলো, আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালো না। দরজা বন্ধ করে আমি আবার বৈঠকখানায় ফিরে এলুম। দেখলুম ঘরের মাঝখানে ঝিনাইদা ফ্যাকাশে মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাকে দেখেই বড় বড় চোখ তুলে তাকালো।

অস্ফুট স্বরে জিগেস করলো, 'কে এলো?'

বললুম, 'পলিয়া।'

মুহূর্তের জন্যে চোখের পাতাদুটো ও শক্ত করে বুজিয়ে ফেললো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'আমি এই মুহূর্তে চলে যেতে চাই। যদি আপনি কিছু মনে না করেন, আমাকে একটু পিটারসবুর্গ-সাইডে পৌঁছে দেবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'কটা বাজে এখন?'

'পৌনে তিনটে।'

১৪

একটু পরে আমরা যখন ঘর ছেড়ে বেরোলুম, বাইরে তখনও অন্ধকার, সারা পথ নিস্তব্ধ নিঝুম। ঘন তুষার পড়ছে, তার সঙ্গে হিমেল হাওয়ার ঝাপটা। সবে মার্চের শুরু, তখনও ভালো করে তুষার গলতে শুরু করেনি, অথচ কোচোয়ানরা ইতিমধ্যেই স্লেজ ছেড়ে দু চাকার ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। শীতের অমন গম্ভীর রাতে, অন্ধকারে আমাদের দুজনকে সন্দেহজনক ভাবে বাইরে বেরুতে দেখে দরোয়ান ফটক খোলার আগে ঝিনাইদাকে কি যেন প্রশ্নও করলো। জবাবটা আমি ঠিক শুনতে পাইনি, তবে ও খুব মুষড়ে পড়েছিলো। গাড়িতে উঠে ঢাকনাটা ফেলে দেবার পরেও ঠাণ্ডায় আমরা দুজনে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলুম।

ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা আস্তে আস্তে বললো, 'আপনার শুভেচ্ছাকে আমি এতটুকুও সন্দেহ করছি না, এবং আপনাকে এ ভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত। হ্যাঁ, এখন আমি বুঝতে পেরেছি···আজ যখন ও ক্রুকিন এখানে এসেছিলো, তখন মনে হয়েছিলো ও মিথ্যে বলছে, ও যেন আমার কাছে কিছু গোপন করতে চাইছে। যাগগে, যা হবার হোক। তবু, আপনাকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত।'

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ঝিনাইদা তখনও সন্দেহের দোলায় দুলছে। সেই সন্দেহ দূর করার জন্যে আমি কোচোয়ানকে সারগিয়েভস্কি সরণি ঘুরে যাবার কথা বললুম। পেকারস্কির বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে আমি দরজায় ঘন্টি বাজালুম। দরোয়ান দরজা খোলার পর, ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা যাতে শুনতে পায় আমি সেই ভাবে উঁচু গলায় ওকে জিগেস করলুম, 'আচ্ছা ভাই, গ্রিগরি ইভানিচ কি এখন বাড়ি আছেন?'

জবাব এলো, 'হ্যাঁ, আছেন। আধ ঘণ্টা আগে উনি ঘরে ফিরেছেন। তবে এতক্ষণে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। কি চান বলুন?'

সম্ভবত উত্তেজনায় ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা স্থির থাকতে পারেননি, খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে মাথা বাড়িয়ে সব শুনছিলো। এবার মৃদু স্বরে জিগেস করলো, 'উনি কি অনেকদিন ধরে এখানে রয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তা প্রায় সপ্তা তিনেক হবে।'

'এর মধ্যে উনি আর বাইরে কোথাও যাননি?'

'না।'

দরোয়ান অবাক চোখে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি ওকে বললুম, 'ঠিক আছে, কাল সকালে ওঁকে বোলো, ওয়ারশ থেকে ওঁর বোন এসেছে। বিদায়।'

গাড়িতে আমরা দ্রুত এগিয়ে চললুম। গাড়ির সামনে কোনো আবরণ না থাকায় বড় বড় কণায় তুষার এসে পড়তে লাগলো আমাদের গায়ে। নেভার ধার দিয়ে যাবার সময় কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস এসে বিঁধতে লাগলো আমাদের চোখে মুখে। মনে হলো আমরা যেন অনন্তকাল ধরে

এই ভাবে গাড়িতে চড়ে চলেছি আর ঝিনাইদার বেদনাহত গভীর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে আমার ফেলে-আসা বিচিত্র জীবনটা কেমন যেন অদ্ভুত বিলাপমুখর একটা স্বপ্নের মতো মনে হলো। ঘুম-ঘুম এই ভাবটাকে দু চোখ থেকে মুছে ফেলার জন্যে আমি খড়খড়িটা একটু উঁচু করে বাইরের দিকে উঁকি মারলুম, দেখলুম পূবের আকাশে একটু একটু করে নিশান্তিকার আলো ফুটে উঠছে। হঠাৎ কেন জানি অতীতের সমস্ত স্মৃতি, কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট যত ভাবনাকে অতিক্রম করে কেবল একটাই মাত্র ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, মনে হলো ঝিনাইদা আর আমার জন্যে সব কিছুই অপ্রতিরোধ্য ভাবে শেষ হয়ে গেছে। উদাত্ত নীলিম আকাশেরই মতো এ ভাবনা আমার কাছে ধ্রুব সত্য বলে মনে হলো, অথচ আশ্চর্য, পরমুহূর্তেই আমি এ সব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্য ভাবে ভাবতে লাগলুম।

'এখন আমি কোথায় যাবো, কি করবো, কিছুই বুঝতে পারছি না।' কান্নার মতো ভেজা-ভেজা গলায় ঝিনাইদা খুব আস্তে আস্তে বললো। 'গ্রুঝিন আমাকে কোনো আশ্রমে চলে যেতে বলেছিলো। হ্যাঁ, আমি বরং তাই করবো। নিজের নাম-ধাম চেহারা পোশাক ভাবনা-চিন্তা, সব সবকিছু পালটিয়ে আমি চিরদিনের জন্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখবো। কিন্তু ওরা আমাকে আশ্রমে নেবে না, আমি যে অন্তঃসত্ত্বা!'

'চলুন, আমরা বরং কালই বিদেশে চলে যাই।'

'তা সম্ভব নয়। আমার স্বামী আমাকে কিছুতেই ছাড়পত্র দেবে না।'

'তার কোনো প্রয়োজনও নেই। ছাড়পত্র ছাড়াই আমি তোমাকে নিয়ে যাবো ঝিনাইদা।'

সেই প্রথম আমি ঝিনাইদাকে তুমি বলে সম্বোধন করলুম।

কালো রঙ-করা দোতলা একটা কাঠের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। আমি ঘন্টি বাজালুম। মালপত্তর বলতে সঙ্গে এনেছিলুম হালকা ধরনের ছোট একটা বেতের ঝুড়ি, যার মধ্যে ঝিনাইদার দামী দামী সব গয়নাগাঁটি ছিলো, এবার সেটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিলুম।

দরজা খোলার অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলো। বেশ জোরে জোরে

তিন চার বার ঘণ্টি বাজানোর পর জানলায় অস্পষ্ট আলোর রেখা দেখা গেলো। একটু পরে বন্ধ দরজার ওপারে পায়ের শব্দ, কাশি আর ফিস ফিস করে কথা বলার আওয়াজও শুনতে পেলুম। অবশেষে তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হলো এবং দরজার সামনে মোটাসোটা লালচে মুখ এক-জন ঝিকে দেখা গেলো। ওর ঠিক পেছনেই রোগা মতন ছোট ছোট কোঁকড়ানো পাকা চুল একজন বৃদ্ধা মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঝিনাইদা দৌড়ে গিয়ে সেই বৃদ্ধার গলা জড়িয়ে ওঁর বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

'নিনা, নিনা, ও আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে। আমি ঠকে গেছি, ভীষণ ভাবে ঠকে গেছি!' ঠিক বাচ্চা মেয়ের মতন বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ককিয়ে ওঠা কান্নায় ঝিনাইদা ফুলে ফুলে উঠলো।

বেতের ঝুড়িটা আমি ঝির হাতে তুলে দিলুম। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পরেও আমি ঝিনাইদার ফুঁপিয়ে-ওঠা কান্নার শব্দ শুনতে পেলুম।

ফিরে এসে আমি কোচোয়ানকে নেভস্কি প্রসপেক্টের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে বললুম। এখন আমাকে মাথা গোঁজার মতো একটা আস্তানার কথা ভাবতে হবে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় আমি ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। ওর মধ্যে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। শুকিয়ে যাওয়া বিবর্ণ মুখে কোথাও একটুকু অশ্রুর চিহ্ন নেই, এমনকি ওর ভাব-ভঙ্গিটাও কেমন যেন ভীষণ পালটে গেছে। বিলাসবিহীন এমন সাধারণ পরিবেশে ওকে দেখার জন্যে, না কি আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়েছে বলে, কিংবা ফেলে-আসা সেই শোক ওর মনে গভীর ভাবে দাগ কেটে গেছে বলে কি না ঠিক জানি না, তবে আমার চোখে ওকে সেই আগের মতো আশ্চর্য রূপসী মনে হয়নি। ওর মধ্যে কেমন যেন একটা এলোমেলো ভাব ও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ার মতো অবস্থা লক্ষ্য করলুম, যেন হঠাৎ করেই ও কোনো কাজে ভীষণ ব্যস্ত রয়েছে। এমনকি ওর হাসির মধ্যেও আগের সেই স্নিগ্ধ মাধুর্য নেই। সেই দিনই কেনা আমি একটা দামী সুট পরে ছিলুম। ঝিনাইদা প্রথমে আমার সুট আর

হাতে-ধরা টুপিটার দিকে তাকালো, তারপর নির্নিমেষ চোখে আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো, যেন অদ্ভুত একটা কিছু খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে।

'সত্যি, আপনার এই পরিবর্তন আমার কাছে কেমন যেন অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে!' ঝিনাইদা স্তম্ভিত স্বরে আস্তে আস্তে বললো। 'আপনার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আসলে আপনি এক অসাধারণ মানুষ!'

আগের দিনের চাইতে আরও সবিস্তারে আমি ওকে বুঝিয়ে বললুম আমি কে এবং কেন অরলভের কাছে চাকরি নিয়েছিলুম। ঝিনাইদা প্রথমে মন দিয়ে সব শুনলো, কিন্তু সম্পূর্ণ বক্তব্য শেষ হবার আগেই ও বলে উঠলো, 'নিশ্চয়ই, ওখানকার পালা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গ্যাছে। এই দেখুন না, অরলভ নিজে হাতে আমাকে এই চিঠিটা লিখেছে।'

এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ ঝিনাইদা আমার হাতে তুলে দিলো। অরলভের হাতের লেখা চিনতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না। ও লিখেছে :

> তুলনামূলক কোনো বিচারের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। তবে একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে—ভুল আমার হয়নি, ভুল হয়েছে তোমার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ভুলে গিয়ে তুমি সুখী হও, এই আমার একমাত্র কামনা।
>
> ইতি—
>
> গ্রেগরি অরলভ
>
> পুনশ্চ—তোমার জিনিসপত্র সব আমি খুব শিগগিরই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

•

আমরা দুজনেই কেউ কোনো কথা কইতে পারলুম না, চুপচাপ রইলুম, এক সময়ে চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে ও আর একবার চোখ বোলালো। আগের দিন রাত্তিরে যখন আমরা প্রথম অরলভ প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলুম, ওর চোখে-মুখে যে কঠিন ঔদ্ধত্যের ভাব

ফুটে উঠেছিলো, এখন দেখলুম ওর বিবর্ণ মুখে সেই ভাবটাই ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো, অশ্রুসজল হয়ে উঠলো চোখের পাতাদুটো—কিন্তু তা ভয় বা তিক্ততার নয়, বরং বিক্ষুব্ধ একটা অহঙ্কারের।

ঝিনাইদা চকিতে উঠে দাঁড়ালো, পাছে আমি মুখটা দেখে ফেলি সেই জন্যে ও জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একটু নিস্তব্ধতার পর বললো, 'শোনো, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, কালই আমি তোমার সঙ্গে বিদেশে যাবো।'

'শুনে সুখী হলুম।'

'বালজাক পড়েছো?' ঝিনাইদা ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ আয়ত চোখে আমার মুখের দিকে তাকালো। 'তাঁর শেষ উপন্যাসে 'পীয়ের গোরিয়ট'এর নায়কের মতো বলতে চাই—আজ থেকে আমাদের এক নতুন জীবনের সূচনা হোক। তুমিও আমাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করো।'

১৫

ভেনিসে এসে আমি প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হই। সম্ভবত সন্ধ্যেবেলায় দাঁড় বেয়ে স্টেশন থেকে হোটেল বয়ারে আসার পথেই ঠাণ্ডা লেগে আমার বুকে সর্দি বসে যায়। প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় সেখানে হপ্তা দুয়েক কাটে। আমি যখন অসুস্থ ছিলুম, ঝিনাইদা প্রতিদিন সকালে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আমার সঙ্গে কফি প্যান করতে আসতো। ভিয়েনা থেকে কিনে-আনা ফরাসী আর রুশ উপন্যাসগুলো ও আমাকে জোরে জোরে পড়ে শোনাতো। বইগুলোর অধিকাংশই আমার খুব পরিচিত, এবং তেমন করে আদৌ কোনো কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পারতো না, তবু কানের কাছে একটানা বেজে চলা মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতো—আমি একা নই। খানিকটা পড়াশোনার পর হালকা ধূসর রঙের পোশাক আর মাথায় ঘাসের টুপি পরে ও বাইরে বেড়াতে যেতো। বসন্ত-সূর্যের উষ্ণ উত্তাপ মেখে যখন ফিরে আসতো ওকে তখন আশ্চর্য প্রাণবন্ত মনে হতো। শয্যার পাশে বসে আমার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে ও যখন ভেনিস কিংবা পড়ে শোনানো বইগুলো সম্পর্কে

কিছু বলতো, নিজেকে তখন আমার সত্যিই আশ্চর্য সুখী মনে হতো।

রাত্তিরে আমি সবচেয়ে বেশি অসুস্থ আর নিস্তেজ হয়ে পড়তুম, কিন্তু দিনের বেলায় মনে হতো আমি যেন আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছি। ঝোলানো বারান্দা টপকিয়ে উজ্জ্বল সোনালী রোদ এসে পড়তো আমার খোলা জানলায়। নিচে থেকে ভেসে আসতো চিৎকার চেঁচামেচি, দাঁড়ের ছপছপ শব্দ আর টুংটাং ঘন্টাধ্বনি। সব মিলিয়ে দারুণ ভালো লাগতো আমার, মনে হতো শক্ত দুটো ডানায় কে যেন আমাকে নিয়ে চলেছে সুদূর কোনো দেশান্তরে। আর সব চেয়ে অবাক লাগতো যখন ভাবতুম আরও একটা জীবন আমার খুব কাছাকাছি রয়েছে, তারুণিমায় ভরা অনন্যসুন্দর অথচ নিঃসঙ্গ একটা জীবন! ছুটির দিনের মতো অনুক্ষণ কারো সাহচর্য পেলে অসুস্থ হয়ে পড়ার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। একদিন আমি ওকে দরজার ওপরে ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে শুনলুম, তারপর ও যখন আমার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো, দেখলুম চোখদুটো জলে ভিজে রয়েছে। লক্ষণটা নিঃসন্দেহে খারাপ, তবুও বুকের ভেতরটা আমার অসহ্য আনন্দে নেচে উঠলো।

অবশেষে একদিন আমাকে ঝোলানো বারান্দা পর্যন্ত যাবার অনু-মতি দেওয়া হলো। উজ্জ্বল সূর্যালোক আর সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসা মিষ্টি বাতাস আমার রুগ্ন শরীরে কোমল একটা পরশ বুলিয়ে যেতো। নীচে মসৃণ জলের ওপর দিয়ে গর্বিত রাণীর মতো রাজকীয় ভঙ্গিতে ভেসে চলা পরিচিত নৌকোগুলোর দিকে আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতুম আর বিলাসবহুল এই সভ্যতার যাকিছু সুন্দর যাকিছু শোভন আমি সত্তার গভীরে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে উপভোগ করতুম। বাতাসে ভেসে আসতো সমুদ্রের গন্ধ।

অদূরে কে যেন গিটার বাজাচ্ছে, আর তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে আশ্চর্য মিষ্টি দুটো মেয়েলী কণ্ঠস্বর। সত্যিই অপূর্ব! পিটার্সবুর্গে তুষার-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে পাড়ি দেওয়া সেদিনের সেই রাতের চাইতে এ কত ভিন্ন, যেন অন্য এক জগৎ। বারান্দা থেকেই তাকালে চোখে পড়ে আদিগন্ত

কিনারী নীলিম সমুদ্র, আর তার জলে সূর্যের আলো পড়ে এমন চিক-চিক করে যে তাকানো যায় না, চোখ যেন ঝলসে যায়। যৌবনে আমার সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো যে সমুদ্র, সে আমাকে আজও হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি যে বাঁচতে চাই, শুধু বাঁচতে চাই, আর কিছু নয়!

দিন পনের পর থেকে আমি একটু একটু করে হেঁটে বেড়াতে শুরু করলুম। রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে আর নৌকোর মাঝিমাল্লাদের গান শুনতে আমার দারুণ ভালো লাগতো। ভালো লাগতো ঘন্টার পর ঘন্টা সেই ছোট্ট বাড়িটার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকতে, যেখানে লোকে বলে নাকি ডেসডিমোনা বাস করতো। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাড়িটাকে এমন ছোট আর হালকা মনে হতো যেন অনায়াসেই ওটাকে হাতে করে তুলে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া যায়। অনেকক্ষণ ধরে আমি ক্যানোভার স্মৃতিস্তম্ভের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতুম, বিষাদ-মগ্ন সিংহটার চোখ থেকে কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারতুম না আমার দৃষ্টি। ডোজদের রাজপ্রাসাদটা বারবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, বিশেষ করে যেখানে কালো পোশাক পরা অসুখী মারিনো ফোলিএরোর প্রতিচ্ছবিটা রয়েছে। মনে মনে ভাবতুম সত্যি, কবি, নাট্যকার কিংবা শিল্পী হলে বেশ ভালো হতো। কিন্তু তা তো আর হবার নয়, তাই কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

সকাল সকাল রাতের পান-আহার সেরে নিয়ে আমরা নৌকাবিহারে বেরিয়ে পড়তুম। জলের বুকে নক্ষত্র আর সৈকতের আলো পড়ে তিরতির কাঁপতো। অন্যান্য নৌকো থেকে ভেসে আসতো গানের সুর, নারী-পুরুষের মিলিত কণ্ঠস্বর আর ম্যাণ্ডোলিনের মৃদু স্বরমূর্ছনা। অন্ধকারের বুকে জ্বলতে থাকতো লণ্ঠনের রঙিন আলোক। জিনাইদা ফিওদ্রোভনা প্রায় সারাক্ষণই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ম্লান মুখে আমার পাশে চুপটি করে বসে থাকতো আর অপলক চোখে কি সব যেন ভাবতো, যেন আমার কথাও শুনতেই পেতো না। একদিকে ওর বিষণ্ণ মুখ, নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব, নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকার ভঙ্গি আর ভয়াবহ হিমেল স্মৃতি, অন্যদিকে নৌকো দিয়ে চারপাশ ঘেরা উজ্জ্বল আনন্দ, সুর, আলো আর উদ্দাম চটুল

নাচের ছন্দ—সত্যি, জীবনের একি আশ্চর্য বৈপরীত্য।

ঝিনাইদা যখন ঠিক ওই ভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বিষাদমগ্ন হয়ে বসে থাকতো, আমার তখন মনে হতো আমরা যেন সাবেকী আমলের সস্তা কোনো উপন্যাসের দুটো চরিত্র। ও হতভাগিনী পরিত্যক্তা, আর আমি স্বপ্নবিলাসী, বিশ্বস্ত কোনো বন্ধুর মতো যে স্বেচ্ছায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে, জীবনের সবকিছু হারিয়ে কল্পনাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া যার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু আমার এই আত্মদানের মূল্য কার কাজেই বা আসবে?

বেড়িয়ে এসে ঝিনাইদার ঘরে বসে আমরা দুজনে চা খেতুম আর গল্প করতুম। কথায় কথায় অরলভ প্রসঙ্গে এলে, কোনো কিছু লুকিয়ে না রেখে আমি খোলাখুলিই ওর সঙ্গে আলোচনা করতুম। স্পষ্টই বলতুম, 'সত্যি, তুমি বিশ্বাস করো ঝিনাইদা—ও যখন মিথ্যে কথা বলতো, খেয়াল খুশি মতো তোমার পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিতো, আমি তখন ওকে ঘেন্না করতুম। আমি অবাক হয়ে ভাবতুম—এটা কেমন করে সম্ভব যে তুমি দেখেও দেখছো না, বুঝেও বুঝছো না, অথচ সব কিছু জলের মতো এত স্পষ্ট! তুমি যখন ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসতে, ওর হাতে চুমু দিতে...'

'তখন আমি ওকে সত্যিই ভালোবাসতুম।' ঝিনাইদা চকিতে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতো।

'কিন্তু ওর মতো ছদ্মবেশী ভণ্ডকে চিনতে কি তোমার সত্যিই খুব কষ্ট হয়েছিলো? বিশ্বাস করো, আমি তোমার দোষ দিচ্ছি না...' শোভনতা হারিয়ে হয়তো আমি তখন সত্যিই একটু রূঢ় হয়ে উঠতুম, এত দিনের জমানো ক্ষোভ কিছুতেই চেপে রাখতে পারতুম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে যতটা সম্ভব নরম গলায় জিগেস করতুম, 'কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব যে তুমি ওকে চিনতে পারোনি?'

'তার মানে তুমি আমার অতীতকে ঘৃণা করছো?' বিদ্রূপে ঝাঁঝিয়ে উঠে ঝিনাইদা আমাকে পালটা প্রশ্ন করতো। 'অবশ্য আমি জানি তুমি বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ, সাধারণের মানদণ্ড দিয়ে যাকে বিচার করা

যায় না। অসাধারণ তোমার নৈতিক চরিত্রবল, এবং এই সব ভণ্ডামিকে তুমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারো না। আমি তোমাকে বুঝতে পারি, এবং কখনও উলটো কথা বললে তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে তোমার থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন। আসলে আমি সেই একই পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করি কেবল একটাই মাত্র কারণে, যেহেতু তাকে মুছে ফেলার সময় আমার এখনও আসেনি, এখনও আমি আমার অহংকারকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারিনি। আমার অতীত, আমার ভালোবাসা, অরলভ···সব, সব কিছুকেই আমি ঘৃণা করি। কি ছিলো আমার সেই ভালোবাসার মধ্যে ? আজ ভাবলে কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়। এই ধরনের হালকা ভালোবাসা মনকেই কেবল বিচ্ছিন্ন এলোমেলো করে দেয়। জীবনের অর্থ শুধু মাত্র একটা জিনিসের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়—তা হলো সংগ্রাম। বিষাক্ত নাগিনীকে থেঁতলে মেরে ফেলাই উচিত। এইটেই হলো জীবনের অর্থ, আর কিছু নয়।'

মাঝে মাঝে আমি ওকে আমার জীবনের সুদীর্ঘ কাহিনী শোনাতুম এবং দুঃসাহসিক সব অভিযানের বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতুম, প্রথমটা ও খুব মন দিয়ে শুনতো, এবং সব চেয়ে চমকপ্রদ জায়গাগুলোয় ও এমন একটা ভঙ্গি করতো যেন এ ধরনের অভিযানে ভয় বা আনন্দের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওর আর কখনও পরিচয় হয়নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ও যেন হঠাৎ করেই অন্য এক জগতে চলে যেতো, এবং ওর চোখ-মুখ দেখে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতুম ও আমার কথা আদৌ শুনছে না।

সমুদ্রের দিকের খোলা জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে ওকে জিগেস করতুম এখনই আগুন জ্বালাবো কি না।

জিনাইদা অন্যমনস্ক ভাবেই হেসে জবাব দিতো, 'না না, আমার একটুও ঠাণ্ডা লাগছে না। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় পলিয়া এখনও ওখানে আছে ?'

'কি জানি, হয়তো আছে। কিন্তু কি ব্যাপার, হঠাৎ ওর কথা জিগেস করলে কেন ?'

'না, এমনিই।'

তারপর মিষ্টি একটু হেসে ও উঠে দাঁড়াতো। শুভরাত্রি জানিয়ে আমি আমার ঘরে ফিরে আসতুম।

এমনি ভাবে পুরো একটা মাস কেটে গেলো।

একদিন সকালে আমরা দুজনে খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিলুম, সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসা মেঘের খেলা দেখছিলুম, আর প্রতি মুহূর্তেই বৃষ্টির আশংকা করছিলুম। দেখতে দেখতে সত্যিই এক সময়ে বৃষ্টির ঘন আবরণে সমুদ্র ছেয়ে গেলো আর আমরাও কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠলুম। সেই দিনই আমরা ভেনিস ছেড়ে ফ্লোরেন্সের দিকে পাড়ি জমালুম।

১৬

নিসে তখন শরৎকাল। একদিন ভোরে ঝিনাইদার ঘরে গিয়ে দেখলুম নিচু একটা কুর্শিতে পা গুটিয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে ও গুটিসুটি হয়ে বসে রয়েছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এলোমেলো দীর্ঘ চুলে ওর পা-দুটো প্রায় সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে, কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে সারা শরীর। সমুদ্রের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে সবে ওকে বলতে এসেছিলুম, কিন্তু ওকে ওই অবস্থায় দেখে মুখের কথা আমার মুখেই রয়ে গেলো, মনটা ভরে উঠলো নিঃসীম ব্যথায়।

রীতিমতো অবাক হয়েই আমি ওকে জিগেস করলুম, 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে তোমার?'

মুখ থেকে একটা হাত সরিয়ে নিয়ে ও আমাকে চলে যাবার ইঙ্গিত করলো।

'কি হয়েছে ঝিনাইদা?' দু পা এগিয়ে এসে আমি আবার জিগেস করলুম। সেই প্রথম ওর একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু দিলুম।

'কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি আমার। দোহাই তোমার, তুমি যাও... দেখছো না আমি এখনও পোশাক পালটাইনি।'

বিমূঢ় বিস্ময়ে আমি বেরিয়ে এলুম। এত দিনের শান্ত প্রসন্ন মনটা আমার কেমন যেন বিষিয়ে গেলো। ওর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবার,

ওর নিঃসঙ্গ নিভৃত মনের কান্নাকে সান্ত্বনা দেবার, ওকে সহানুভূতি জানাবার কামনা আমার দীর্ঘদিনের। সমুদ্রের বিষণ্ণ মর্মর যেন ইতিমধ্যে আমার কানে কানে তার ভবিষ্যৎ-বাণী করে গেলো, আমি যেন নতুন করে উপলব্ধি করতে পারলুম অনাগত বিপদের সম্ভাবনা।

'ও কাঁদছে কেন? কিসের জন্যে?' আমি অবাক হয়ে ওর বিষণ্ণ মুখ, বিক্ষুব্ধ চোখের চাউনি বারবার স্মরণ করার চেষ্টা করলুম। মনে পড়লো ও অন্তঃসত্ত্বা। এ ব্যাপারটা ও অন্যের কাছে, এমন কি নিজের কাছেও গোপন করার চেষ্টা করতো। ঘরে ও খুব ঢিলেঢালা পোশাক পরতো আর বাইরে বেরুবার সময় এমন আঁটসাঁট পোশাক পরতো যে দু দুবার অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে ও আমার সঙ্গে কোনো আলোচনাই করতো না। একবার আমি ওকে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার ইঙ্গিত করেছিলুম, তাতে ও লজ্জায় রাঙা হয়ে গিয়েছিলো, তবু মুখ ফুটে একটা কথাও বলেনি।

খানিকক্ষণ পরে আমি যখন আবার ওর ঘরে গেলুম, দেখলুম চুল বেঁধে পোশাক পরে ওর সাজগোজ করা হয়ে গেছে।

কান্নায় ভেঙে পড়ার উপক্রম দেখেই আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, 'চলো, গল্প করতে করতে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত একটু বেড়িয়ে আসি।'

'দোহাই তোমার, আমাকে তুমি ক্ষমা করো ইভানিচ। গল্প করার মতো আমার একটুও মনের অবস্থা নেই, এখন আমি একটু একা থাকতে চাই। আর শোনো, এর পর থেকে তুমি যখন আমার ঘরে আসবে, দয়া করে দরজায় টোকা দেবে।'

'দয়া করে' শব্দটা আমার কানে কেমন যেন অদ্ভুত আর নির্মম শোনালো। কোনো কথা না বলে আমি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। অভিশপ্ত পিটার্সবুর্গের ছবিটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো আর যাকিছু রঙিন স্বপ্ন আমার শুকনো পাতার মতো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো। নিজেকে আবার নিঃসঙ্গ মনে হলো, মনে হলো আমরা যেন পরস্পরের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছি। আমি যেন ওর কাছে আজ পর্দাসীর কোণে ছোট্ট একটা মাকড়শার

জালের মতো, জোরে বাতাস বইলেই বা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, কোথাও আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। পায়ে পায়ে তরুবীথি, সাজানো উদ্যান পেরিয়ে আমি ক্যাসিনোতে প্রবেশ করলুম। উগ্র প্রসাধন আর রীতিমত দামী পোশাকে সাজগোজ করা মেয়েরা অপাঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে যেন এই কথাটাই বলতে চাইলো—'আরে, তুমি একা! বাঃ, তাহলে তো বেশ ভালোই হলো।' কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধ-করা পরিবেশ ছেড়ে আমি তাড়াতাড়ি বাইরের খুলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। দীর্ঘক্ষণ অপলক চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলুম, কিন্তু দিগন্তের গায়ে একটাও নৌকোর চিহ্ন চোখে পড়লো না। বাঁদিকের সৈকতে দেখলুম হালকা লাইলাক রঙের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরবাড়ি, উদ্যান আর উঁচু চূড়াটার ওপর। কিন্তু সবই কেমন যেন অদ্ভুত, নির্লিপ্ত আর বোধের অতীত বলে মনে হলো।

১৭

আগের মতো প্রতিদিন সকালবেলা ও আমার ঘরে কফি খেতে আসতো, কিন্তু কিছুতেই একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বসতো না। খিদে নেই বা ওই রকমের কোনো অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়তো, নয়তো হালকা ধরনের টুকিটাকি কিছু খেয়ে দায় সারতো।

সন্ধ্যের দিকে আমাদের মধ্যে আর কোনো কথাবার্তাই হতো না। কেন যে এমনটা হলো আমি জানি না। যেদিন আমি ওকে কাঁদতে দেখেছিলুম তার পর থেকেই ও আমাকে কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলতো, কখনও হালকা উপহাসের ছলে কথা বলতো, কখনও বা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। কেন জানি না ও আমাকে প্রায়ই 'শ্রদ্ধেয় মহাশয়' বলে সম্বোধন করতো। আগে যেসব অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনে ও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো, আজকাল তা শুনে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরেই বলে উঠতো, 'তখনকার দিনে তেমন কিছু ঘটা আদৌ বিচিত্র ছিলো না।'

কখনও কখনও এমনও হতো যে পরপর কদিন ওর সঙ্গে আমার দেখাই হলো না। অপরাধীর মতো দ্বিধাভরে আমি প্রায়ই ওর ঘরের

দরজায় মৃদু টোকা দিতুম, কিন্তু কোনো জবাব পেতুম না। বারবার টোকা দিতুম, দরজার ওপারে পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করতুম, কিন্তু বৃথাই সে প্রতীক্ষা। ওর পরিচারিকা এসে নিস্পৃহ গলায় জবাব দিতো, 'মাদাম পার্টিতে গ্যাছেন।' হোটেলের দীর্ঘ টানা বারান্দা ধরে আমি ধীরে ধীরে ফিরে আসতুম···উন্নতবক্ষা বিদেশী মহিলা আর লম্বা ঝুলওয়ালা উর্দি-পরা পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে দেখতুম। বারান্দার লম্বা ডোরা-কাটা গালচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই আমার মনে হতো যে অদ্ভুত একটা মেয়ের জীবনে আমি কেবল মিথ্যে অভিনয়ই করে চলেছি, এবং এর থেকে ফিরে আসার আমার আর কোনো শক্তি নেই। ঘরে ফিরে এসে বিছনায় শুয়ে শুয়ে আমি কেবল এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভাবতুম, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারতুম না। তবে এটা আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে আমি বাঁচতে চাই, এবং যত রুক্ষ কঠিনই হয়ে উঠুক না কেন ঝিনাইদার মুখের রেখা, ও-ই আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ, সবচেয়ে আপন মানুষ। ও আমাকে যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করুক না কেন, ওকে ছেড়ে নিঃসঙ্গ একা হয়ে আমি কিছুতেই বাঁচতে পারবো না।

সেদিন অস্থির পায়ে বারান্দায় পায়চারি করছি, রাত প্রায় এগারোটা, তখনও খাওয়া হয়নি···হঠাৎ সিঁড়িতে ঝিনাইদার পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় কেমন যেন একটু বাঁকা স্বরেই বললো, 'কি ব্যাপার, পায়চারি করছো? তা বাইরের একটু খোলামেলা জায়গায় ওটা করলে ভালো হতো না? আচ্ছা, চলি···শুভরাত্রি।'

'আজ কি আমাদের আর দেখা হবে না?'

'আমার মনে হয় আজ অনেক রাত হয়ে গ্যাছে। অবশ্য তুমি যদি চাও···'

ওর পেছন পেছন যেতে যেতে আমি রুক্ষ স্বরেই জিগেস করলুম, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'মন্টি কার্লোতে।' থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ও আমার মুখের দিকে তাকালো, তারপর পকেট থেকে দশটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে দেখলো। 'এই যে শ্রদ্ধেয় মহাশয়, রুলেট খেলে এগুলো আমি জিতেছি।'

'ছিঃ ছিঃ, তুমি জুয়া খেলেছো।'

'কেন নয়? কালকেও আবার যাবো।'

কল্পনায় আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম আঁটসাঁট পোশাক পরে বিষণ্ণ ম্লান মুখে জুয়ার টেবিলের সামনে মধুর লোভে মৌমাছির মতো ভিড় করে দাঁড়ানো কাণ্ডজ্ঞানহীন মতিচ্ছন্ন বুড়িদের মাঝখানে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন আমি বুঝতে পারলুম কেন আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ও রোজ মন্টি কার্লোতে যায়।

'না, তুমি আর ওখানে কোনোদিন যাবে না।' উত্তেজিত স্বরেই আমি প্রতিবাদ করলুম।

'মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে কোনো লাভ নেই। তাছাড়া আমি আর নতুন করে কিছু হারাতে রাজি নই।'

'হারানো না-হারানোর প্রশ্ন এটা নয়।' কণ্ঠস্বরে আমি কিছুতেই বিরক্তি চেপে রাখতে পারলুম না। 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যখন মানুষকে রোজগার করতে হয়, তখন তোমার ওই জঘন্য পরিবেশে জুয়া খেলতে লজ্জা করে না?'

'জুয়া না খেলে কি করবো শুনি? কথাটা যখন পাড়লে, তখন স্পষ্টই বলি—এখানেও আমার কিছু করার নেই, কি করবো বলো?'

'কি করবে সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে, অন্য কারুর পক্ষে বলা অত সহজ নয়।'

'না ইভানিচ, আমি শুধু নিসের কথাই বলছি না···এমনি, সাধারণ ভাবেও আমার কিছু করার নেই। কি করার আছে বলো?'

কোনো কথা না বলে আমি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ঝড়ের আশংকায় বুকের ভেতরটা তখন আমার দুর-দুর করে কাঁপছে।

কথা বলতে ঝিনাইদার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো, তবু কোনো রকমে হাঁফাতে হাঁফাতে ও বলে চললো, 'ভ্লাদিমির ইভানিচ, যা বুঝতে চেয়েছিলে তা যদি তুমি আর নিজেই বিশ্বাস না করো, তাহলে কেন কেন পিটার্সবুর্গ থেকে আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এলে? কেন তুমি আমার

কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কেনই বা এমন পাগল-করা আশা জাগিয়ে তুলেছিলে? তোমার ধারণা এখন অনেক পালটে গ্যাছে, তুমি এখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ…অবশ্য এর জন্যে কেউ তোমাকে দোষ দেবে না, কেননা আমাদের ধ্যান-ধারণা আমাদের 'বিশ্বাসকে আমরা ঠিক মতো কাজে লাগতে পারি না। কিন্তু, ভ্লাদিমির ইভানিচ, কেন কেন তুমি বিশ্বস্ত হতে পারলে না? দুঃসময়ের দিনগুলোতে যখন আমি একা একাই সোচ্চারের স্বপ্ন দেখেছি, পাগলের মতো খেপে উঠেছি, নতুন পরিকল্পনার কথা ভেবেছি, নতুন ভাবে নিজের জীবনকে গড়তে চেয়েছি, তখন, তখন তুমি আমাকে কেন সত্যি কথাটা বলোনি? তখন কেন তুমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ছিলে, কেন তোমার জীবনের কাহিনী শুনিয়ে আমাকে উদ্দীপ্ত করেছিলে, আর কেনই বা এমন ব্যবহার করে-ছিলে যেন আমার প্রতি তুমি কতই না সহানুভূতিশীল? তুমি বলো, এ সবের কি সত্যিই কোনো দরকার ছিলো?'

'কারুর রিক্ত নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা মেনে নেওয়া সত্যিই খুব কঠিন।' ধীরে ধীরে আমি ঘুরে দাঁড়ালুম বটে, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকাতে ঠিক সাহস পেলুম না। 'হ্যাঁ, নিজে মুখেই স্বীকার করছি, আমি বিশ্বাস হারিয়েছি, আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি, আমি হেরে গেছি… অনেক কষ্টে নিজেকে আমি সংযত করেছি '

কান্নার মতো কি যেন একটা আমার গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠলো, আমি আর কিছু বলতে পারলুম না।

আমার হাতদুটো নিবিড় করে জড়িয়ে ঝিনাইদা কোমল স্বরে বললো, 'জীবন সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা অনেক ইভানিচ, অনেক কিছু তুমি দেখেছো, আমার চাইতে অনেক বেশি তুমি জানো। আমাকে শেখাও, আমাকে তুমি বলো ইভানিচ আমি কি করবো। সামনে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে, যদি সঙ্গে করে কাউকে না নিতে চাও, অন্তত আমাকে বলো কোথায় যাবো। আর কিছু না হোক, আমি মানুষ…অনুভূতি বলে তো আমার একটা জিনিস আছে। প্রতারিত হওয়া কিংবা অসম্ভব একটা ভূমিকায় অভিনয় করে যাওয়া আমার পক্ষে

সত্যিই বেদনাদায়ক। আমি তোমাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না, শুধু জিগেস করছি—আমি কি করবো তুমি বলে দাও।'

এমন সময় চা এলো।

একটা পেয়ালা আমার হাতে তুলে দিয়ে ঝিনাইদা মিনতির মতো করুণ স্বরে বললো, 'এমন চুপ করে থেকো না ইভানিচ, দোহাই তোমার কিছু বলো।'

'জানলা দিয়ে যতটুকু দেখা যায়, পৃথিবী জুড়ে আলো তার চাইতে অনেক অনেক বেশি ঝিনাইদা।' একটু নীরবতার পর আমি আস্তে আস্তে বললুম। 'তাছাড়া আমাকে বাদ দিলেও এ পৃথিবীতে আরও অনেক লোক রয়েছে।'

'বলো, বলো, তারা কারা?' উৎসুক চোখ থেকে ঝরে পড়লো একরাশ ব্যাকুলিমা। 'সেইটেই তো আমি জানতে চাইছি।'

'আমিও তোমাকে বলতে চাই ঝিনাইদা, কেউ তার চিন্তাধারাকে নানান ভাবে কাজে লাগাতে পারে। কেউ যদি কখনও ভুল করে বা কারুর প্রতি বিশ্বাস হারায়, তার উচিত অন্য কাউকে খুঁজে নেওয়া। চিন্তার জগৎ অনেক বিশাল, অনেক ব্যাপক এবং কোনো দিনই তা ফুরিয়ে যায় না।'

'ও, তাই বলো, চিন্তার জগৎ!' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ঝিনাইদার ভ্রূদুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেলো। 'তাহলে আর তোমার সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই। কি দরকার মিছিমিছি···' চায়ের খালি পেয়ালাটা ও একপাশে সরিয়ে রাখলো। কোমল স্নিগ্ধতার পরিবর্তে ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠলো অবজ্ঞার কঠিন একটা অভিব্যক্তি। '···যাই বলো, এতদিনে একটা জিনিস কিন্তু আজ আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেলো—আসলে তোমার রক্ষিতা হয়েই থাকা আমার উচিত ছিলো। প্রগতিশীল সম্মানীয় একজন ব্যক্তির রক্ষিতা না হয়ে তার চিন্তাধারা অনুধাবন করা আর চিন্তাধারা আদৌ বুঝতে না পারা একই কথা। প্রথমে তোমার রক্ষিতা হয়ে থাকার দরকার ছিলো, তারপর বাকিটা আপনিই ঠিক হয়ে যেতো।'

'তুমি কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠেছো ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা।'

'না, আমি আন্তরিক ভাবেই একথা বলছি।'

'হয়তো তুমি আন্তরিক ভাবেই বলছো, কিন্তু কথাটা ভুল ঝিনাইদা। তুমি জানো না, তোমার কথা শুনে আমি কত ব্যথা পেয়েছি।'

'ব্যথা পেয়েছো?' ঝিনাইদা খিলখিল করে হেসে উঠলো। 'অন্য কেউ হলে না হয় বিশ্বাস করতুম। কিন্তু তুমি নয়। হয়তো তুমি ভাবছো আমি নিষ্ঠুর, আমার একটুও শালীনতাবোধ নেই। কিন্তু তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। তুমি তো আমাকে ভালোবাসো, তাই না?'

আমি কাঁধ ঝাঁকালুম।

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ হেনে ঝিনাইদা বলে উঠলো, 'যতই কাঁধ ঝাঁকাও, তুমি যখন অসুস্থ ছিলে, তোমার বিলাপের মধ্যে আমি তখন সব শুনেছি। তখন থেকেই তোমার মুগ্ধ চোখ, গভীর দীর্ঘশ্বাস, বন্ধুত্ব সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সবই না হয় বুঝতুম…কিন্তু আসল কথা হলো, কেন কেন তুমি আন্তরিক হয়ে উঠতে পারলে না? প্রকৃত সত্যকে গোপন রেখে যা সত্যি নয় কেন তুমি তার কথা বললে? প্রথম থেকে তুমি কি আমাকে একবারও বলেছো কেন তুমি পিটারসবুর্গ থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো? অথচ আমাকে জানানো উচিত ছিলো। তা না হলে সেদিন আমার মনে যে কথা জেগেছিলো তাই-ই করতুম—বিষ খেয়ে মরতুম। তাহলে আর এসব ছেলেখেলার কোনো প্রয়োজনই হতো না।'

একটানা কথা বলার ক্লান্তিতে হাঁফাতে হাঁফাতে একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

ক্ষুব্ধ স্বরেই বললুম, 'তুমি এমন ভাবে কথাগুলো বলছো যেন আগে থেকেই মনে মনে সন্দেহ করেছিলে আমার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো!'

'বাঃ, বেশ বলেছো! তোমার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো বলে আমি কখনও সন্দেহ করিনি, বরং তোমার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না বলেই আমি সন্দেহ করেছিলুম। সত্যিই যদি তোমার কোনো উদ্দেশ্য থাকতো, এতদিনে তাহলে আমি তা নিশ্চয়ই জানতে পারতুম। কল্পনা আর প্রেম ছাড়া

তোমার কিছুই ছিলো না। বর্তমানের জন্তে কল্পনা আর প্রেম, ভবিষ্যতে আমাকে তোমার রক্ষিতা হিসেবে পাওয়া—অর্থাৎ জীবন আর উপন্যাসকে তুমি একই সঙ্গে পেতে চেয়েছিলে। অথচ এর জন্তে অরলভকে তুমি নিজেই কত না ভর্ৎসনা করেছো। তবু ওর সঙ্গে একমত না হয়ে কোনো উপায় নেই, কেননা এইসব ধারণাগুলোকে ঘৃণা করার পেছনে ওর যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ আছে।'

'ধারণাগুলোকে ও শুধু ঘৃণাই করে না, ভয়ে ও তাদের এড়িয়ে যায়। ও ভীরু, মিথ্যেবাদী।' আমি প্রতিবাদ করলুম।

'খুব তো বলছো ও ভীরু, ও মিথ্যেবাদী, ও আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আর তুমি, তুমি কি? ও আমাকে প্রতারিত করেছে, পিটার-সবুর্গে আমাকে আমার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে ও পালিয়ে গ্যাছে, আর তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করে এখানেই ফেলে যেতে চাইছো। তবু ও তার কল্পনায় কখনও ছলনার আশ্রয় নেয়নি, আর তুমি…'

'দোহাই ঝিনাইদা, কেন তুমি এসব কথা বলছো?' দ্রুত পায়ে ওর কাছে এসে আতংকগ্রস্তের মতো আমি চিৎকার করে উঠলুম। 'লক্ষ্মীটি শোনো, মিছিমিছি এত হতাশ হবার কোনো কারণ নেই।' আমি যেন ক্ষীণ একটা আশার আলোক দেখতে পেলুম, যা এখনও আমাদের দু-জনকে বাঁচাতে পারে। 'জীবনে এত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যা ভাবলে আমার মাথা ঝিমঝিম করে। তবু অন্তর দিয়ে আমি একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি—প্রতিবেশীর প্রতি উৎসর্গীকৃত ভালোবাসায় মানুষ কখনও তার সত্যিকারের লক্ষ্যকেন্দ্র খুঁজে পায় না। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

অনুকম্পা প্রার্থীর ভঙ্গিতেই আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলুম, কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরেই কেমন যেন একটা কপটতা অনুভব করলুম, বিভ্রান্ত ভাবটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারলুম না।

'আমি বাঁচতে চাই ঝিনাইদা, আমি চাই শান্তি, উষ্ণতা আর নিবিড় একটা প্রশান্তি। এখানের এই সমুদ্র আর তোমাকে কাছে পেতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করে…ইচ্ছে করে এই জীবনতৃষ্ণাকে তোমার মধ্যেও প্রবল ভাবে জাগিয়ে তুলতে। তুমি আজ এই যে ভালোবাসার কথা বললে,

কিন্তু তোমাকে যদি শুধু আমার কাছে পাই, তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, তোমার চোখের ভাষা পড়তে পারি, সেই হবে আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেও আমাকে বাধা দিয়ে ঝিনাইদা দ্রুত বলে উঠলো, 'তুমি জীবনকে ভালোবাসো, আর আমি তাকে ঘেন্না করি। আমাদের দুজনের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন ইভানিচ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়ে পায়ে ও নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। 'আমার মনে হয় এখানেই আমাদের সব সম্পর্ক শেষ করে দেওয়া উচিত। আমি যখন আর কিছুই চাই না, তখন কি হবে মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে।'

আমিও ওর পেছন পেছন যেতে যেতে বললুম, 'না, কিছুতেই এভাবে শেষ হতে পারে না!'

'আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়।'

আমার মুখের সামনেই দরজাটা ও দড়াম করে বন্ধ করে দিলো। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি আমার নিজের ঘরে ফিরে এলুম। গভীর রাতে আবার ওর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্টই শুনতে পেলুম কান্নার শব্দ।

পরের দিন ভোরে আমার জামা কাপড় দেবার সময় পরিচারকা মৃদু হেসে জানালো তেরো নম্বর ঘরের ভদ্রমহিলার অবস্থা খুব সঙ্গিন। কোনো রকমে পোশাক পালটে আমি পড়ি কি মরি করে ছুটলুম। গিয়ে দেখি একজন ডাক্তার, ধাত্রী আর দারিয়া মিখাইলোভনা নামে একজন রুশ বয়স্কা ভদ্রমহিলা ওকে ঘিরে রয়েছে। বাতাসে ইথারের গন্ধ ভাসছে। ঘরের চৌকাঠ পেরুতে না পেরুতেই শুনতে পেলুম চাপা একটা গোঙানির শব্দ। তখনই হঠাৎ কেন জানি—অরলভ, তার ঠাট্টা-বিদ্রূপ, পলিয়া, নেভা নদী, তুষার-ঝড়, ঢাকনাবিহীন একা, নিশান্তিকার হিমেল আকাশ আর 'নিনা, নিনা' বলে সেই আর্তচিৎকার যেন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো।

'ওঁর কাছে যান।'

রুশ ভদ্রমহিলার মিষ্টি কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙলো।

মন্থর পায়ে আমি ঝিনাইদার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালুম, মনে হলো আমি যেন সন্তানের পিতা হতে চলেছি। ঝালর-দেওয়া হালকা ঢিলে বহির্বাসে ও চোখের পাতা বন্ধ করে শুয়ে রয়েছে। ওর বিশীর্ণ ম্লান মুখে পাশাপাশি ছুটো অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে—একটা আশ্চর্য করুণ আর উদাসীন, অন্যটা শিশুর মতো সরল আর অসহায়। হয়তো আমার উপস্থিতি ও টের পায়নি, তাই পলকহারা চোখে ওর মুখেব দিকে তাকিয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম।

কিন্তু একটু পরেই অসহ্য যন্ত্রণায় ও কুঁকড়ে উঠলো, চোখ মেলে ছাদের দিকে এক নিমেষে তাকিয়ে রইলো। ভাবখানা এই রকম যেন ব্যাপারটা ও কিছুই জানে না। ছু চোখের পাতায় জড়ানো একরাশ করুণ উদাসীনতা।

'উঃ, মা গো!' অস্ফুট স্বরে ও বলে উঠলো।

চকিতে আমি ওর ওপব ঝুঁকে পডলুম, বাতাসের মতো ফিসফিসিয়ে জিগেস করলুম, 'তোমার কি হয়েছে ঝিনাইদা?'

উপেক্ষার ভঙ্গিতেই ঝিনাইদা এবার আমার মুখেন দিকে তাকালো, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিযে চোখের পাতা বন্ধ করলো।

স্থবিব হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁডিয়ে থাকাব পর আমি চলে এলুম।

রাত্তিরে দারিয়া এসে খবর দিলো মেয়ে হয়েছে, মায়ের অবস্থা কিন্তু খুবই আশংকাজনক। বাইরের টানা বারান্দায় সত্যিই তখন গোলমাল আর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। অবাক হয়ে আমি দারিয়ার মুখের দিকে তাকাই। ফ্যাকাশে মুখে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে ও বললো, 'সত্যিই, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ডাক্তার সন্দেহ করছেন উনি বোধহয় বিষ পান করেছেন। একজন রুশবাসীর পক্ষে এটা কি করে সম্ভব আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না!'

পরের দিন ছুপুরে ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা মারা গেলো।

১৮

দেখতে দেখতে ছুটো বছর কেটে গেলো। অবস্থারও অনেক পরিবর্তন

ঘটেছে। আমি আবার পিটারসবুর্গে ফিরে এসেছি। এখন আমার আর একা থাকার বা ভাবপ্রবণ হবার কোনো অবকাশ নেই। ঝিনাইদা ফিওদ্রো- ভনার মেয়ে সোনিয়াকে পরিচর্যা করেই আমার দিন কাটে। আমি নিজে হাতে ওকে খাওয়াই, স্নান করিয়ে দিই, বিছনায় শুইয়ে ঘুম পাড়াই, এমন কি রাত্তিরেও এক মুহূর্তের জন্যে ওকে চোখের আড়াল করি না। স্বাভাবিক সরল জীবনের প্রতি আমার তৃষ্ণা ক্রমেই তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো এবং যখনই সোনিয়ার মুখের দিকে তাকা- তুম, আমার মনে হতো এতদিন যা চেয়েছি আমি যেন ওর মধ্যেই তা খুঁজে পেয়েছি। ওকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতুম। ওকে দেখে আমার মনে হতো ওর মধ্যেই আমি চিরদিন চিরটাকাল বেঁচে থাকবো। এ শুধু কল্পনা নয়, আমি যেন তা স্পষ্ট উপলব্ধি করতুম। বিশ্বাস করতুম এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে যখন চলে যাবো, তখনও আমি বেঁচে থাকবো শিশুর ছোট্ট ওই দুটো নীল চোখের তারায়, ওর গুচ্ছ গুচ্ছ নরম রেশমী চুলের মধ্যে, ওর নিটোল গোলাপী দুটো হাতের মধ্যে, যা দিয়ে আমার গলাটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আদর কেড়ে নেয়।

সোনিয়ার ভবিষ্যৎই আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলতো। অরলভ ওর বাবা, জন্মের সময় সাক্ষ্যলিপিতে ওর নাম লেখানো হয়ে- ছিলো ক্রাসনভস্কি এবং আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে ওকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এনেছিলুম। ফলে ওর সম্পর্কে আমাকে গভীরভাবে ভাবতে হয় বইকি।

পিটারসবুর্গে পৌছে পরের দিনই আমি অরলভের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। ঠিক জার্মানদের মতো দেখতে লালচে দাড়িওয়ালা গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার একজন দরোয়ান আমাকে দরজা খুলে দিলো। পলিয়া তখন বৈঠকখানায় ঝাড়মোছের কাজ করছে, আমাকে ও চিনতেই পারলো না। অরলভ কিন্তু আমাকে একনজরেই চিনে ফেললো।

'আরে, বিপ্লবী মশাই যে!' আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে হাসতে হাসতে সে জিগেস করলো। 'তারপর, কি ব্যাপার, হঠাৎ কি মনে করে?'

অরলভ কিন্তু একটুও পালটায়নি—সেই একই রকম ফিটফাট বাবু, অখুশি মুখ, ঠোঁটে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি। টেবিলে পড়ে রয়েছে হাতির দাঁতের ছুরি গোঁজা নতুন একটা বই। আমার আসার আগে পর্যন্ত সে নিশ্চয়ই বইটা পড়ছিলো। আমাকে বসতে বলে একটা চুরুট দিলো আর মাঝে মাঝে অভিজাত সম্প্রদায়ের অহংকারী দৃষ্টি মেলে এমন ভাবে জরিপ করতে লাগলো যেন এক মুখ দাড়ি গজিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমার মধ্যে কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রথমে আমরা পারীর আবহাওয়া সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করলুম। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী যে প্রশ্নটা আমাদের দুজনেরই মনের মধ্যে গুনগুন করছিলো তার পাট চুকিয়ে ফেলার জন্যে অরলভ তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলো, 'ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনা তাহলে মারা গ্যাছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাচ্চা হবার সময়?'

'হ্যাঁ। ডাক্তার অবশ্য মৃত্যুর অন্য কারণ সন্দেহ করেছেন, কিন্তু… আপনার আমার দুজনেরই পক্ষে এ কথা মনে করে নেওয়া শ্রেয় হবে যে বাচ্চা হবার সময়েই ও মারা গ্যাছে।'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরলভ খানিকক্ষণের জন্যে গুম হয়ে বসে রইলো। তারপর আমাকে ঘরের চারদিকে তাকাতে দেখে সচকিত হয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এখানের সবকিছু সেই আগের মতো চলছে, কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি। তুমি হয়তো জানো আমার বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন অবসর গ্রহণ করেছেন, আমি এখনও সেই একই দফতরে কাজ করছি। পেকারস্কিকে তোমার মনে আছে? ও এখনও ঠিক সেই আগেরই মতো রয়েছে। বছর খানেক আগে গ্রুজিন ডিপথেরিয়ায় মারা গ্যাছে। কুকুশকিন এখনও বেঁচে আছে, ও প্রায়ই তোমার কথা বলে। ও, হ্যাঁ, ভালো কথা…কুকুশকিন যখন তোমার পরিচয় জানতে পারলো, সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলো তুমি নাকি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে এবং ওকে হত্যা করারও চেষ্টা করেছিলে, ও নাকি কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে।'

আমি কোনো কথা কইলুম না, ঠিক যেমন বসেছিলুম চুপচাপ বসে রইলুম।

অরলভ রসিকতার সুরে বলে উঠলো, 'পুরনো ভৃত্যরা কখনও তাদের মনিবকে ভোলে না·· তুমি এসে বেশ ভালোই করেছো। কি খাবে বলো, মদ না কফি?'

'না, ধন্যবাদ। আমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি গ্রিগরি ইভানিচ।'

'গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমার তেমন কোনো আগ্রহ নেই, তবে তোমার কোনো কাজে আসতে পারলে সত্যিই খুব খুশি হবো। কি চাও, বলো?'

'না, মানে ··' উত্তেজিত হয়ে আমি বলতে শুরু করলুম। 'ঝিনাইদা ফিওদ্রোভনার সেই বাচ্চা মেয়েটা আমার কাছে রয়েছে। এতদিন আমিই ওর দেখাশোনা করেছি, কিন্তু আমাকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। মরার আগে শুধু এইটুকু জেনে যেতে চাই ওর একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি।'

পলকের জন্য রাঙা হয়ে উঠে অরলভ ভ্রূ কুঁচকে ম্লান চোখে আমার মুখের দিকে তাকালো। 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার'এর চাইতে আমার মুখে মৃত্যুর কথা শুনে ওর সমস্ত অবয়বে অস্থির একটা ভাব ফুটে উঠলো। যেন রোদের হাত থেকে চোখ বাঁচাতে চাইছে এমন ভঙ্গিতে কপালের ওপর হাত রেখে ও বললো, 'হুঁ, ভাববার মতো কথা বটে! তা কি যেন বললে, মেয়ে?'

'হ্যাঁ, ফুটফুটে···ভারি সুন্দর দেখতে।'

'তা তো হবেই, কুকুরের বাচ্চা যখন নয়···বুঝতে পারছি, ব্যাপার-টা এখন আমাদের খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব তা আমি নিশ্চয়ই করবো। সত্যি, এ ব্যাপারে আমি তোমার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।'

উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে অরলভ পায়চারি করতে লাগলো। এক সময়ে একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে বললো, 'এ সম্পর্কে কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আজই

আমি পেকারস্কির কাছে গিয়ে বলবো ক্রাসনভস্কির সঙ্গে দেখা করতে। বাচ্চাটাকে নিতে ও অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু ক্রাসনভস্কির সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।'

'কেন, বাচ্চাটার নামের সঙ্গেই তো ওর সম্পর্ক রয়েছে ?'

'হ্যাঁ, আইনত উনি হয়তো মেয়েটাকে গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু গিগরি ইভানিচ, আমি আপনার কাছে আইনের পরামর্শ নিতে আসিনি।'

'হুঁ, তা ঠিক···আমিই হয়তো আজেবাজে বকে চলেছি। ঠিক আছে, আমি বরং পেকারস্কির সঙ্গে এ ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করবো। ও কোনো না কোনো একটা উপায় বাতলে দিতে পারবে। যদি কিছু মনে না করো, তুমি বরং আমাকে ঠিকানাটা দাও, আমরা কি ব্যবস্থা নিলুম তোমাকে আমি জানিয়ে দেবো। কোথায় থাকো বলো ?'

অরলভ আমার ঠিকানাটা লিখে নিলো, তারপর গভীর একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে হাসতে হাসতে বললো, 'সত্যি, ছোট কোনো বাচ্চার বাবা হওয়া যে কি ঝকমারি ! যাই হোক, পেকারস্কি সব ব্যবস্থা করে দেবে। এসব ব্যাপারে ওর আবার দারুণ মাথা। তুমি কি প্যারীতে অনেক দিন ছিলে ?'

'হ্যাঁ, প্রায় ছ মাস।'

পাছে সোনিয়া প্রসঙ্গে আবার কোনো কথা ওঠে, সেই ভয়ে অরলভ তাড়াতাড়ি আমার চিন্তার মোড় অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করলো। 'হয়তো এতদিনে তুমি তোমার চিঠির কথা নিশ্চয়ই ভুলে গ্যাছো। কিন্তু চিঠিটা আমি আজও সযত্নে রেখে দিয়েছি। তোমার তখনকার মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারি এবং আমার চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তোমার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষণগুলো সত্যিই ভারি চমৎকার।' মুখে স্বীকার করলেও অরলভের চাপা ঠোঁটে ফুটে উঠলো তীক্ষ্ন বিদ্রূপের হাসি। 'হ্যাঁ, তোমার প্রাথমিক ধারণা সত্যের খুবই কাছাকাছি। কিন্তু জীবনটা আমার যেমন অস্বাভাবিক তেমনি জঘন্য, কারুই কোনো কাজে লাগবে না। আর নতুন জীবন শুরু করার পেছনে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি

অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা হলো ভীরুতা। এ পর্যন্ত তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু তুমি আমাকে যতটা অযৌক্তিক ভেবে মনে মনে হতাশ হয়েছো ঠিক ততটা নয়।'

'রক্ত-মাংসের কোনো মানুষ যখন ছাখে সে নিজে এবং তার আশ-পাশের সবকিছুই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন সে হতাশ না হয়ে পারে না।'

'সে কথা সবাই জানে। উদাসীনতা সম্পর্কে আমার কিছুই বলার নেই, আমার যা কিছু জিজ্ঞাস্য জীবনের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে। দৃষ্টিভঙ্গি যত বাস্তবধর্মী হবে, ভুল বা বিপদের আশংকা থাকবে তত কম। প্রত্যেকেরই উচিত সবকিছুর মূল ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখা এবং প্রতিটা ব্যাপারে প্রকৃত কারণটাকে খুঁজে বার করা। আসলে আমরা ভীষণ শ্লথ আর দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমাদের যুগটাই এমন সব লোকে ভরে গ্যাছে যারা কেবল স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভোগে আর ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করে। ক্লান্তি আর অবসাদের কথা বলা ছাড়া আমরা আর কিছুই করি না। কিন্তু দোষটা তোমার বা আমার নয়, সমস্ত যুগের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা খুবই সামান্য। আমরা স্নায়বিক অবসাদে ভুগছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের পরবর্তী যুগের জন্যে হয়তো তা উল্লেখযোগ্য কোনো উদাহরণ হয়ে থাকবে। ঈশ্বরের ইঙ্গিত ছাড়া মাথার একগাছা চুলও নড়ে না, অর্থাৎ মানুষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে হঠাৎ করে কিছুই ঘটে না। প্রত্যেকটারই পেছনে কোনো না কোনো অনিবার্য কারণ থাকে। আর তা যদি সত্যি হয়, আমাদেরও এত হতাশ হবার কোনো কারণ নেই।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।' একটু চুপ করে থেকে আমি বললুম। 'আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এই যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অনাগত যুগের মানুষের কাছে তা খুবই স্পষ্ট এবং শিক্ষণীয় হয়ে উঠবে। কিন্তু সবাই চায় অনাগত যুগের কথা না ভেবেই বাঁচতে। কেননা জীবন আমরা একবারই লাভ করি, এবং আমরা চাই সাহসের সঙ্গে সুন্দর, সচেতন ভাবেই বাঁচতে। প্রত্যেকেই স্বাধীন ভাবে নিজের নিজের স্মৃতিচিহ্ন রেখে যেতে চায়, চায়

ইতিহাস সৃষ্টি করতে, যাতে পরবর্তী কালের মানুষ আমাদের কখনও না তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। আমি বিশ্বাস করি এ সবই অবশ্যম্ভাবী এবং কোনোটাই উদ্দেশ্যবিহীন নয়, কিন্তু তা বলে আমি কেন আমার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে হারাতে যাবো?'

'হ্যাঁ, সেইটেই তো হয়েছে মুশকিল।' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরলভ এমন ভাবে উঠে দাঁড়ালো যেন আমাদের আর কিছুই বলার নেই।

টুপিটা তুলে নিয়ে আমি হলঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম।

আমার কোট পরার সময়টুকু ও অপেক্ষা করলো, তারপর আমাকে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে দেখে যেন মনে মনে স্বস্তি পেলো। 'ঠিক আছে, তুমি কিছু ভেবো না···আমি আজই পেকাবস্কির সঙ্গে দেখা করবো।'

'গ্রিগরি ইভানিচ, আপনি বরং আমার চিঠিটা ফিরিয়ে দিন।'

'নিশ্চয়ই।'

পড়ার ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ও আবার চিঠিটা নিয়ে ফিরে এলো। ওকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলুম।

পরের দিন আমি অরলভের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলুম। ব্যাপার-টার একটা সন্তোষজনক সমাধানে পৌছনো সম্ভব হয়েছে বলে ও আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ও লিখেছে পেকারস্কি একজন ভদ্র-মহিলাকে জানে, যাঁর শিশুনিকেতন ধরনের ছোট একটা শিক্ষায়তন আছে এবং সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রাখা হয়। তবে ভদ্রমহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে ক্রাসনভস্কির সঙ্গে একবার আলোচনা করা দরকার এবং সেইজন্যে জন্মের সাক্ষ্যলিপিটা বিশেষ প্রয়োজন।··

আমি যখন চিঠিটা পড়ছিলুম, সোনিয়া তখন টেবিলের সামনে বসে নির্নিমেষ চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো, যেন ও বুঝতে পেরেছে ওর ভাগ্যের চরম পরিণতি।

১৮৯৩

সেদিন বৃদ্ধ পোস্টমাস্টার স্নাদকোপারজভের স্ত্রী মারা যাওয়ায় আমাদের কয়েক জনকে শবানুগমন করতে হয়েছিলো। তারপর কবর দেওয়ার ঝামেলা চুকেবুকে যাওয়ার পর পূর্বপুরুষদের রীতি অনুযায়ী 'মরণউৎসব'এ যোগ দেওয়ার জন্যে আমরা সবাই ডাকঘরে এসে হাজির হলাম।

টেবিলে যখন ঘরে-তৈরি সুন্দর বড় বড় কেকগুলো সাজিয়ে দেওয়া হলো, ঠাকুদ্দার বয়েসী বিপত্নীক পোস্টমাস্টারের চোখে জল এসে গেলো। 'কেকগুলো ঠিক আমার স্ত্রীর মসৃণ গালের মতো টুকটুকে লাল। আর সত্যি বলতে কি, ওর ছিলো যেমন জৌলুস তেমনি রূপ…'

রূপ মানে, রীতিমতো রূপসী। সবাই একবাক্যে স্বীকার করলো। 'ঠিক যেন ডানাকাটা পরী।'

'হ্যাঁ, সবাই ওর রূপ দেখে চমকে যেতো। তবে, সত্যি বলতে কি জানো ভায়া, আগুনের মতো ওর ওই গনগনে রূপের জন্যেই আমি ওকে ঠিক ভালবাসতে পারিনি…যাকে বলে চপলমতী। তা ওর মতো বয়েসের পক্ষে সেইটেই তো স্বাভাবিক। তবু এসব কিছু সত্ত্বেও ওর চরিত্রের যে দিকটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো, তা হলো বিশ্বস্ততা। ষাট বছরের একটা বুড়ো স্বামীর প্রতি কুড়ি বছরের একজন রূপসী তরুণী স্ত্রীর বিশ্বস্ততা…'

গির্জার ঘন্টাবাদক, সেও আমাদের সঙ্গে খাচ্ছিলো, এবার মুখ নিচু করে খুক খুক করে কাশলো।

বুড়ো পোস্টমাস্টার চকিতে তার দিকে ঘুরে তাকালো। 'কি, কথাটা তোমার বিশ্বাস হলো না বুঝি?'

'না, অবিশ্বাস ঠিক নয়, তবে কিনা…রূপসী স্ত্রী…এই মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু অভিসারে…'

'ওঃ, আমার কথাটা তাহলে বিশ্বাস হলো না। বেশ, ঠিক আছে, আমি তোমাদের প্রমাণ দোবো। আসলে ব্যাপারটা কি জানো ভায়া, ও বিশ্বস্ততা রাখতে বাধ্য হয়েছিলো শুধু আমারই কলা-কৌশলের জন্যে…

মানে, বলতে পারো ওটা ছিলো আমার এক ধরনের রক্ষাকবচ। আমার এই চালাকি বুদ্ধির জন্যেই সম্ভবত আলিওনা কোনোরকম অবিশ্বস্ততা করার সুযোগ পায়নি। ফলে বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত শান্তিতে ঘুমতে আমার কোনোদিন কোনো অসুবিধে হয়নি।'

'সেই চালাকি বুদ্ধিটা কি, ঠাকুর্দা?'

'খুব সহজ। আর তোমরাও তা জানো। সারা শহরে আমি রটিয়ে দিয়েছিলুম—আমার স্ত্রী আলিওনা জাঁদরেল পুলিস-সার্জেন্ট ইভান আলেক্সিয়েভিচ সালিখাৎস্কির রক্ষিতা। আশা করি এই একটা শব্দই যথেষ্ট। বদরাগী পুলিস সার্জেন্টের ভয়ে কেউ আর পিরিত করার জন্যে ওর ধারেকাছেও ঘেঁষতো না। ঘুরঘুর করা তো দূরের কথা, পারতপক্ষে কেউ আলিওনার ছায়াও মাড়াতো না।' দিল খুলে বুড়ো পোস্টমাস্টার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। 'ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো? যদি তোমার বেড়ালটা রাস্তায় আপন মনে ঘুরে বেড়ায় তো অমনি পুলিস-সার্জেন্ট তোমার বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দেবে যে বেড়ালটা পড়শীদের শান্ত নিরীহ ভেড়ার পালকে উত্যক্ত করে মেরেছে।'

'তাহলে ঠাকুর্দা, আমাদের ঠানদি ইভান আলেক্সিয়েভিচের রক্ষিতা নয়?' রীতিমতো অবাক হয়েই আমরা অস্ফুটস্বরে জিগেস করলাম।

'আরে, না না। ওইটেই তো আমার রক্ষাকবচ। তা না হলে তোমাদের মতো ফোচকেগুলোর চোখ কি আর ও অত সহজে এড়াতে পারতো?'

ঘর কাঁপিয়ে ঠাকুর্দা আবার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। কয়েক মিনিট আমরা কেউ আর কোনো কথা বলতে পারলাম না, বরং বুড়োর চালাকির জন্যে মনে মনে অস্বস্তিই বোধ করলাম।

গির্জার ঘন্টাবাদকই প্রথম মুখ খুললো, 'তাহলে ঠাকুর্দা, আপনি বরং আর একটা বিয়ে করুন।'

১৮৮৩

আজকের দিনে হাতের দস্তানা হারানোর চাইতে নিজের বিশ্বাস হারানো অনেক সহজ, এবং আমিও তা হারিয়েছি।

তখন রাত হয়ে এসেছে, বাসে করে ফিরছি। আমার মতো উচ্চপদস্থ একজন সরকারী কর্মচারীর এভাবে সাধারণ যাত্রীবাসে যাতায়াত করা শোভা পায় না, কিন্তু এবার আমি পেল্লাই কালো ওভারকোটের আড়ালে নিজেকে বেশ ভালো করে ঢেকে নিয়েছি। সস্তা তো বটেই···তাছাড়া এত রাতে ঠাণ্ডায় এমন ভিড়ের মধ্যে কেউ আমাকে চিনতেই পারবে না। বিশেষ করে লোমের এই উঁচু কলারটার জন্যেই এভাবে ছদ্মবেশের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। উদাস মনে ঝিমুতে ঝিমুতে এগিয়ে চলেছি···

'আচ্ছা, সে না!' সামনের আসনে বেড়ালের চামড়ার কোট গায়ে ছোটখাটো লোকটার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম। 'না, সে নয়। হ্যাঁ, সেই তো।' নিশ্চয়ই সে!'

নিজের চোখকেও আমি যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না!

বেড়ালের চামড়ার কোট-পরা লোকটা ইভান কাপিতোনিচ, আমার নিম্নপদস্থ একজন কেরানি। লোকটা এমনই হাঁদাগঙ্গারাম আর মনমরা গোছের যে এ পৃথিবীতে কারুর হাত থেকে রুমাল পড়ে গেলে কুড়িয়ে দিয়ে কৃতার্থ হাওয়া ছাড়া যেন তার আর কোনো কাজ নেই। বয়েসে তরুণই বলতে হবে, পিঠটা দুমড়ে গেছে, পাদুটো বাঁকা, প্রস্তুত-হয়ে-দাঁড়ানো সৈনিকের মতো হাতদুটো যেন সব সময়ই পাজামার সঙ্গে লেপটে রয়েছে। মুখটা দেখলে মনে হবে যেন দরজার দু-কপাটের মাঝে হঠাৎ করেই আটকে গেছে আর ভিজে কম্বল দিয়ে জম্পেস করে তালি দেওয়া হয়েছে। বকাবকা তো দূরের কথা, দেখলেই কেমন যেন কষ্ট হয়, মায়া লাগে। আমাকে দেখলেই ও ভয়ে থরথর করে কাঁপে, প্রথমে বিবর্ণ, তারপরেই লাল হয়ে ওঠে, যেন আমি ওকে ধরে আস্ত গিলে ফেলবো। একবার ওকে আমি ঘরে পরে শোবার একটা পোশাক দিয়েছিলাম,

ওর তো ওরেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার জোগাড় হয়েছিলো আর কি।

ওর মতো বিনীত, বাধ্য, এমনকি অপদার্থ আর একজনেরও নাম আমার মনে পড়ে না।

বেড়ালের চামড়ার কোটপরা ছোট খাটো লোকটাকে যে শুধু ইভান কাপিতোনিচের মতো দেখতে তাই নয়, বাসের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে ও যেভাবে রাজনীতি আলোচনা করছে তাতে সে না হয়ে পারেই না।

' 'বিসমার্কের হাত'এর নায়ক গামবেটা মারা গ্যাছে!' উত্তেজিত ভাবে হাত নেড়ে নেড়ে সে বলছে। 'নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করবেন না ইভান মাত্তভেইচ, উনি জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অনেকটা জায়গা পুনরুদ্ধারও করেছিলেন। শুধু কৌশল নয়, মানুষ হিসেবেও উনি ছিলেন মহান। জাতে ফরাসী হলে কি হবে, ওঁর অন্তঃকরণ ছিলো সাচ্চা রাশিয়ানের মতো। যাকে বলে সত্যিকারের একটা প্রতিভা!'

হ্যাঁ, সেই নিষ্কর্মার ধাড়িটাই বটে!

কনডাকটর যখন ভাড়া চাইতে এলো, গামবেটাকে ছেড়ে সে তখন তাকে নিয়েই পড়লো। 'গাড়ির ভেতরটা এত অন্ধকার কেন? একটাও আলো নেই, এটা কোন ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা? আসল অসুবিধেটা কি জানেন, আপনাদের শিক্ষা দেবার কেউ নেই। বিদেশ হলে আপনাদের সমঝে দিতো! কোথায় আপনারা জনতার সেবা করবেন তা নয়, জনতাই আপনাদের সেবা করে চলেছে। যত্ত সব! আমি জানি না পরিচালক-মণ্ডলীদের মাথায় কি ভূত চেপেছে আর আপনাদেরও বলিহারি, এতটুকু সৌজন্যবোধ যদি থাকতো···এই যে কনডাকটর-মশাই, হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। একটুকু সরে দাঁড়ান, ভদ্রমহিলাকে বসতে দিন। ভাড়া নেওয়ার আগে যাত্রীদের সুবিধের দিকে একটু নজর দিতে হয়, বুঝলেন?'

'তা না হয় বুঝলাম,' কনডাকটর কড়া স্বরেই জবাব দিলো। 'কিন্তু বাসে ধূমপান নিষেধ। এটা বেআইনি।'

'বেআইন! কার আইন? কে দিয়েছে এই হুকুম? এ আমার স্বাধীনতায় রীতিমতো হস্তক্ষেপ করা! আমার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করবে আমি এ কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। এ দেশের আমি একজন

স্বাধীন নাগরিক।'

অসম্ভব! আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম, নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। না...ও নয়। ও হতেই পারে না। ব্যবহার করা তো দূরের কথা 'গামবেটা' 'স্বাধীনতা'র মতো কোনো শব্দই ও জানতে পারে না।

'অবশ্য এককভাবে আমার কিছুই করার নেই।' জানলা গলিয়ে সিগারেটটা সে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। 'সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পর্কে মানুষ যদি উদাসীন হয়, অন্যায় নীতিবোধকে যদি তারা প্রশ্রয় দেয়, তাহলে আমার আর কি করার থাকতে পারে? তবু এসব ভাঁড়ামি সহ্য করা সত্যিই অসম্ভব!'

আমি আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না, হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসি শুনে চমকে সে আমার দিকে চকিতে ফিরে তাকালো। সম্ভবত, সম্ভবত কেন, নিশ্চয় কণ্ঠস্বর শুনে কালো ওভার-কোটের আড়ালেও সে আমাকে চিনতে পারলো। তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো, পিঠটা মুনড়ে গেলো, মুখটা ঝুলে পড়লো, হাতদুটো শক্ত হয়ে পাজামার সঙ্গে লেপ্টে রইলো। মুহূর্তের মধ্যে এইসব পরিবর্তনগুলো ঘটে গেলো। হ্যাঁ, এখন আমার আর কোনো সন্দেহই রইলো না—ও ইভান কাপিতোনিচ, আমার নিম্নপদস্থ একজন কেরানি। বেড়ালের চামড়ার কোটের মধ্যে মুখ গুঁজে ও গুটিসুটি হয়ে বসে রয়েছে।

আমি তখনও স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি আর অবাক হয়ে ভাবছি—কেমন করে তা সম্ভব! ওর মতো মাথামোটা একটা হাঁদাগঙ্গারাম কেমন করে 'স্বাধীনতা' 'সাংস্কৃতিক চেতনা' 'নীতি-বোধ' শব্দগুলোকে এমন অনায়াসে ব্যবহার করতে পারলো! এও কি সম্ভব? হাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি!

এর পরেও কি বলবেন এইসব বহুরূপীগুলোকে বিশ্বাস করতে? না, আমি অন্তত করিনি, কেননা আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর ঝিকে হুকুম করা হলো কোনো রকম শব্দ না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেলতে আর বাচ্চাদের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো খেলতে। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত, দড়ি-পাকানো শীর্ণ চেহারা, কোটরে ঢোকা চোখ, তীক্ষ্ণ নাক বাড়ির মালিক ওলিপ ফিওদোরিচ ক্রোচকভ তাঁর পকেট থেকে একটা পাণ্ডুলিপি টেনে বার করলেন, অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বারকয়েক কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেন, তারপর নিজের লেখা পাণ্ডুলিপিটা পড়তে শুরু করলেন।

তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ব্যঙ্গনাটকের বিষয়বস্তু খুবই সাধারণ এবং সরকারী অনুমোদন বিভাগের অধ্যক্ষকে ক্ষুব্ধ করতে পারে এমন কিছুই এতে নেই। কাহিনীটা এই রকম—ইয়াসনোসার্ভসেভ নামে একজন সরকারী কর্মচারী ত্রস্ত পায়ে মঞ্চে প্রবেশ করে তার স্ত্রীকে জানাবে সরকারী উপদেষ্টা ক্লেসচভের চাইতে খুব উচ্চপদস্থ একজন সেনাপতি লিজাকে দেখতে আসছেন, তাদের একমাত্র মেয়ে লিজাকে নাকি ওঁর খুব পছন্দ হয়েছে। এর পর জাঁদরেল একজন সেনাপতির শ্বশুর হবার সৌভাগ্যে আত্মহারার ইয়াসনোসার্ভসেভের দীর্ঘ স্বগতোক্তি আছে— "আঃ, পদকে পদকে তাঁর সারা শরীর যেন ঢেকে গেছে! তুমি যদি তাঁর পাশে বসে থাকো কেউ কিছু মনে করবে না, যেন বিশাল এ পৃথিবীতে তুমি তখন আর নিতান্তই সাধারণ কোনো তুচ্ছ মানুষ নও!" এমনি সব জটিল স্বগতোক্তির মধ্যেই ভাবি শ্বশুর হঠাৎ আবিষ্কার করলো রান্নাঘর থেকে হাঁসের মাংস পুড়ে যাওয়ার বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে। এরকম উৎকট গন্ধের মধ্যে কোনো সম্মানীয় অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানো সত্যিই লজ্জাজনক ব্যাপার। ইয়াসনোসার্ভসেভ চেঁচিয়ে স্ত্রীকে গালমন্দ করতে লাগলো, স্ত্রীও গলা ফাটিয়ে পাড়া মাথায় করতে শুরু করলো। সে এক হুলস্থূল কাণ্ড। কেঁদে-ককিয়ে স্ত্রী চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে, ভাবি শ্বশুর স্ত্রীকে থামাবার জন্যে মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করেছে। এরকম ঝগড়াটে জনক মা-বাবার সঙ্গে কোনো মানুষ বাস করতে পারে না

বলে খেয়ে জামা কাপড় পরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। ব্যাপারটা ক্রমশ মন্দ থেকে আরও মন্দের দিকে গড়িয়ে গেলো। শেষের দিকে সেই সম্মানীয় অতিথি মঞ্চে এসে দেখলেন মূর্ছিতা স্ত্রীকে ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখছেন, একজন পদস্থ পুলিস কর্মচারী বসে বসে শান্তি-ভঙ্গের অভিযোগগুলো খাতায় টুকে নিচ্ছে। ব্যাস্, কাহিনী বলতে শুধু এইটুকুই। ইত্যবসরে অবশ্য নাট্যকার কায়দা করে লিজার প্রেমিক গ্রানস্কিকেও শেষ দৃশ্যে হাজির করেছেন, আইন-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সে, যুক্তিবাদী, ক্ষুদ্র এই নাটিকার অন্যতম অগ্রণী চরিত্র।

পড়া শেষ করে নাট্যকার ক্রোচকভ শ্রোতাদের মুখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিলেন—কেউ হাসছে কিনা অনুমানে জরিপ করে নেবার জন্যে। কিন্তু না, বলা যায় সবাই বরং অভিভূতই হয়েছে। সপ্রশংস চোখে ক্রোচকভ জিগেস করলেন, 'কি, কেমন লাগলো বলো?'

প্রত্যুত্তরে মিত্রোফান নিকোলায়েভিচ জামাজুরিন, সব চেয়ে প্রবীণ শ্রোতা, চাঁদের মতো মসৃণ চাঁদির চারপাশে ঢেউ খেলানো রূপোলী চুল, আসন ছেড়ে উঠে অশ্রুসজল চোখে উনি ক্রোচকভকে জড়িয়ে ধরলেন। 'সত্যি, আগাগোড়া সবটাই তুমি এমন চমৎকার বর্ণনা করেছো যে··· ছাখো, এই বুড়ো মানুষটারও চোখে জল এসে গেছে।'

'দারুণ, দারুণ!' আনন্দের আতিশয্যে পোলামরাকভ প্রায় লাফিয়েই উঠলেন। 'একেই বলে সত্যিকারের প্রতিভা! লেখো, লেখো! আরে ভাই, চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়ে লেখায় মন দাও। কতদিন আর নিজের প্রতিভাকে এভাবে লুকিয়ে রাখবে শুনি?'

এর পরে এলো একের পর এক অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা জানানোর পালা, তারপরেই এলো সফেন মদিরার পেয়ালা।

ক্রোচকভ প্রথমে রক্তিম হয়ে উঠলেন, তারপর প্রায় নিজের ভারসাম্য হারিয়ে টেবিলের চারপাশে পায়চারি করতে লাগলেন। 'লেখার তীব্রতা আমি দীর্ঘদিন ধরেই অনুভব করেছি···বলতে পারো সেই ছোটবেলা থেকে। তাছাড়া ব্যঙ্গকে আমি নিপুণভাবে ব্যবহার করেছি প্রায় সর্বত্রই, পেশাদার রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করেছি বছর দশেক···এ ছাড়া আর কি

চাই বলো? নাটকের ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারলে নিশ্চয়ই আমি অন্য অনেকের চেয়ে নিকৃষ্ট হবো না, কি বলো?'

'বাস্তব অভিজ্ঞতা?' জামাজুরিন বলে উঠলেন। 'ঠিক ঠিক, আমিও এইটে বলতে যাচ্ছিলাম। সত্যের প্রয়োজনে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ক্ষমা করবে ক্লোচকভ। কেননা সত্য চিরকালই সত্য, এবং তার ঠাঁই সবার ওপরে। যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমি স্পষ্টই বলবো, এক্ষেত্রে সরকারী উপদেষ্টা ক্লেসচভের নাম উল্লেখ করে তুমি খুব একটা ভালো করোনি···বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোনো প্রয়োজনও ছিলো না। তাছাড়া সেনাপতি···হ্যাঁ, এখানে সেনাপতিকে তুমি যেভাবে উপস্থিত করেছো, তাতে আমাদের সেনাপতি খুবই ক্রুদ্ধ হতে পারেন, উনি ভাবতে পারেন তুমি বুঝি হুবহু ওঁকে নকল করেছো। যদিও উনি আমাদের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেন, তবু বেঁকে বসতে আর কতক্ষণ। না না ভাই, তুমি বরং ওটা বাদই দিয়ে দাও!'

'হুঁ, তা অবশ্য ঠিক,' ক্লোচকভ গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'দেখি, কতটা রদবদল করতে পারি··· আমি বরং 'হুজুর'এর পরিবর্তে সব জায়গাতেই 'মহামান্য' শব্দটা ব্যবহার করবো। কিংবা কোনো পদ ব্যবহার না করে শুধু ক্লেসচভ বললেই হবে··'

'আরও একটা জিনিস,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে পোলামরাকভ বাধা দিলেন। 'যদিও ব্যাপারটা খুব তুচ্ছ, তবু কেমন যেন বড্ড দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছে··· এই যে গ্রানস্কি, লিজার প্রেমিক, সে যখন লিজাকে বললো বাবা-মা আপত্তি করলে ওঁদের অমতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে··· ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ, অনেক সময় বাবা-মারা অহেতুক কোনো কারণেই তাঁদের সন্তানদের ওপর নির্দয় হন, কিন্তু আজকের দিনে কেমন করে তা এত স্পষ্টাস্পষ্টি বলা সম্ভব? আমার তো রীতিমতো ভয় হচ্ছে, এর জন্যে তোমাকে আবার ভবিষ্যতে না নাকানি-চোকানি খেতে হয়।'

'হ্যাঁ, ওখানটা একটু উগ্র হয়ে গেছে,' জামাজুরিনও স্বীকার করলেন। 'আমার মনে হয় ওটা আর একটু মসৃণ হওয়া উচিত। তাছাড়া আনন্দের আতিশয্যে ভাবি শ্বশুরের স্বগতোক্তিটাও বাদ দেওয়া উচিত। কেননা···

হ্যাঁ, যদিও ব্যাপারটা খুবই আনন্দের, তবু এ নিয়ে হাসি-তামাসা…না ভাই, এটা আমার আদৌ পছন্দ হচ্ছে না। কেননা আমাদের সেনাপতিও গরীবঘরের খুব সাধারণ একজন মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন,…তার মানে, তোমার কি ধারণা উনি ভুল করেছিলেন? এতে উনি কি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হবেন না? ধরো, একদিন উনি শখ করেই তোমার নাটকটা দেখতে গেলেন…উনি কি খুশি হবেন? ভুলে যেও না ক্রোচকভ, তুমি যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, উনিই তোমাকে আর্থিক সাহায্য পাবার জন্যে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন…'

'ঠিক, খুব ঠিক কথা!' নাট্যকারের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বুলিয়াগিন মুচকি মুচকি হাসলো। 'ওঁর চরিত্রের এ দিকটা আপনার নাটকে প্রায় অনুপস্থিতই রয়ে গেছে।'

'তুমি কিন্তু একটা জিনিস ভুল করছো, বুলিয়াগিন,' ক্রোচকভ প্রতিবাদ করলেন। 'বিশেষ কাউকে মনে রেখে আমি এই চরিত্রটা সৃষ্টি করিনি। সত্যি, বিশ্বাস করো।'

'হয়তো করেননি, কিন্তু আমাদের চোখকে আপনি কেমন করে ফাঁকি দেবেন বলুন? আমরা সবাই জানি উনি মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করতে একটু বেশিই ভালবাসেন। আর ওই পুলিস অফিসারটিকে বাদ দিন। এই নাটকে ওকে উপস্থিত না করাই ভালো…'

'আর ইয়াসনোসার্ভসেভটি কে জানো? আমাদের অফিসের ইনাকিন। ক্রোচকভ খুব ভালো করেই জানে—ইনাকিন আর ওর স্ত্রী দুজনে ঠিক সাপে-নেউলে, দিনরাত খিটিমিটি লেগেই রয়েছে। আর ওদের মেয়েটিও হয়েছে ঠিক লিজার মতো। তুমি অবশ্য ওদের ফুটিয়ে তুলেছো খুব সুন্দর ভাবে।'

'তা ঠিক, তবু ইনাকিন সম্পর্কে একটা অভিযোগ থেকেই যায়,' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জামাজুরিন বিষণ্ণ চোখে তাকালেন। 'ওর মতো একটা ইতর অভদ্র পাজিকে তোমার নাটকে স্থান দেওয়া…না, ওসিপ, এটা আমার আদৌ ভালো ঠেকছে না। আমাদের মনে হয় ওকে বরং বাদ দেওয়াই ভালো…কি দরকার, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে…'

'কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়।' জামাজুরিনের কথায় প্রায় জোর টেনেই পোলামরাকভ বলে উঠলেন, 'যদিও একটা ব্যঙ্গনাটক, তবু বলা যায় না, হয়তো এই ব্যঙ্গের ঠেলাতেই তোমার বুকের ঘা শুকতে লাগবে দশটা বছর। আর যাই হোক, তুমি তো আর গোগল কিংবা ক্রিলভ নও। ওঁরা হলেন, যাকে বলে সত্যিকারের স্রষ্টা। ওঁদের তুলনায় তোমার শিক্ষা বা যোগত্যা আর কতটুকু···এত ক্ষুদ্র যে প্রায় চোখেই পড়ে না। না ভাই, তুমি বরং এসব মতলব ছেড়েই দাও। সত্যি, আমাদের মনিব যদি একবার জানতে পারেন, তখন যে কি হবে বলা মুশকিল।'

'আপনি বরং ওটা ছিঁড়েই ফেলুন।' চাপা গলায় বুলিয়াগিন পরামর্শ দিলো। 'আমরা কাউকে বলবো না। কেউ যদি জিগেসও করে আমরা বলবো আপনি কি যেন একটা পড়ে শুনিয়েছেন যার মাথামুণ্ডু আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'না না, ওসব বলার দরকার কি ? কেউ যদি জিগেস করে আমরা মিথ্যে বলবো না।' বোদ্ধার ভঙ্গিতে জামাজুরিন টাকে হাত বোলালেন। 'মানুষ অবশ্য নিজের কথাই ভাবে সবার আগে···তবু কেউ একজন ভুল করলে তার ফল ভোগ করতে হয় অনেককেই। জীবনে এ সম্পর্কে আমার অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তুমি অসুস্থ মানুষ, কেউ তোমার ওপর তেমন করে চড়াও হবে না, আর আমরাও পাঁচ কানে ছড়াবো না। আমি আবার এসব আদৌ পছন্দ করি না।'

'চুপ চুপ ! কে যেন আসছে বলে মনে হচ্ছে···পাণ্ডুলিপিটা আপনি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলুন, ক্লোচকভ !'

ক্লোচকভের ম্লান মুখ থেকে নিমেষে কে যেন সমস্ত রঙ মুছে নিলো, চকিতে উনি পাণ্ডুলিপিটা লুকিয়ে ফেলে পেছন ফিরে তাকালেন। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'তা অবশ্য ঠিক, মিথ্যে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে পাঁচজন পাঁচ কানে ছড়াবে··· তবে আমার কি মনে হয় জানো, এ নাটকে এমন একটা কিছু আছে যা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, হয়তো অন্যেরা একদিন পারবে ···তবু এটা আমি ছিঁড়েই ফেলবো, আপনারা কিন্তু অনুগ্রহ করে

কাউকে কিছু বলবেন না।'

এর পর পরিবেশন করা হলো আর এক প্রস্থ সফেন মদিরার পেয়ালা। অতিথিরা আকণ্ঠ পান করে বিদায় নিলেন।

১৮৮৪

কিন্তু এক শরতের রাতে আন্দ্রেই স্তেপানোভিচ পেরেসোলিন থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরছিলেন। নির্জন পথে ঘোড়ার খুরের ছন্দের তালে তালে তন্ময় হয়ে উনি নাটকেরই নানান দৃশ্যের কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ জেলা প্রশাসন ভবনের কাছাকাছি আসতেই ওঁর তন্ময়তা টুটে গেলো, ভবনের আলোকিত দুটো জানলার দিকে উনি চোখ তুলে তাকালেন। সাহিত্যের ভাষায় বলা যায় যে বিভাগের তিনিই একমাত্র কর্ণধার।

'কি ব্যাপার, জরুরী বিবরণটা ওরা এখনও শেষ করতে পারলো না?' পেরেসোলিন নিজের মনেই বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। 'একজনের বদলে চারজনকে দিলাম, অথচ এখনও শেষ হলো না! হা ভগবান, লোকে ভাববে আমি ওদের সারা রাত খাটিয়ে মারছি! নাঃ, গিয়ে ওদের একটু তাড়া দিয়ে আসা উচিত। এই, গাড়ি থামাও!'

গাড়ি থেকে নেমে পেরেসোলিন ভবনের দিকে এগিয়ে চললেন। সামনের ফটকটা বন্ধ থাকায় পেছনের দরজা দিয়ে উনি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেন। পরমুহূর্তেই দেখা গেলো মন্ত্রণাকক্ষের হাট হাট খোলা দরজার সামনে উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু ভেতরে তাকাতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বিরাট টেবিলের একপাশে স্তূপীকৃত সব কাগজপত্তর, অন্য পাশে আলোর ঠিক নিচে বসে চারজন কেরানি তাস খেলছে। স্থির নিশ্চল, ঢাকনা-দেওয়া সবুজ আলোর প্রতিফলনে ওদের মুখগুলো মনে হচ্ছে ঠিক যেন পাতালপুরীর যক্ষের মতো, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, জালিয়াতের মতো। আর ওদের খেলার ভঙ্গি-টাও মনে হচ্ছে কেমন যেন আরও রহস্যময়। খেলার মাঝে মাঝেই ওরা যেভাবে চিৎকার করে উঠছে, তাতে বোঝা যায় ওরা ভিন্ট খেলছে। কেরানি চারজনকে পেরেসোলিন স্পষ্টই চিনতে পারলেন—সেরাফিম জেভিদুলিন, স্তেপান কুলাকেভিচ, ইয়েরেমিয়ে নেদইয়াকভ এবং ইভান শিস্থলিন।

'কি ভেবে তুমি এই চালটা দিলে শুনি?' মুখোমুখি বসা জুড়িদারের

দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে জেভিডুলিন চাপা স্বরে গর্জন করে উঠলো। 'এটাকে কি একটা চাল বলে? এখনও আমার হাতে ধরা রয়েছে ভরো-ফিয়েভ, সেপেলেভ, তার বউ, আর ইয়েরলেকভ। আর তুমি কিনা চাল দিলে কোকেকিন। দুটো পয়েন্ট আমরা তাহা হেরে গেলাম। তোমার মগজে যদি একটু ঘিলু থাকতো, তাহলে তুমি পোগাকিনকে ফেলতে!'

'তাতে কি লাভ হতো শুনি?' জুড়িদার ফোঁস করে উঠলো। 'ধরো আমি না হয় পোগাকিনকেই ফেলে দিলুম, কিন্তু তখনও আমার হাতে রয়েছে পেরেসোলিন।'

'কি ব্যাপার, আমার নামও রয়েছে দেখছি!' পেরেসোলিন আপন মনেই কাঁধ ঝাঁকালেন। 'আমি তো এদের খেলার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না!'

পিস্নুলিন নতুন করে তাস বেঁটে দিতেই আবার খেলা শুরু হয়ে গেলো।

'স্টেট ব্যাঙ্ক।'

'দুটো কোষাগার।'

'আমি কোনো টেক্কা পাইনি।'

'একটাও টেক্কা পাওনি? হুঁ। আমি আবার দু দুটো জেলা প্রশাসক পেয়েছি। শালা, হারি তো এতেই হারবো। গালাগাল দিও না ভাই, আমি এই শিক্ষামন্ত্রীকেই ফেলে দিলুম।'

'এই পিটটা আমার। শিক্ষামন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ!'

'সত্যি, ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!' পেরেসোলিন মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলেন।

'আমি চাল দিলুম রাষ্ট্র-উপদেষ্টাকে। ভানিয়া, তোমার যদি ছোট-খাটো কোনো উপদেষ্টা কিংবা পুঁচকে কোনো সচিব থাকে ফেলে দাও।'

'অত সস্তা নয়। আমার হাতে এখনও পেরেসোলিন রয়েছে।'

'রিবনিকভ থাকতে পেরেসোলিনকে আর তাড়াতে কতক্ষণ। তোমরা তিন দান হেরে গেছো। বেশ, এবার পেরেসোলিনের গিন্নীটাকে বার করো তো দেখি। উঁহুঁ, হারামজাদীটাকে হাতের তলায় লুকলে কি হবে

ভালোয় ভালোয় বার করো চাঁদ…'

'আমার স্ত্রীও তাহলে এদের কাছে ঠাট্টার বিষয়!' পেরেসোলিনের সারা শরীর রাগে রিরি করে উঠলো। 'নাঃ, এ অসহ্য!'

অন্ধকারের ওপার থেকে দুড়দাড় পা ফেলে উনি ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। কবরখানার হিমেল হাওয়ায় সবাই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। পেরেসোলিনকে চিনতে পেরে নেদইয়াকভেব মনে হলো তার নাক দিয়ে যেন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। কুলাকেভিচের মনে হলো তার কানের কাছে কে যেন তুমুল শব্দে মাদল পেটাচ্ছে, গলাবন্ধটা তার আপনা আপনিই আলগা হয়ে গেলো। কেরানিরা যে যার হাতের তাস ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো, পরস্পরের মুখের দিকে চকিতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই আবার মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিলো। মুহূর্তের জন্যে সারা ঘর ভবে উঠলো নিটোল নিস্তব্ধতায়।

'বাঃ, এই তোমাদের জরুরী কাজ! চমৎকার!' রাগে থমথম করছে পেরেসোলিনের সারা মুখ 'এখন বুঝতে পারছি জরুরী কাজটা শেষ করার জন্যে তোমাদের এত তাড়া কিসের। কি করছিলে এতক্ষণ?'

'এই এমনি, দু-এক মিনিটের জন্যে একটু বিশ্রাম করছিলুম স্যার··· আমতা আমতা করে জেভিচ্‌লিন কোনো রকমে কথাটা শেষ করলো।

পেরেসোলিন পায়ে পায়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, দেখলেন টেবিলের ওপর খুব সাধারণ ধরনের একজোড়া তাস পড়ে রয়েছে। কিন্তু প্রতিটা তাসের সামনের দিকে সমান মাপের ছবি সাঁটা। অজস্র মানুষের ছবি। এদের মধ্যে থেকে তিনি নিজেকে, তাঁর স্ত্রী, এবং নিম্নপদস্থ কয়েকজন সঙ্গীসাথীকে স্পষ্ট চিনতে পারলেন।

'অসম্ভব! এই তাস দিয়ে তোমরা খেলো কি ভাবে? আমি তোমাদের ডাকতে শুনেছি, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি। কি ব্যাপার, সবাই এমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, আমি কি তোমাদের গিলে ফেলবো নাকি? কি ভাবে খেলো আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও তো দেখি।'

কিছুটা ভয়ে কিছুটা বা বিহ্বলতায় জেভিচ্‌লিন মুহূর্তের জন্যে স্থাণুর

মতো দাঁড়িয়ে রইলো। রাগে কিন্তু প্রথমে লাল, পরে কৌতূহলে পেরেসোলিনকে অধৈর্য হয়ে উঠতে দেখে সে টেবিল থেকে তাসগুলো তুলে নিলো, ভালো করে ভাঁজলো, তারপর সবাইকে বেঁটে দিয়ে বোঝাতে শুরু করলো।

'প্রত্যেকটা ছবিই স্যার এক একটা তাসের মতন, চার রকমের বাহা-মোটা তাস···কোষাগারের অফিসাররা হরতন, জেলা প্রশাসকরা চিড়ে-তন, শিক্ষামন্ত্রীরা সব রুইতন আর স্টেট ব্যাঙ্কের মনিবরা সব ইস্কাবন। এবার একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন স্যার··· রাষ্ট্রের প্রকৃত উপদেষ্টারা হলেন সব টেক্কা, রাষ্ট্রের সাধারণ উপদেষ্টারা হলেন সাহেব, তাঁদের স্ত্রীরা সব বিবি. তাঁদের অধীনস্থ উপদেষ্টারা হলেন গোলাম, আদালতের উপ-দেষ্টারা হলেন দশা, এমনি ভাবে সব কমতে কমতে যাবে। এবার স্যার ···আপনি বরং আমার হাতটাই দেখুন। আমার তিন, কেননা আমি একটাই মাত্র জেলা সচিব পেয়েছি।'

'ও, আচ্ছা! তাহলে আমার এটা গো একটা টেক্কা?'

'হ্যাঁ, চিড়ের টেক্কা। তাছাড়া স্যার, আপনার একটা চিড়ের বিবিও রয়েছে।'

'হুঁ! এবার মাথায় একটু একটু ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা একহাত খেলো তো দেখি, কেমন লাগে।'

একটু মুচকি হেসে পেরেসোলিন ওভারকোটটা খুলে ফেললেন, তার-পর টেবিলে এসে বসলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্য খেলুড়েরাও সাহস করে যে যার আসনে বসে পড়লো। তাস ভেঁজে নতুন করে আবার খেলা শুরু হলো।

পরের দিন সকালবেলায় ঝাঁট দিতে এসে নাজার ঝাড় হাতেই পাথরের প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। পেরেসোলিনকে এখন অসম্ভব ক্লান্ত বিবর্ণ আর নিদ্রাতুর দেখাচ্ছে, এলোমেলো রুক্ষ চুল, মেদ-ইয়াকভের সামনে দাঁড়িয়ে তার কোটের বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বলছেন, 'তুমি যদি জানতে আমার হাতে আমি নিজে এবং একই রঙের পরপর তিনটে তাস রয়েছে, তাহলে তুমি কিন্তু কিছুতেই সেপেলেভকে

ফেলতে না। জেভিজ্‌দিনের. হাতে যখন রয়েছে রুবনিকভ, তার স্ত্রী, তিনটে স্কুলের শিক্ষক আর আমার স্ত্রী; কুলাকেভিচের হাতে রয়েছে স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা আর তিনটে ছোট ছোট জেলা প্রশাসক, তখন তোমার ক্রিসকিনকেই ফেলে দেওয়া উচিত ছিলো। আসলে ওরা যে কোষাগারটা ফেলে গ্যাছে সেটা তুমি খেয়ালই করোনি।'

'না স্যার, আসলে আমি ভেবেছিলুম ওদের কাছে একটা প্রকৃত রাষ্ট্র উপদেষ্টা আছে, তাই জেলা উপদেষ্টাকে ফেলে দিয়েছিলুম।'

'কিন্তু সত্যিকারের কোনো খেলায় এসব আজেবাজে ভাবলে তো আর চলবে না। এভাবে খালে কেবল মুচি আর মুদ্দোফরাসরা। মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে ভাখো একবার, কুলাকেভিচ যখন আদালতের একজন উপদেষ্টাকে ফেলে দিলো তখন তোমার ইভান ইভানভিচ গেরলান্দোস্কিকে ফেলে যাওয়া উচিত ছিলো। কেননা তুমি জানতে ওর কাছে নাতালিয়া দ্মিমিত্রিয়েভনা, আরও দুটো রঙ এবং ইগর ইগরিচ রয়েছে। অথচ এত জানা সত্বেও তুমি সবটাই মাটি করে দিলে! বেশ, আমি তোমাকে এক্ষুনি প্রমাণ করে দিচ্ছি। বোসো সবাই, আর এক হাত হয়ে যাক।'

স্তম্ভিত ঝাড়ুদার নাজারকে ঘর থেকে ভাগিয়ে দিয়ে খেলুড়েরা আবার নতুন করে তাস বাঁটতে শুরু করলো।

১৮৮৪

নাটকীয়

কোথায় লুকালে প্রিয়তমা, এখন কোথায় তোমাকে আমি খুঁজবো ?

জনপ্রিয় লোকসংগীত ।

প্রথম : আপনার টুপিটা খুলে নিন। এখানে টুপি-পরা নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় : এটা টুপি নয়, রেশমী ফেজ।

প্রথম : ব্যাপারটা একই।

দ্বিতীয় : না, এক নয়। আপনি ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ কোপেক দিয়ে একটা টুপি কিনতে পারেন, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও আপনি কোনো রেশমী ফেজ···

প্রথম : টুপি আর ফেজ, দুটো একই জিনিস।

দ্বিতীয় : আর একটু স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে বলুন। (মাথা থেকে ফেজটা খুলে উত্তেজিত হয়ে) আমি বলছি, টুপিটা টুপিই, কিন্তু ফেজ···

প্রথম : চুপ করুন। দোহাই আপনার, অপরের শোনায় বাধা-সৃষ্টি করবেন না !

দ্বিতীয় : আপনিই বাধা-সৃষ্টি করছেন, আমি নই। আমি সারাক্ষণ মুখ বুজেই ছিলাম। আপনি এসে বিরক্ত না করলে সারাক্ষণ মুখ বুজিয়েই থাকতাম।

প্রথম : চুপ—চুপ—চুপ···

দ্বিতীয় : কোন সাহসে আপনি আমাকে চুপ করতে বলেন ? আমিও আপনাকে চুপ করতে বলতে পারি। দেখুন, চোখ রাঙাবেন না···আপনার মতো অমন লোক আমি ঢের দেখেছি, বুঝলেন ?

দ্বিতীয়ের স্ত্রী : আঃ, চুপ করো না !

দ্বিতীয় : কেন উনি সদ্দারী করতে এলেন ? আমি ওঁকে প্রথম বিরক্ত করিনি, করেছি কি ? তাহলে উনিই বা আমাকে বিরক্ত করতে আসেন কোন সাহসে ?

প্রথম : আচ্ছা, খুব হয়েছে···এবার থামুন।

দ্বিতীয় : কেন, দাঁতে ঘা লেগেছে বুঝি ? ওই যে কথায় বলে না—

তান তার লেজ ধরলো না লেজই শয়তানকে ধরলো···
জনতার কণ্ঠস্বর : চুপ ! চুপ করুন !
দ্বিতীয় : দর্শক পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ওঁর কাজ কোথায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, না তার বদলে উনি এখন নিজেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছেন। (ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে হেসে) তার ওপর আবার বুকে পদক ঝুলিয়ে রেখেছেন ! ঠিক আছে, একটু পরেই দেখা যাবে ঝকমকে পদকের স্ফুলিঙ্গগুলো এক এক করে নিভে যাচ্ছে··

[কোনো কথা না বলে প্রথম মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলো।]

অবিবেচকের মতো কথা বলায় হতভাগাটা নিজেই লজ্জা পেয়ে গ্যাছে। ও যদি আর একটাও কথা বলতো, তুমি দেখতে, ওর গালে এইসান এক থাপ্পড় কষাতাম, বাছাধন লেজ গুটিয়ে পালাবার পথ পেতো না। ওর মতো বদমাইসগুলোকে কি করে ঢিট করতে হয় আমি জানি।
দ্বিতীয়ের স্ত্রী : দোহাই তোমার, এবার একটু চুপ করো। সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
দ্বিতীয় : তাকালে তো ভারি বয়েই গেলো। নিজের গাঁটের পয়সা দিয়ে টিকিট কেটেছি। তাছাড়া আমি যদি কোনো অন্যায় করতাম, তাহলে না হয় তুমি বলতে পারতে। ঠিক আছে, ও যখন চলে গ্যাছে, আমি আর একটাও কথা বলবো না···কিন্তু ও যদি সদ্দারী করতে না আসতো, আমার কথা বলার কোনো কারণই ছিলো না। ছিলো, বলো ?
প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ : (যেন মাটি থেকে হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে ওঠে) এই যে। বেরিয়ে আসুন।
দ্বিতীয় : কেন ? কোথায় ? (বিবর্ণ হয়ে) এসবের অর্থ কি ?
ওরা সবাই : বেরিয়ে আসুন। (দ্বিতীয়ের হাতদুটো চেপে ধরে) উহুঁ, ওভাবে লাথি ছুঁড়বেন না। সোজা হেঁটে চলুন।

[ওরা টানতে টানতে তাকে নিয়ে চললো।]

দ্বিতীয় : আমি নিজের পয়সায় টিকিট কিনেছি, নাকি কিনিনি ?··· তাছাড়া এটা রীতিমতো অপমানকর।
দর্শকের মধ্যে থেকে : মনে হচ্ছে ওরা বোধ হয় চোর ধরেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারপ্রাপ্ত পুলিস কর্মচারীর কাছে একজন সেপাইয়ের বিবৃতি

মহামহিমের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে মিখাল্‌কভোর অরণ্যে পুরনো খাঁড়ির ওপর কাঠের সাঁকোটা পেরুবার সময় দেখলাম গাছের ডালে একটা মৃতদেহ ঝুলছে। ওর পকেটে পাওয়া কাগজপত্তর থেকে জানতে পারলাম ওর নাম স্তেপান ম্যাক্সিমভ কাচাগভ, বয়েস একান্নো। মৃতের জামা-কাপড় দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় ও একেবারে নিঃস্ব রিক্ত। গলায় দড়ির দাগ ছাড়া সারা শরীরে আর কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। আত্মহত্যার স্পষ্ট কোনো উদ্দেশ্যই বোঝা যাচ্ছে না, হয়তো ভদকার জন্যেও হতে পারে। কেননা জাবরভোর কৃষকরা ওকে ভাটিখানা থেকে বেরুতে দেখেছিলো। দফতরের নিয়মানুসারে আমি কি কোনো বিবৃতি দেবো, না মহামহিম সশরীরে এখানে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো?

আপনারই একান্ত বিশ্বস্ত সেপাই

দেনিস

১৮৮৫

একবার এক ভদ্রলোকের ঘোড়া চুরি গেলো। পরের দিন সবকটা সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন বেরুলো : "ঘোড়াটাকে যদি আমার আস্তাবলে ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আমি আমার বাবারই পূর্বাশ্রিত চরম পন্থা অনুসরণ করতে বাধ্য হবো।" এই ভয় দেখানোতেই যথেষ্ট কাজ হলো। প্রকৃত ঘটনাটা কিছু জানে না, অথচ অস্বাভাবিক ধরনের ভয়ঙ্কর কোনো শাস্তির কথা ভেবে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে চোরটা গোপনে ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে এলো। ঘোড়াটাকে ফিরোত পেয়ে ভদ্রলোক দারুণ খুশি হলেন এবং বন্ধুদের কাছে হাসতে হাসতে বললেন তাঁকে যে বাবার নীতি অনুসরণ করতে হয়নি এর জন্যে উনি সত্যিই আনন্দিত।

'কেন, আপনার বাবা কি করেছিলেন?' ওরা অবাক হয়ে জিগেস করলো।

'আপনারা জিগেস করছেন আমার বাবা কি করেছিলেন? বেশ, তাহলে শুনুন। বাবার ঘোড়াটা যখন চুরি যায় তখন উনি দূরের একটা খামার বাড়িতে বাস করছেন। যখন দেখলেন ঘোড়াটা আস্তাবলে নেই, তখন উনি ঘোড়ার জিনটা নিজের কাঁধের ওপর ফেলে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে এলেন। ভাগ্যিস, চোরটা যদি এমন বাধ্যভাবে ঘোড়াটা না ফিরিয়ে দিতো তাহলে আমাকেও হয়তো তাই করতে হতো।'

'সার্জেন্ট প্রিসিবিয়েভ ! তেসরা সেপ্টেম্বরে পুলিস কর্মচারী জিগিন, অঞ্চল-প্রধান আলিয়াপভ, গ্রামরক্ষী ইয়েফিমভ, সাক্ষী ইভানভ আর গেভ্রিলভ, এবং অন্য আর দুজন গ্রামবাসীকে অপমান করা, অহেতুক গালাগালি দেওয়া এবং বেআইনীভাবে প্রহার করার জন্যে আপনাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। প্রথম তিনজনকে তাঁদের কর্তব্যরত অবস্থায় আপনি অপমান করেছেন। আপনি কি নিজের অপরাধ স্বীকার করছেন ?'

প্রিসিবিয়েভ নিম্নপদস্থ একজন প্রাক্তন সেনাপতি, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বিচারকের অভিযোগ শুনে বুক টান টান করে দাঁড়ালেন। তারপর যখন জবাব দিলেন, ধরা-ধরা গলায় শব্দগুলো মনে হলো যেন কুচকাওয়াজের মাঠে প্রতিধ্বনিত এক একটা নির্দেশনামার মতো।

'হুজুর, আপনি ন্যায়ের বিচারক ! আইনের শর্ত অনুযায়ী পারস্পরিক ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বা প্রতিটা ঘটনার পারি-পার্শ্বিকতা যাচাই করে দেখা উচিত, প্রতিটা সাক্ষ্য প্রমাণের যথার্থতা বিশ্লেষণ করা উচিত। না, অপরাধী আমি নই, বরং অপরাধ করেছে আর সবাই। আমি বলবো যাকিছু ঘটনার মূল সূত্রপাত ওই মৃতদেহটাই—ঈশ্বরের কৃপায় ওর আত্মা শান্তি লাভ করুক। উক্ত মাসের তিন তারিখে, আমি আর আমার স্ত্রী আনফিসা, দুজনেই বেশ শান্তিতে চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, হঠাৎ দেখলুম কি নদীর ধারে একটা জটলা। নিজের মনে মনেই প্রশ্ন করলুম—ওরা এখানে কি করছে ? ওদের এখানে এভাবে জটলা করার অধিকার কে দিলো ? মানুষের পক্ষে ভেড়ার পালের মতো এভাবে জটলা করা কি সম্ভব ? তাই আমি ওদের চিৎকার করে বললুম—তোমরা এভাবে এখানে কেউ ভিড় কোরো না, যাও সব ! তখন আমি বকাবকি করে ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম…'

'কিন্তু আপনি তো আর অঞ্চলপ্রধান বা গ্রামরক্ষী নন—এভাবে ভিড় ভেঙে দেওয়ার সত্যিই কি কোনো প্রয়োজন ছিলো ?'

'না, হুজুর…সবতাতেই ওঁর সর্দারী !' কাছারির অন্য প্রান্ত থেকে

জনতার সম্মিলিত গুঞ্জন শোনা গেলো। 'আজ দীর্ঘ পনেরো বছর উনি আমাদের এইভাবে জ্বালাচ্ছেন। সেই সেনাবাহিনী ছেড়ে আসার পর থেকেই ওঁর সব অত্যাচার আমাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে হুজুর। এক এক সময় মনে হয় গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাই!'

'হ্যাঁ হুজুর, কথাটা সত্যি।' অঞ্চল-প্রধান ওদের বক্তব্যকে সমর্থন করলো। 'সারা গাঁ, প্রত্যেকেই ওঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে হুজুর। ওঁর জ্বালায় কেউ এক বিন্দু স্বস্তিতে নিঃশ্বেস নিতে পারে না। প্রতিমূর্তি নিয়ে, বিয়েতে, কিংবা যখনই কোনো শোভাযাত্রা বেরোয়—উনি চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেন, শোভাযাত্রা ভেঙে দেবার জন্যে হুকুম করেন। একটু দুষ্টুমি করলেই বাচ্চাদের কান মুলে দেন, মেয়েদের পেছনে আড়ি পাতেন·· একদিন ওঁর বাড়ির আশেপাশে সবাইকে গান গাইতে আর আলো জ্বালাতে নিষেধ করলেন।'

'শুনুন,' বিচারক ওঁকে বাধা দিলেন। 'এসব অভিযোগ শোনার জন্যে পরে আপনাদের সুযোগ দেওয়া হবে, কিন্তু তার আগে সার্জেন্ট প্রিসিবিয়েভের কথা শুনতে দিন। আপনি বলুন, সার্জেন্ট প্রিসিবিয়েভ।'

'ধন্যবাদ, হুজুর!' সেনাপতি আবার বুক টানটান করে দাঁড়ালেন। 'একটু আগেই আপনি বললেন এভাবে ভিড় ভেঙে দেওয়া আমার উচিত নয়। বেশ। কিন্তু হুজুর, মনে করুন যদি কোথাও শান্তি ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা থাকে, সে-ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই জনতাকে অশোভন আচরণ করার অনুমতি দিতে পারেন না, পারেন কি? কোনো আইনেই এর সমর্থন নেই। সুতরাং আমিও বিশৃঙ্খলাকে সমর্থন করতে পারি না। আমি যদি না এদের তাড়া করি, এদের না শাস্তি দিই তো কে দেবে বলুন? সারা গ্রামে আইন-শৃঙ্খলার কেউ কিছু বোঝে না, হুজুর; কেবল একমাত্র আমিই জানি কি করে এদের টিট করতে হয়। হুজুর, হেন জিনিস নেই যা আমি জানি না। হাজার হোক আমি তো আর চাষা নই, আমি একজন সৈনিক, প্রাক্তন সেনাপতি। দীর্ঘদিন আমি যোগ্যতার সঙ্গে ওয়ারশয় চাকরি করেছি, সেখান থেকে কাজি হয়ে এসেছি দমকল বাহিনীতে। অসুস্থতার জন্য দমকলবাহিনী থেকে সসম্মানে বিদায় নিয়ে

বছর দুয়েক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দরোয়ানের কাজ করেছি···আমার কাছে নিয়মশৃঙ্খলার কোনো ব্যতিক্রম নেই হুজুর। একজন অজ্ঞ চাষার কথাই ধরুন কেন, এসবের ও কিছুই জানে না···কিন্তু আমি যা বলি তা ওর ভালোর জন্যেই। আজকের এই সামান্য ঘটনাটার কথাই ধরুন কেন, হুজুর ··এ কথা সত্যি, আমি ওদের এভাবে জটলা করতে বারণ করেছিলুম। কিন্তু নদীর ধারে বালির ওপরে জলে-ডোবা একটা মানুষের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, এটাও মিথ্যে নয়। তখন নিজের মনকেই প্রশ্ন করলুম—ওর এখানে এভাবে পড়ে থাকার কি অধিকার আছে? শুধু অধিকার নয়, অশোভনও বটে! আর পুলিস-কর্মচারীটাই বা এ রকম হাঁদা গঙ্গারামের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে কেন? তাই ওঁকে বলুলম,—আপনার ওপরওয়ালাকে বরং খবর দিন। হয়তো লোকটা নিজেই জলে ডুবে মরেছে, কিন্তু সাইবেরিয়াব গন্ধ থাকাটাও আবার বিচিত্র নয়। হয়তো এটা অপরাধজনিত কোনো খুনের ঘটনা।···কিন্তু পুলিস কর্মচারী জিগিন আমার সে-কথায় কানই দিলেন না, একের পর এক কেবল বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়াই দিয়ে চললেন। হঠাৎ এক সময়ে বললেন, 'কে হে মশাই আপনি, জ্ঞান দিতে এসেছেন?' শুনুন কথা, হুজুর! আমি বললুম, আচ্ছা বোকা তো! যা সত্যি, কোথায় তাকে জানার চেষ্টা করবেন, তা নয় এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন! উনি বললেন, 'আমি জেলা-দারোগাকে এখানে আসার জন্যে খবর পাঠিয়েছি।' আমি বললুম, কেন? জেলা-দারোগাকে খবর পাঠিয়েছেন কেন? আইনের এটা কোন ধারায় পড়ে? এটা যখন জলে ডুবে মরা, গলায় দড়ি দেওয়া বা ওই ধরনের কোনো ঘটনা—তখন দারোগা এসে কি করবে? এটা দেওয়ানী আদালতের ব্যাপার, আপনি বরং তাদের খবর দিন এবং কিছু করার আগে বিচারকের হাতে সমস্ত দায়িত্বভার তুলে দিন। আপনি বিশ্বাস করবেন না, হুজুর···আমার কথাগুলো উনি প্রথমে মন দিয়ে শুনলেন, তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন। আর তাঁর সঙ্গে চাষাগুলোও সব হেসে উঠলো। শপথ করে বলছি হুজুর, একটুকু মিথ্যে বলছি না···সবায়ের সে কি হাসির ধুম! রেগেমেগে আমি

বললুম, কি ব্যাপার, তোমরা এমন দাঁত বার করে হাসছো কেন ? জিগিন তখন বললেন, 'হাসছি আপনার কথা শুনে। এ ধরনের কোনো ঘটনা আদালতের আওতায় পড়ে না।' কথাটা শুনে রক্ত আমার গরম হয়ে উঠলো, হুজুর।' হঠাৎ পুলিস কর্মচারীটির দিকে ফিরে সেনাপতি রুক্ষ স্বরে জিগেস করলো, 'কি আপনি ঠিক এই কথাগুলো বলেননি ?'

'জিগিন শান্ত স্বরে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ বলেছি।'

'অবশ্য এখন আর অস্বীকার করার কোনো উপায়ও নেই, কেননা সবাই সে-কথা শুনেছে। আপনি বললেন, এ ধরনের কোনো ঘটনা আদা-লতের আওতাতেই পড়ে না…শুনুন কথা, হুজুর। এতেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে উঠলো, আমি অবাক হয়ে গেলুম ! বললুম, একজন পদস্থ পুলিস কর্মচারী হয়ে আপনি কোন সাহসে এ কথা বলেন ? আপনি কি বুঝতে পারছেন না এ ধরনের স্থূল আচরণের জন্যে সামরিক আদালতে আপনার বিচার হতে পারে ? হয়তো এর জন্যে আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্তও করা হতে পারে। তখন অঞ্চল-প্রধান বললেন কিনা, 'ওপর-ওয়ালার হুকুম ছাড়া এসব ক্ষেত্রে উনি কিছুই করতে পারেন না।' হ্যাঁ, উনি নিজে মুখে এ কথা বলেছেন এবং সবাই তা শুনেছে। কথাটা একবার খোলা মন নিয়ে বিচার করে দেখুন, হুজুর…আমি যখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দরোয়ানের কাজ করতুম, ছেলেরা কোনো বদমাইসি বা দুষ্টুমি করলেই আমি রাস্তা থেকে পুলিস ডেকে সেই ছেলেব বিরুদ্ধে নালিশ করতুম। কিন্তু এ গ্রামে কে নালিশ করবে ? আজকের দিনে লোকে পুলিসের দায়িত্ব সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নয় এবং পুলিসের সামনেই তারা যা খুশি তাই করে। তাই অঞ্চল-প্রধানের কথা শুনে রাগে রক্ত আমার আরও গরম হয়ে উঠলো। কোমরবন্ধ খুলে সোজা ওকে চাবকা-লুম, তবে বিশ্বাস করুন হুজুর, খুব জোরে নয়, এমনি ভয় দেখানো গোছের, যাতে উনি বোকার মতো আর আলতু-ফালতু না বকেন। তখন পুলিস-কর্মচারী জিগিন লাফিয়ে উঠে ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে আমি ওঁকেও চাবকালুম…এই ভাবে ঘটনার শুরু। বিশ্বাস করুন হুজুর, রাগে শরীরের সমস্ত রক্ত আমার তখন টগবগ করে ফুটছিলো।

নিশ্চয়ই কখনও কখনও মাথামোটা লোকগুলোকে চাবকানো দরকার হয়ে পড়ে বইকি হুজুর, না হলে নিজের বিবেকের কাছেই নিজেকে অপরাধী বলে মনে হবে। বিশেষ করে সে যদি যোগ্য হয় এবং এ ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, জনজীবনে যদি সেই শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা থাকে।'

'কিন্তু জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে পুলিস-কর্মচারী, গ্রামরক্ষী, অঞ্চল-প্রধান রয়েছেন···'

'একা পুলিস কর্মচারীর পক্ষে চারদিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি যে ভাবে ব্যাপারটাকে উপলব্ধি করেছি, উনি সেভাবে আদৌ উপলব্ধি করতে পারেননি।'

'কিন্তু আপনার কি একবারও মনে হয়নি যে এ দায়িত্ব আপনার নয়?'

'কি বলছেন, হুজুর! এ দায়িত্ব আমার নয়? লোকে হৈ-হল্লা করবে, উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি করবে, আর এ দায়িত্ব আমার নয়! ওরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, যেহেতু আমি ওদের গান গাইতে দিই না··· কিন্তু গান গেয়ে লাভটা কি, হুজুর? হ্যাঁ, যদি জানতুম গানটা ভালো কিংবা কাজের কাজ কিছু হবে, তবু না হয় গাইতে বলতে পারতাম। সম্প্রতি দেখছি রাত্তিরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে রেখে বাইরে বসে বসে সবাই হাসিমস্করা করছে। আমি এ সম্পর্কেও নালিশ করেছি।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ, হুজুর···নালিশের একটা নকল আমার কাছেই আছে।' পকেট হাতড়িয়ে প্রিসিবিয়েভ একচিলতে ধূসর কাগজ বার করলেন, তারপর চশমা এঁটে গলাটা দু-একবার পরিষ্কার করে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন, 'নিম্নোক্ত চাষীদের রাত্তিরে অহেতুক আলো জ্বালাইয়া রাখিয়া গল্পগুজব করিতে দেখা গিয়াছে—ইভান প্রোখরভ, সাভা মিকিফোরভ, পিওতর পেত্রভ। সৈনিকের বিধবা পত্নী শুসত্রোভা সেমিওন কিসলভের সঙ্গে অবৈধভাবে বসবাস করিতেছে। ইগনাত সেরকোচ ডাকিনাবিদ্যা আরম্ভ করিতে, এবং ওর স্ত্রী মাভরা নিজেও একজন ডাইনি, রাত্তিরে অন্যের গাভীর দুগ্ধ পান করে···'

'থাক থাক, ওতেই হবে।' বিচারক দ্রুত ওঁকে বাধা দিয়ে কাগজপত্রে

হুকুম দিলেন।

প্রিসিবিরেস্ত চশমাটা কপালের ওপর দিয়ে অবাক বিস্ময়ে বিচারকের মুখের দিকে তাকালেন। তবে এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারলেন বিচারক ওঁর পক্ষে নন। এবার ওঁর প্রসারিত চোখদুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেলো, আরক্তিম নাকের আগায় গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম জমলো। বিচারকের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে একে একে উনি সাক্ষীদের মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু একটা জিনিস উনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না—বিচারক হঠাৎ কেন এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, কেন কাছারি-ঘরের চারদিক থেকে এমন চাপা হাসির গুঞ্জন উঠছে। এবং নির্ণায়ক-সভার অভিমতও ওঁর কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হলো: এক মাসের কারাবাস।

'কেন? কেন, হুজুর?' বিহ্বলের মতো হাত-পা ছুঁড়ে সেনাপতি চিৎকার করে উঠলেন। 'কোন আইনে একথা বলে?'

এটা উনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন আজকের দিনে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে এবং এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে ওঁর পক্ষে বাস করা একেবারেই অসম্ভব। নানান বিষণ্ণ ভাবনায় সারা মন ওঁর আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। যখন কাছারি-ঘরের বাইরে এলেন, দেখলেন চাষীরা বিচ্ছিন্ন ভাবে চারদিকে জটলা করছে এবং এই ঘটনা সম্পর্কেই টুকরো টুকরো আলোচনা করছে। সেই দেখে হঠাৎ ওঁর রক্ত গরম হয়ে উঠলো, তিরিক্ষি মেজাজে রুক্ষ স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'মিছিমিছি এভাবে জটলা কোরো না। যাও যাও সব, বাড়ি যাও।'

১৮৮৫

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পোপিকভ তাঁর ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছেন। ঘর বলতে অবশ্য কাছারিবাড়িরই নথিপত্র রাখার ঘরে তাঁর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেননা এখানে বদলি হয়ে আসার পর তাঁর জন্যে এখনও কোনো পাকাপাকি ব্যবস্থা করা যায়নি। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। উনি বেশ গাঢ়ই ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঘরের ঠিক বাইরে কিসের যেন খসখস শব্দে আচমকা তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ মেলে দরজার দিকে তাকাতেই দেখলেন কে যেন সন্তর্পণে কপাটটা একটু ফাঁক করে মুখ বাড়ালো। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চওড়া ভ্রূ, মুখ-ভর্তি দাড়ি গোঁফ। আধো আলো-ছায়ায় ওর মুখটা মনে হচ্ছে ঠিক অতিকায় একটা মাকড়শার মতো।

'কে ? কে ওখানে ?'

'আচ্ছা হাকিমসাহেব কি এখানে থাকেন ?'

'হ্যাঁ। কেন, কি চাই কি ?'

'ওঁকে একটু বলবেন ইভান ফিলারেতভ একবার দেখা করতে চায়। আমি আদালতের একটা সমন পেয়েই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'কিন্তু এই সাতসকালে কেন ? সমনে তো এগারোটায় দেখা করার কথা লেখা আছে।'

'কেন, এখন কটা বাজে ?'

'সাতটাও বাজেনি।'

'সে কি ! এখনও সাতটাও বাজেনি···কি করবো বলুন, আমাদের তো আর ঘড়ি নেই। তাহলে আপনিই হাকিমসাহেব, হুজুর ?'

'হ্যাঁ। এখন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো···আমি ঘুমোচ্ছি···'

'ঘুমোন, ঘুমোন হুজুর···আমি বরং বাইরেই অপেক্ষা করছি।'

ফিলারেতভের মাথাটা কপাটের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই পোপি-কভ বিছানার ওপারে গড়িয়ে গিয়ে চোখ বুজোলেন, কিন্তু ঘুম আর তাঁর এলো না। প্রায় ঘণ্টা আধেক ওইভাবে কুমিরের মতো চুপচাপ পড়ে

থাকার পর উনি সোজা হয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন, তারপর একটা সিগারেট ধরালেন। মন্থর গতিতে আরও খানিকটা সময় কেটে গেলো। এবার উনি পরপর তিন পেয়ালা গরম চায়ে চুমুক দিলেন।

'নাঃ, উজবুকটা আজ আমার সকালের ঘুমটাই মাটি করে দিলো!' অসন্তোষ ভরা স্বরে পোপিকভ আপন মনেই বকে চললেন। 'বাড়িউলিকে বলে রাত্তিরে দরজায় একটা চাবি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এতটা সময় এখন কি করি? তার চেয়ে বরং লোকটাকে ডেকে জেরাব পালাটা এখানেই সেরে ফেলি।'

পায়জামা পরা অবস্থাতেই পোপিকভ চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে নিলেন, তারপর চোয়ালে ব্যথা ধরে যাওয়া পেল্লাই এক হাই তুলে আরাম কুর্শিতে জাঁকিয়ে বসলেন।

'এই যে, ভেতরে এসো।' ওখান থেকেই তিনি গম্ভীর গলায় হাক পাড়লেন।

দরজার কপাটদুটো একটু ফাঁক হলো। ইভান ফিলারেতভকে এবার সম্পূর্ণ দেখা গেলো চৌকাঠের সামনে। পোপিকভ তাড়াতাড়ি পাশের ছোট টেবিল থেকে "স্ত্রীকে গুরুতর প্রহারের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী অতিরিক্ত সেনাবাহিনীর প্রাক্তন হাবিলদার আলেক্সি আন্দ্রিয়েভ ত্রিখুনভ"-এর ফাইলটা তুলে নিয়ে ওলটাতে শুরু করলেন।

'আরও কাছে সরে এসো। হ্যাঁ, এবার আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও। তুমিই চুর্নকিনো গ্রামের চাষী ইভান ফিলারেতভ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।'

'বয়েস কত?'

'বিয়াল্লিশ।'

'কি করো?'

'চাষবাস, গরু-বাছুর দেখাশোনা করি হুজুর।'

'এর আগে কখনও আদালতে এসেছো?'

'না হুজুর! এই প্রথম সাক্ষী দিতে এসেছি…'

'তাহলে তোমাকে প্রথমেই সাবধান করে রাখি, কখনই সত্য বই

অসত্য বলবে না। কেননা এখানে এখন যা যা বলবে আদালতে সাক্ষী দেবার সময় শপথ নেবার পর তোমাকে ঠিক তাই-ই স্বীকার করতে হবে। এবার বলো আসলে 'ত্রিথুনভের ঘটনার ব্যাপারে তুমি কি জানো?'

'কিন্তু আমার ভাড়ার টাকাটার কি ব্যবস্থা হবে হুজুর?' তেমন কোনো ইতস্তত না করেই ফিলারেতভ কথাটা বলে ফেললো। 'পনেরো মাইল পথ ঠেঙিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে হুজুর। ঘোড়া বা একা কোনোটাই আমার নয়, তার জন্যে যা-কিছু গুনোগার আমার ট্যাঁক থেকেই দিতে হবে…'

'আচ্ছা সেসব পরে হবে'খন।'

'পরে কেন হুজুর? এর যে বললেন টাকা-পয়সার কথা আগে না জানিয়ে রাখলে পরে আর পাওয়া যাবে না।'

'তোমার সঙ্গে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই।' ক্রুদ্ধ স্বরে পোলিসভ প্রায় ধমকেই উঠলেন। 'ত্রিথুনভদের সম্বন্ধে তুমি যা জানো শুধু তাই বলো। কেমন করে ও তার বউকে মারলো?'

'তা আমি কেমন করে জানবো হুজুর?' খোঁচা খোঁচা ঝাঁকড়া ভ্রূ উঁচিয়ে ফিলারেতভ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'তবে মারামারি যে হয়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই হুজুর। ব্যাপারটা এই রকম ঘটেছিলো—আমি গরুগুলোকে জল খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি, দেখি পুকুরে কয়েকটা হাঁস চরছে। কাদের হাঁস ভগবানই জানে। প্রশকা, যে আমাদেরই বাড়ির গরু-বাছুর দেখাশোনা করে, কয়েকটা ঢিল তুলে নিয়ে সে ওদের দিকে ছুঁড়তে শুরু করলো। আমি বললুম, 'এই, ঢিল ছুঁড়ছিস কেন? ওদের গায়ে লাগলে মরে যাবে না?' আপনিই বলুন হুজুর, ওরা হলো সুখী প্রাণী, টুক করে একটু লাগলেই অমনি মরে যাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে… তখন আমি ওকে খুব করে কড়কে দিলুম…'

'ওসব আজেবাজে কথা রেখে আসল কাজের কথা বলো।'

'হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি হুজুর। যখন প্রশকার কান ধরে খুব করে ধমকধামক দিচ্ছি, হঠাৎ কোত্থেকে ত্রিথুনভ সেখানে এসে হাজির হলো। চোখদুটো জবা ফুলের মতো টকটকে লাল, পাদুটো অল্প অল্প

টলছে···ও তখন পুরো মাত্রায় মাতাল হুজুর! আমাকে ত্রিশকার কান ধরে টানতে দেখে ও ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে বললো, 'অ্যা-ই শয়তানের বাচ্চা, পুঁচকেটার অমন কান ধরে টানচিস কেনো রে! ছাড়, ছেড়ে দে শিগ-গির, নইলে এক্ষুনি তোর ঘাড় মোটকে দেবো!' আমি ওকে ভদ্রোভাবেই বললুম হুজুর—'যেখানে যাচ্চো যাও, এদিকে তোমার নজর দিতে হবে না।' ও তখন পাগলের মতো ছুটে এসে আমার পিঠে এমন জোরে মারলো, কি বলবো হুজুর, মনে হলো শিরদাঁড়াটাই বুঝি গুঁড়িয়ে গেলো! কেন? কিসের জন্যে? আপনিই বিচার করে দেখুন হুজুর। আমি তখন রেগে গিয়ে ওকে জিগেস করলুম, 'কোন অধিকারে তুমি আমাকে মারলে, অ্যাঁ? ভেবেচো দেশে কি আইন নেই?' ও তখন মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, 'যাগ্‌গে, যা হবার হয়ে গ্যাচে, তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না ভাই। আমি এমনি ঠাট্টা করছিলুম। আর আইনের কথা যদি বলো —জানো আমি কে? এ তল্লাটে আমি কারুর ভয় পাবার বান্দা নই। এ জীবনে কত যে মানুষ খুন করেচি তার কোনো ইয়োত্তা নেই! চলো ইয়ার, কোথাও গিয়ে দুজনে একটু টানা যাক।' আমি বললুম, 'থাক থাক, খুব হয়েচে। আমি তো আর তোমার মতো পাঁড় মাতাল নই!' আমাদের আশেপাশে তখন অনেক লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিলো হুজুর, তারা সবাই একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো, 'আরে যাও যাও!' সত্যিই আমার যাবার ইচ্ছে ছিলো না··কিন্তু কি করবো হুজুর, আমি একা তো আর অতগুলো লোকের বিরুদ্ধে যেতে পারি না···'

'তারপর, তোমরা তখন কোথায় গেলে?'

ফিলারেতভ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আমাদের তো হুজুর যাবার মাত্র একটাই জায়গা, আত্রামকার ভাটিখানায়। যখনই যাবার প্রয়োজন হয় আমরা ওখানেই যাই হুজুর। বড় বদ জায়গা। যাই হোক, বড় রাস্তা পেরিয়ে আমরা তো আত্রামকার ভাটিখানায় এসে হাজির হলুম। ত্রিখুনভ চেঁচিয়ে হুকুম ঝাড়লো, 'অ্যা-ই, জলদি লাও! আভি লে আও!' সত্যি বলচি হুজুর, প্রথমে আমরা এক গেলাস করেই খেলুম, খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম, তারপর আর এক গেলাস খেলুম। এক ঘন্টার মধ্যে আমরা

আট গেলাস ভদকা উড়িয়ে দিলুম। আমার তো আর পয়সা নয়, আট কেন আশি গেলাসেও আমার কিছু এসে যেতো না। আমাকে দোষ দেবেন না হুজুর, আপনি বরং আব্রামকাকে জিগেস করবেন।'

'তারপর কি হলো তাই বলো?'

'তারপর আর কিছু হয়নি হুজুর। তবে এ কথা সত্যি, আমরা যখন মদ খাচ্ছিলুম, তখনই প্রথম মারামারিটা বাধে। পরে অবশ্য সব ঠিক ঠিক হয়ে যায়।'

'কে প্রথম মারপিট বাধায়?'

'সে তো আপনি ভালো করেই জানেন হুজুর। ত্রিখুনভ সবাইকে এক গেলাস করে ভদকা দিচ্চে আর মাৎলামি করতে করতে চেঁচিয়ে বলচে, 'খা, খা শিগগির!' তারপর যেই খাওয়া শেষ হচ্চে অমনি সবার পিঠে দুম দুম করে কিল বসাচ্চে আর মুখে থুতু ছিটিয়ে দিচ্চে!'

'ও কি তার বউকেও ধরে পিটেছিলো?'

'আপনি কি মারফার কথা বলছেন? হ্যাঁ হুজুর। ও-ও খুব পিটুনি খেয়েচে। আমাদের সবার রক্ত যখন গরম হয়ে উঠেচে, ঠিক তখনই ও ভাটিখানার ভেতরে ঢুকে জিগেস করলো, 'আলেক্সি কি এখানে আছে? এই যে, রয়েচো দেখচি! খুব হয়েচে, আর ভদকা গিলতে হবে না। চলো, ঘরে চলো!' এই কথা বলার সঙ্গে···কি বলবো হুজুর, কোনো কথা নয়, সোজা তার চুলের ঝুঁটি ধরে বেদম প্যাঁদালো।'

'কেন? কোনো কারণ ছিলো কি?'

'কিচ্ছু না হুজুর···ওর গায়ের জোর কম···ও ভগবানকে ডাকছিলো ···তাতে ত্রিখুনভ আরও বেশি খেপে গ্যালো। সেই যে চুলের ঝুঁটি ধরে পেটাতে শুরু করলো, আর কিছুতেই থামতে চায় না।'

'মদ খেয়ে মাতাল হয়ে একটা লোক একটা মেয়েকে খুন করে ফেলছে, আর তোমরা কেউ তাকে বাধা দিলে না!'

'আমরা কেন বাধা দিতে যাবো হুজুর? কোনো লোক যখন তার বউকে ধরে শিক্ষা দিচ্চে, আমরা কেন আর তার মধ্যে মিছিমিছি নাক গলাতে যাই···আব্রামকা একবার তাকে থামাবার চেষ্টাও করেছিলো,

কিন্তু ও তাকেই ধরে আচ্ছাসে পিটিয়ে দিলো। যখন আক্রামকার লোকটা এসে ওকে কোলপাঁজা করে তুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তখন অন্য লোকজনরা সব এসে তার পিঠের ওপর চড়ে ধুম-ধপাধপ পেটাতে লাগলো, আমরা ওর পা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে এলুম…'

'কার?'

'এটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে হুজুর… আমরা যার পিঠে চড়ে বসেছিলুম।'

'সে কে?'

'কেন হুজুর, যার কথা আমি বলছি।'

'বোকার মতো বকবক না করে যা জিজ্ঞেস করছি স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দাও।'

'যা যা ঘটেছিলো আপনাকে আমি সবই স্পষ্ট বলেছি হুজুর…ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, এর মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই। ত্রিখুনভ তার বউকে ধরে উত্তমমধ্যম শিক্ষা দিয়েছিলো, একথা সত্যি…আদালতে যদি শপথ কোরেও বলতে হয়, আমি আবার সেই একই কথা বলবো হুজুর।'

দীর্ঘ এবং অসংলগ্ন হলেও পোপিকভ ফিলারেতভের প্রতিটা বক্তব্যই কাগজে নকল করে নিচ্ছিলেন, আর মাঝে মাঝে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ফিলারেতভের কিন্তু সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। আপন মনেই সে বকে চলেছে। 'সত্যিই আমার কোনো দোষ নেই, যাকে জিগেস করবেন সে-ই বলবে হুজুর। তাছাড়া মারফার এভাবে আদালতে নালিশ করার কোনো মানেই হয় না।'

তার নিজেরই দেওয়া সাক্ষ্য তাকে পড়ে শোনানোর পর ফিলারেতভ খানিকক্ষণ বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে বিচারকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'আসলে মেয়েরাই হলো যত নষ্টের মূল! এখন আমার টাকাটা পাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে হুজুর? ওটা আপনি নিজে দেবেন, না কাগজে কিছু লিখে দেবেন?'

ইলিয়া সের্গেইচ পেপলভ আর তাঁর স্ত্রী ক্লিওপেটরা পেত্রোভনা দুজনে পাশাপাশি বন্ধ দরজার এপারে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে। বন্ধ দরজার ওপারে ছোট ঘরটায় গৃহশিক্ষক স্থপকিন আর তাদের মেয়ে নাতাশা প্রেম করছে।

'হুঁ এবার ঘুঘু ফাঁদে পা দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে!' আঙুলে আঙুল জড়াতে জড়াতে পেপলভ ফিসফিস করে বললেন। 'শোনো পেত্রোভনা, যখনই ওরা পরস্পরে আবেগ-অনুভূতির কথা বলবে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল থেকে যিশুর ছবিটা পেড়ে নিয়ে আসবে…আমরা দুজনে এক-সঙ্গে গিয়ে ওদের আশীর্বাদ করবো। প্রতিমূর্তি নিয়ে আশীর্বাদ করা এমনই একটা পবিত্র জিনিস, যা ও কখনও ভাঙতে পারবে না…এমনকি আদালতে নালিশ করেও না।'

বন্ধ দরজার ওপারে প্রথমে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালার শব্দ, পরে স্থপকিনের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'সত্যি, তোমার এ স্বভাবটা পালটানো উচিত, নাতাশা। জীবনে আমি তোমাকে কোনোদিন চিঠি লিখিনি।'

'কি বলছেন আপনি! আপনি কি মনে করেন আপনার হাতের লেখা আমি চিনি না?' স্খলিত ঝরনার মতো নাতাশা খিলখিল করে হেসে উঠলো। 'সত্যি, আপনি এমন মজার লোক… মাস্টারি করেন অথচ আপনার নিজেরই হাতের লেখা এমন হিজিবিজি, ঠিক যেন মাকড়শার ঠ্যাং! কি করে আপনি ছোটদের হাতের লেখা শেখান বলুন তো?'

'সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা যাতে বাচ্চারা না ঘুমিয়ে পড়ে। অবশ্য মাথায় গাঁট্টা বা রুলের গুঁতো দেওয়া যায়, কিন্তু আমি তা চাই না। আর হাতের লেখার কথা বলছো…নেকরাসভের হাতের লেখা দেখেছো? অত বড় একজন কবি, কিন্তু ওঁর হাতের লেখা দেখলে তোমার গা ঘিন ঘিন করবে।'

'নেকরাসভ আর আপনি!' নাতাশা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'কোনো কবি হলে আমি সানন্দে তাঁকে বিয়ে করতুম, উনি আমাকে নিয়ে

বেশ কবিতা লিখতেন।'

'তুমি যদি চাও আমিও তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারি।'

নাতাশা খিলখিল করে হেসে উঠলো। 'কি লিখবেন?'

'ভালোবাসার কথা, আমার হৃদয়াবেগের কথা, তোমার সুন্দর দুটো চোখের কথা। তুমি যখন পড়বে, এমন আনমনা হয়ে যাবে যে তোমার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়বে। আমি যদি ঠিক মতো কাব্যি করতে পারি, তুমি তখন শাঁখের মতো তোমার ওই নিটোল হাতে আমাকে চুমু খেতে দেবে, দেবে না বলো?'

'নিশ্চয়ই! তখন কেন? এই তো, এখনই খান না।'

বিস্ফারিত চোখে লাফিয়ে উঠে সুপকিন ওর সুগন্ধি গরম হাতটা তুলে নিলো।

'যাও যাও, শিগগির ছবিটা নিয়ে এসো!' উত্তেজিত হয়ে পেপলভ স্ত্রীকে কনুই দিয়ে গোঁতা দিলেন, নিজেও কোটের বোতামগুলো ভালো করে এঁটে নিলেন। 'এই একমাত্র সুযোগ।'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা না করে উনি দরজার কপাটদুটো ঠেলে খুলে ফেললেন।

'ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন, আমার সোনার টুকরো ছেলে-মেয়েরা…' সজল চোখে পেপলভ দুজনের মাথায় হাত রাখলেন। 'সুখে-শান্তিতে তোমরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকো…'

'আমিও তোমাদের আশীর্বাদ করছি,' আনন্দের অতিশয্যে পেত্রোভনার চোখেও তখন জল এসে গেছে। 'তোমরা সুখী হও।' সুপকিনের দিকে ফিরে চোখ মুছতে মুছতে মা বললো, 'যদিও আমার একমাত্র সোনাকে তুমি ছিনিয়ে নিচ্ছো, তবু তাকে তুমি ভালোবেসো, আদর-যত্ন কোরো।'

'এবার আমি ফাঁদে পড়ে গেছি। আর কোনো মুক্তি নেই!' সুপকিন মনে মনে ভাবলো। সত্যিই, আতঙ্কে ওর তখন আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার যোগাড়। লজ্জায় ও কোনো রকমে মাথা নিচু করে রইলো, ভঙ্গিটা এই রকম 'যা খুশি করো, আমি তো হেরেই গেছি!'

'হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ দিয়ে আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি।' বাবা এবার মেয়ের কাঁধে হাত রাখলেন। 'নাতাশা, তুমি ওর পাশে এসে দাঁড়াও। পেত্রোভনা, আমাকে যিশুর ছবিটা দাও।'

হঠাৎ প্রচণ্ড ক্রোধে ওঁর চোখের জল শুকিয়ে গেলো, মুখটা হয়ে উঠলো ভয়ঙ্কর।

'মাথা মোটা আর কাকে বলে!' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে উনি হুংকার ছাড়লেন। 'এটা কি যিশুর ছবি?'

'তাই তো! হা ভগবান…'

ব্যাপারটা কি জানার জন্যে কৌতূহলী হয়ে স্থপকিন আড় চোখে তাকালো, আর তখনই তার বুকের অতল থেকে বেরিয়ে এলো অমিত মুক্তির গভীর একটা নিঃশ্বাস। তাড়াহুড়োতে পেত্রোভনা যিশুর বদলে সাহিত্যিক লেঝেচ্নিকভের ছবিটা দেওয়াল থেকে পেড়ে এনেছেন। ছবিটা হাতে নিয়ে পেত্রোভনা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বৃদ্ধ পেপলভ এমনই বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন যে কি বলবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। ওঁদের এই বিহ্বলতার সুযোগ নিয়ে স্থপকিন আস্তে আস্তে টুক করে কেটে পড়লো।

১৮৮৬

বয়সে তরুণ হলে কি হবে, ত্রিকোভিচের মাথায় ইতিমধ্যেই টাক পড়তে শুরু করেছে। আগে সে বে-সরকারী কোনো আইনজীবীর দফতরে চাকরি করতো, সম্প্রতি সেসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে রীতিমত সমৃদ্ধা জাঁদরেল স্ত্রীর হয়ে 'ভিউটনিস' নামে একটা বাসাবাড়ি দেখাশোনা করছে।

একদিন বাস্তবে তার ঘর থেকে দ্রুত বারান্দায় বেরিয়ে এসে দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো, 'উঃ, কি জাঁহাবাজ দজ্জাল মেয়েমানুষ রে বাব্বা! কোন দুঃখে যে ওর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলুম কে জানে! তাড়কা-রাক্ষসীটার সঙ্গে একমাত্র কামানই পাল্লা দিয়ে সমানে গর্জন করতে পারে!'

ভিউটনিসের দীর্ঘ বারান্দায় পায়চারি করতে করতে রাগে দুঃখে ক্ষোভে ত্রিকোভিচের তখন নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিলো, এর চেয়ে সে যদি বাড়ির তুচ্ছ সাধারণ কোনো চাকরবাকরও হতো তবু অন্তত নিজের স্বাধীনতাটুকু বজায় রাখতে পারতো। তার ইচ্ছে হলো চিৎকার করে প্রতিবাদ করে, অভিসম্পাত দেয়, মাটিতে পদাঘাত করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঝাঁঝালো মেজাজ তার ইচ্ছের কথাটা বুঝতে পেরে কেন যেন তাকে টেনে নিয়ে এলো একত্রিশ নম্বর ঘরের ভাড়াটে গায়ক খালিয়াভকিনের কাছে। খালিয়াভকিনই বাসাবাড়ির একমাত্র ভাড়াটে যিনি নিয়মিত ভাড়া শোধ করতে পারেন না। খালিয়াভকিন তখন রীতি-মতো টলছেন আর বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তালার গর্তে চাবি ঢোকাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। মুখে বিড়বিড় করতে করতে কার যেন বাপান্ত করছেন, তবু চাবিটা কিছুতেই গর্তে ঢুকছে না। শেষে এক হাতে তিনি তালাটা চেপে ধরলেন, অন্য হাতে ধরা রয়েছে বেহালার একটা বাক্স। ঠিক এমনি মুহূর্তে ত্রিকোভিচ শিকারী বাজের মতো ওঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, ক্রুদ্ধ বিকৃত স্বরে বলে উঠলো, 'এই যে, এসে গ্যাছেন! বাঃ, চমৎকার! তা ভাড়াটা কখন পাচ্ছি জানতে পারি কি? দু হপ্তা তো হয়ে গেলো! এর পর সত্যিই কিন্তু আপনাকে উঠিয়ে দিতে বাধ্য হবো।'

'আরে দেবো দেবো…অত ভাবছো কেন…' খালিয়াভকিন শান্ত

স্বরে বিড়বিড় করে বললেন।

'বলতে আপনার লজ্জা করে না, মিস্টার খালিয়াভকিন!' ত্রিকোভিচ এবার ঠিক ওঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। 'মাসে একশো কুড়ি রুবল মাইনে পান, ইচ্ছে করলেই বাড়িভাড়াটা ঠিক মতো শোধ করে দিতে পারেন। কিন্তু দেন না। এটা কিন্তু খুব অন্যায়…'

'হ্যাঁ ভাই, স্বীকার করছি আমার অন্যায় হয়ে গেছে, খুব অন্যায় হয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত খুট করে তালাটা এক সময়ে খুলে গেলো, খালিয়াভকিন দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। ত্রিকোভিচও ওঁর পেছন পেছন ঘরে ঢুকলো। 'শুনুন, এই শেষ বারের মতো আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কাল যদি টাকা না পাই··না, কোর্টে যাবো না; আপনার মজা আমি টের পাইয়ে ছাড়বো! আর ঘরের মেঝে ভর্তি করে এভাবে দেশলাইয়ের কাঠি ফেলবেন না বিশেষ করে পোড়া কাঠি ফেলার যখন আলাদা জায়গা রয়েছে, বুঝলেন? আপনার মতো এরকম বাজে ভাড়াটে আমার দরকার নেই!'

'আজ তুমি হঠাৎ আমার ওপর এত চটে উঠলে কেন ভায়া, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না!' কাঁপা কাঁপা হাতে কয়েকটা কাঠি নষ্ট করে খালিয়াভকিন একটা সিগারেট ধরালেন। 'তুমি বলছো আমি ভাড়া দিই না। বেশ, না হয় তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তাতে তোমার কি এসে যায় আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে? তুমিও তো ভাড়া দাও না, কিন্তু তার জন্যে আমি তো তোমাকে কখনও বিরক্ত করি না, করি কি বলো? হ্যাঁ, বড় জোর বলতে পারো তোমাকে ভাড়া দিতে হয় না। বেশ, তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও!'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'যা বলতে চাইছি তা তুমি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছো। আর পাঁচজন ভাড়াটের মতো তুমিও এ বাড়িতে বাস করো, অথচ এমন ভাবখানা করো যেন তুমিই এ বাড়ির প্রকৃত মালিক।'

'তার মানে?' তার আত্মসম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে কেউ এভাবে

তাকে অপদস্থ করবে ত্রিকোভিচ যেন কল্পনাও করতে পারেনি। তাই বিহ্বল দৃষ্টিতে খালিয়াভকিনের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো সে।

'ও-হোঃ, বাড়িটা যে তুমি বিয়ের যৌতুক হিসেবে পেয়েছিলে, আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম! আমাকে তুমি ক্ষমা করো ভাই। তবে নৈতিক দিক থেকে যাচাই করে দেখলে এতে সত্যিই কিন্তু তোমার উত্তেজিত হবার যথেষ্ট কোনো কারণ নেই···কেননা বাড়িটা তুমি এমান এমনিই পেয়েছো, যেহেতু স্বামী হয়েছো বোলে। তা ভায়া, স্বামী হওয়া এমন কিছুই কঠিন নয়। স্বামী যে-কেউ হতে পারে। এই আমাকেই যদি শ-দেড়েক বউ এনে দাও, আমিও সবার স্বামী হতে পারবো।'

এতক্ষণ ত্রিকোভিচ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মাতাল বাদকটার অসংলগ্ন প্রলাপ শুনে যাচ্ছিলো, এবার প্রচণ্ড ক্রোধে টেবিলে ঘুষি মেরে সে চিৎকার করে উঠলো, 'আপনার আস্পদ্দা তো কম নয়! কি হিসেবে আপনি এসব কথা আমার মুখের ওপর বলতে সাহস করেন?'

'নাঃ, এটা কিন্তু খুব অন্যায়!' খালিয়াভকিন যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন। 'তুমি যে কেন এমন চটে উঠছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না···বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে সত্যিই অপমান করতে চাইনি, বরং আমি তোমার প্রশংসাই করছিলাম। আরে ভায়া, যার এত বড় একটা বাসাবাড়ি রয়েছে এমন কোনো মহিলা যদি আমার জীবনে আসতো···'

'তবু···তবু আপনি কোন সাহসে আমাকে অপমান করলেন?'

'সত্যি বলছি আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি, বিশ্বাস করো। তাছাড়া নেশার ঝোঁকে কি বলতে কি বলে ফেলেছি···বেশ, তার জন্যে না হয় ক্ষমাই চাইছি। আর কক্ষোনো বলবো না।'

খালিয়াভকিনের বিনীত নম্র ভঙ্গিতে ত্রিকোভিচের রাগ একেবারে জুড়িয়ে জল হয়ে গেলো, তবু ক্ষুব্ধ স্বরে সে বললো, 'তবু কিন্তু কাউকে এভাবে বলা উচিত নয়।'

'আরে ভায়া, ওই যে কথায় বলে না—মাতালের আবার মাথার

ঠিক, আমারও হয়েছে ঠিক তাই। তাছাড়া আমি হলুম একটা জন্তু, একটা আস্তো উজবুক! আসলে আমার মাথায় খানিকটা ঠাণ্ডা জল চাপড়ানো উচিত, তবে যদি একটু ভদ্র হওয়া যায়।'

'জীবন যে কি জঘন্য, বিরক্তিকর যদি জানতেন, তাহলে আর এভাবে অপমান করতে পারতেন না।' ঘরময় পায়চারি করতে করতে ব্রিকোভিচ ম্লান স্বরে বললো। 'আসল সত্যিটা কেউ কখনও দেখে না, সবাই যে যার মতো মন-গড়া একটা ধারণা গড়ে নেয়, তারপর সুযোগ পেলেই তার ছাল ছাড়াতে শুরু করে। আড়ালে-আবডালে এ বাড়ি সম্পর্কে কে কি বলে আমি সব জানি। চোখ বুজলে আমি যেন ছবির মতো সব স্পষ্ট দেখতে পাই। আমি জানি, মাঝ রাত্তিরে কারুর কাছে টাকা চাইতে আসাটা সত্যিই অন্যায়। কিন্তু আমার বদলে আর কেউ হলে তাকেও তাই করতে হতো। আর আপনি···আপনি পরোক্ষভাবে আমাকেই কটাক্ষ করলেন।'

'বললাম তো আমি মাতাল হয়ে পড়েছিলাম। সত্যই আমি এর জন্যে মনে মনে অনুতপ্ত। শপথ করে বলছি, আমি অনুতপ্ত। দিয়ে দেবো ভাই, মাইনে পেলেই তোমার বাকি ভাড়াটা শোধ করে দেবো।' আবেগে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে এলো ওঁর চোখের কোল ছাপিয়ে। ব্রিকোভিচের হাত ধরে টেনে উনি তার গালে একটা চুমুই দিয়ে ফেললেন। 'সত্যিই তুমি বড় ভালো ছেলে···মাতাল হলে কি হবে, আমি সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাই। দেখো না ভাই, এই বুড়োটার জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কি না। আমি জানি—এখানের কড়া হুকুম রাত এগারোটার পর বারান্দায় ঘুর ঘুর করা কিংবা চায়ের ফরমাস দেওয়া নিষেধ, তবু থিয়েটার থেকে ফিরে এক পেয়ালা চায়ের জন্যে প্রাণটা টাক টাক করছে।'

'তিমোফেই,' ঘরের ভেতর থেকেই ব্রিকোভিচ চাকরকে হাঁক পাড়লেন। 'মিস্টার খালিয়াভকিনের জন্যে এক পেয়ালা চা নিয়ে আয় তো।'

'হুকুম নেই, হুজুর।' হেলতে দুলতে এসে তিমোফেই বেশ ভারিক্কি

চালেই বললো। 'এগারোটার পর কাউকে চা দিতে গিন্নীমা মানা করে দিয়েছেন, হুজুর।'

'আমি তো তোকে হুকুম দিচ্ছি।' ব্রিকোভিচ চোখ পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

'ওতে কোনো লাভ হবে না, হুজুর। গিন্নীমা নিজে হুকুম না দিলে আমি কাউকে চা দিতে পারবো না, সে আপনি যাই বলুন।' যেমন হেলতে দুলতে এসেছিলো ঠিক তেমনি ভাবে নির্বিকার চিত্তে সে বিদায় নিলো।

কোনো কথা না বলে ব্রিকোভিচ ঠোঁট কামড়ে নিঃশব্দে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'হুঃ, এর চেয়ে দুর্বিষহ জীবন আর কি হবে।' খালিয়াভকিন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ঠিক আছে ভায়া, আমার সামনে তোমাকে অত লজ্জা পেতে হবে না।…সবকিছু আমি স্পষ্টই দেখতে পাই, তাছাড়া মানুষ চিনতে আমার বড় একটা ভুল হয় না। চা যদি না-ই পাওয়া যায়, কুছ পরোয়া নেহি, ভদকা হ্যায়—এসো ভায়া, দুজনে একহাত হয়ে যাক।'

তারের জাল দেওয়া কাঠের আলমারি খুলে খালিয়াভকিন ভদকার একটা বোতল আর কিছু সসেজ বার করলেন, তারপর গদি-আঁটা একটা কুর্সিতে বেশ আরাম করে জাঁকিয়ে বসলেন। এলোমেলো রুক্ষ চুল, থমথমে বিষণ্ণ মুখ, এমন কি ভদকার খোলা বোতল আর সস্তা সসেজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্রিকোভিচের হঠাৎ অতীত দিনের কথা মনে পড়ে গেলো, নিঃস্ব রিক্ত হলেও যেদিন সে ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষ। মাতালের একটানা অসংলগ্ন প্রলাপ শুনতে শুনতে হঠাৎ এক সময়ে তার মুখটাও হয়ে উঠলো বিষণ্ণ ম্লান, আর তখনই তার মনে হলো নিতান্ত একটু পান না করলেই নয়। পায়ে পায়ে টেবিলের সামনে এগিয়ে এসে একটা গেলাস ভরে নিলো, তারপর নিঃশব্দে বড় বড় কয়েকটা চুমুক দিলো।

'একেই বলে কুকুরের জীবন! আজ আপনি আমাকে অপমান করলেন, চাকরটা পর্যন্ত অপমান করে গেলো…সুযোগ পেলে কেউ আমাকে

অপমান করতে ছাড়ে না। কিন্তু কেন? না, কোনো কারণ নেই… কিচ্ছু না, শুধু শুধু…'

তৃতীয় গেলাসের পর ব্রিকোভিচ গদি-আঁটা কুর্সিতে এসে বসলো। মাথায় হাত রেখে খানিকক্ষণ ঝিম মেরে রইলো, তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্লান আর্ত স্বরে বললো, 'হ্যাঁ, ভুল করেছি! উঃ, কি ভুলটাই না করেছি! আমি আমার যৌবন, আমার উদ্দেশ্য, আমার আদর্শকে একদিন হেলায় বিকিয়ে দিয়েছি—আজ জীবন কড়ায় গণ্ডায় তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। উঃ, কি নির্মম নিষ্ঠুর প্রতিশোধ!'

ভদকার নেশা আর অসুখী জীবনের গ্লানিমায় এখন তাকে সত্যিই ভীষণ বিবর্ণ দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন কত রোগা হয়ে গেছে। বারবার মাথাটা ঝুলে পড়ছে বুকের কাছে, নিঃসীম হতাশায় যেন আর্তনাদ করে উঠছে, 'উঃ, কি কদর্য জীবন, যদি আপনি জানতেন!' ব্রিকোভিচ আর একটু ঝুঁকে খালিয়াভকিনের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের সুরে বললো, 'আচ্ছা, এখানকার ভাড়াটেরা আমার সম্পর্কে কে কি বলে আমাকে একটু বলুন না…নিশ্চয়ই আপনি ওদের আমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলাবলি করতে শুনেছেন…'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য শুনেছি!'

'বলুন না।'

'না, ওরা অবশ্য তেমন কিছু বলে না, মানে· এই এমনই গল্প করে।'

কুর্সিতে এসে বসার পর থেকে খালিয়াভকিন এমনিতেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, এর পর আর একটাও কথা বললেন না। দেখতে দেখতে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। নিচে ঝি-চাকরদের ঝাঁটপাট দেওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ব্রিকোভিচ উঠে পড়লো, যাবার আগে খালিয়াভকিনের কানে কানে বলে গেলো, 'ওকে আর একটা পয়সাও ভাড়া দেবেন না!'

খালিয়াভকিন কোনো কথা বললেন না, কুর্সির মধ্যে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রইলেন। একটু পরেই তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শোনা গেলো।

সেইদিনই গভীর রাতে আবার তুজনে মিলিত হলো।

নিভৃতে স্বাধীনতার স্বাদটুকু অনুভব করার পর থেকে ব্রিকোভিচের এমন একটা দিনও যায়নি যেদিন রাত্তিরে সে একা কাটিয়েছে। যদি কোনো দিন খালিয়াভকিনকে ঘরে না পায়, তখন সে যায় অন্য কোনো ভাড়াটের ঘরে। তাকেই জানায় তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী আর গেলাসের পর গেলাস ভদকা গেলে। এমনিভাবে চলেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

১৮৮৬

আমার ছোটকাকু পিওতর মেনিয়ানিচ, যেমন লিকপিকে চেহারা তেমনি খিটখিটে মেজাজ, সবে পাস করে উচ্চ বিদ্যালয়ে ল্যাটিনের শিক্ষকতা করছে। সেদিন সকালে তার বাঁধানো ব্যাকরণ বইটাকে ইঁদুরে কাটতে দেখে রেগে আগুন হয়ে উঠলো।

'হা, ভগবান!' ক্রোধে হতাশায় মরিয়া হয়ে ও রান্নাঘরে ছুটলো, রাঁধুনিকে দেখে চিৎকার করে বললো, 'কি ব্যাপার প্রাসকভিয়া, এখানে এত ইঁদুর এলো কোত্থেকে? কাল আমার দামী টুপিটা কাটলো, আজকে দেখছি ব্যাকরণ বইটা কেটেছে, কয়েক দিন পরেই হয়তো দেখবো আমার জামাকাপড়ই কাটছে...'

'তা আমি কি করবো?' প্রাসকভিয়া ঝাঁঝিয়ে উঠলো। 'আমি তো আর ওদের এখানে নিয়ে আসিনি।'

'ওদের আনোনি, কিন্তু একটা বেড়াল তো নিয়ে আসতে পারো।'

'বেড়াল তো আমাদের একটা রয়েছে, তবে ওটা কোন কাজের নয়।'

প্রাসকভিয়া আঙুল দিয়ে রান্নাঘরের এক কোণে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে থাকা বেড়ালছানাটাকে দেখিয়ে দিলো, খ্যাংরাকাটির মতো রোগা।

'কেন, কাজের নয় কেন?' ছোটকাকু জিগেস করলো। কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই বোঝা গেলো মনে মনে ও তখনও রেগে রয়েছে।

'ওটা একেবারে বাচ্চা। এখনও দু মাস বয়েস হয়নি।'

'হুঁ...তাহলে ওটাকে শেখাও। একদম কিছু না করার চেয়ে কিছু শেখা ভালো।'

কথাটা বলেই ছোটকাকু ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলো। বেড়ালছানাটা এতক্ষণ জুলজুল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলো, সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলো ওর সম্পর্কে কথা হচ্ছে। বাস্তব জীবন সম্পর্কে তেমন কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও, ও যে বাঘেরই উত্তরপুরুষ এ বিষয়ে ওর কোনো সন্দেহ ছিলো না। তাই দিনের বেলাতেও ও চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে অরণ্য বা মরুভূমির স্বপ্ন দেখতো, আর দুধ, মাংসের টুকরো বা খাবার কিছু পেলেই

লাফিয়ে উঠে থাবা বসিয়ে দাঁত দিয়ে পরখ করে দেখতো। ছোটকাকু চলে যেতেই প্রথমে ও চোখ বুজিয়ে ছোট্ট করে ডাকলো—'ম্যাও'। তারপরে কোণ থেকে বেরিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রাসকভিয়ার কোলে। যেন বলতে চাইলো—নিশ্চয়ই, আমি তো ইঁদুর ধরার জন্যেই জন্মেছি, উত্তরাধিকারসূত্রে আমার রক্তে রয়েছে শিকারের নেশা।

সেদিনই বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে ছোটকাকু দোকান থেকে পনেরো কোপেক দিয়ে একটা ইঁদুর-ধরার কল কিনে আনলো। সন্ধ্যেবেলায় খাওয়াদাওয়ার পর কলের আংটায় এক টুকরো রুটি বেঁধে কলটাকে খাটের নিচে পেতে রাখলো। টেবিলে বসে ছাত্রদের খাতা দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময়ে 'খুট' করে একটা শব্দ হতেই আমাদের ল্যাটিন-বিশারদ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, হাতের কলমটা ছিটকে পড়লো মেঝেতে। কোনো কথা না বলে ও সোজা খাটের তলা থেকে কলটা টেনে বার করে আনলো, দেখলো ছোট্ট মসৃণ একটা নেংটি ইঁদুর তারের খাঁচার মধ্যে ভয়ে ছটফট করছে।

'এই তো ব্যাটাকে ধরেছি আজকে। ও, তুই আমার ব্যাকরণ বই খেয়েছিস! দাঁড়া, তোর দেখাচ্ছি মজা!' ছোটকাকু খানিকক্ষণ অপলক চোখে চশমার মধ্যে দিয়ে অপরাধীর দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর চিৎকার করে ডাকলো, 'প্রাসকভিয়া! শিগগির বেড়ালটাকে নিয়ে এসো!'

প্রাসকভিয়া দৌড়ে বাঘের বংশধরটিকে কোলে করে নিয়ে এলো।

'হ্যাঁ, ওকে এবার নামিয়ে দাও।' ছোটকাকু কলটা ঘরের মাঝখানে টেনে আনলো। 'ওকে একটু হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হবে। না, কলের দরজার ঠিক সামনে ওকে বসিয়ে দাও...হ্যাঁ, আগে ভালো করে দেখুক, দু-একবার শুঁকে নিক...'

বেড়ালছানাটা অবাক হয়ে একবার ছোটকাকু একবার প্রাসকভিয়ার মুখের দিকে তাকালো, তারপর কেমন যেন বিহ্বল ভঙ্গিতে ইঁদুরের কলটা শুঁকলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই হঠাৎ ঘরের জোরালো আলোয় কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খাঁচার কাছ থেকে লাফিয়ে সরে এলো।

'অ্যাই, কোথায় পালাচ্ছিস ?' ছোটকাকু চট করে ওর লেজটা ধরে ফেললো। 'আচ্ছা বোকা তো ! ওইটুকু একটা ছোট্ট নেংটি ইঁদুরকে দেখে ভয়ে একেবারে ল্যাজ গুটিয়ে ফেলেছিস ! তাকা ওর দিকে ? তাকা শিগগির বলছি ? কি রে, তাকাবি না ?'

বেড়ালছানার ঘাড় ধরে ছোটকাকু ওর নাকটা চেপে ধরলো ইঁদুর কলের গায়ে। 'আচ্ছা শয়তান তো ! প্রাসকভিয়া, তুমি ঠিক এই ভাবে ওকে ধরে থাকো। আমি যেই খাঁচার দরজাটা খুলে দেবো, তুমি অমনি ওকে ছেড়ে দেবে। বুঝতে পেরেছো ?'

চাপা ঠোঁটে অদ্ভুত রহস্যময় একটা অভিব্যক্তি নিয়ে ছোটকাকু খাঁচার দরজাটা খুলে দিতেই ইঁদুরটা চোখের নিমেষে তীরের মতো ছুটে পালালো খাটের নিচে, আর বেড়ালছানাটা চকিতে লেজ তুলে ছুটে গিয়ে ঢুকলো টেবিলের তলায়।

'পালালো ! পালালো ! যাঃ !' উত্তেজনায় ছোটকাকু পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো। 'আচ্ছা ভীতু তো ! দাঁড়া, তোর মজা আমি দেখাচ্ছি !' টেবিলের নিচে থেকে ছোটকাকু ওর কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলো। 'ঠিক আছে, পরের বারে আর যদি এরকম করিস তো এ-ক তুলে আছাড় দেবো। বুঝেছিস ?'

পরের দিন আবার কলে ইঁদুর পড়তেই ছোটকাকু চিৎকার করে উঠলো, 'প্রাসকভিয়া, বেড়ালটাকে নিয়ে এসো, একটা ইঁদুর ধরেছি !'

আগের দিন ওই ঘটনার পর সারা রাত ও উনুনের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে ছিলো, আজ ইঁদুর কলের সামনে নামিয়ে দিতেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে করুণ সুরে ম্যাও ম্যাও করে ডাকতে লাগলো।

'চুপ ! চুপ ! তাকা ভালো করে, তাকা !' পিঠ ঠেকিয়ে বেড়ালছানাটাকে পেছিয়ে আসতে দেখে ছোটকাকু রেগে আগুন হয়ে উঠলো। 'ফের যদি ওরকম করবি তো সত্যিই তোকে তুলে এক আছাড় দেবো। প্রাসকভিয়া, তুমি ওর কানটা শক্ত করে ধরে রাখো। না, দরজার আর একটু কাছে সরিয়ে আনো···হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে।'

এবারে ছোটকাকু খুব ধীরে ধীরে দরজাটা তুললো, আর চনমন

করতে করতে ইঁদুরটা এক সময়ে সুট করে বেড়ালছানার নাকের নিচে দিয়েই ছুটে গিয়ে ঢুকলো আলমারির নিচে। আর ছাড়া পেতেই বেড়াল-ছানাটা এক লাফে গিয়ে সেঁধলো খাটের তলায়।

'নাঃ, এবারেও ইঁদুরটা পালালো!' ছোটকাকুর মাথায় তখন রক্ত চড়ে গেছে। চিৎকার করে প্রাসকভিয়াকে বললো, 'আর এটাকে তুমি বেড়াল বলো? দাও তুলে এক আছাড়! ব্যাটার পুঁটকি বেরিয়ে যাক!'

তৃতীয়বারে বেড়ালছানাটাকে ইঁদুরকলের সামনে নামিয়ে দেবার আগে থেকেই ও ভীষণ ভাবে কাঁপতে লাগলো এবং থাবা উঁচিয়ে প্রাস-কভিয়ার হাতে নখ বসিয়ে দিলো। চতুর্থ বারে ছোটকাকু প্রচণ্ড রাগে বেড়ালছানাটাকে এক লাথি মেরে চিৎকার করে বললো, 'ব্যাটা নোংরা শয়তানের বাচ্চাটাকে বাড়ি থেকে বার করে দাও, দূর করে দাও এখান থেকে!'

ইতিমধ্যে বছর খানেক কেটে গেছে। সেদিনের সেই শীর্ণ ক্ষীণজীবী বেড়ালছানাটা আজ রীতিমতো রাশভারী গোছের এক হুলো, ভারিক্কি চালে উঠোন পেরিয়ে চলেছে প্রেমাভিসারে। হঠাৎ অস্পষ্ট কার যেন পায়ের শব্দে ও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, গোঁফের প্রান্তগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সমান্তরাল রেখায়। নর্দমার পাশ দিয়ে আস্তাবলের দিকে একটা ইঁদুরকে ছুটে যেতে দেখে চকিতে গায়ের লোম ফুলিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে একটা গরগর শব্দ করতে করতে আমার নায়ক তীর বেগে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লো ইঁদুরটার ওপর।

হায় কখনও কখনও মনে পড়ে বহুদিন আগে সেদিনের সেই ভীরু বেড়ালছানাটাব মতো আমার অবস্থাও ছিলো ঠিক একই রকম হাস্যকর, একই রকম অসম্ভব ভয়ে বিবর্ণ ম্লান হয়ে, মাথার চুল খাড়া করে আমাকে ছোটকাকুর কাছে ল্যাটিন ব্যাকরণের নিপাতনে সন্ধি ক্রিয়াপদ শিখতে হতো—আট কনসিকিউটিভাম, অ্যাবলাটিভাস অ্যাবসেলিডটাস··· তখন-কার ছোটকাকুর সেই ভয়ঙ্কর মুখ দেখলে বেড়ালছানাটার মতো আমারও ছুটে পালাতে ইচ্ছে করতো।

১৯৮৬

জীবন যেমন

যাদের নিয়ে নাটক

আলেকসেন্দার ভ্লাদিমিরোভিচ সেরেব্রিয়াকভ, প্রাক্তন অধ্যাপক

ইলিয়েনা আন্দ্রিয়েভনা (হেলেনি), অধ্যাপকের স্ত্রী, বয়েস সাতাশ

সোফিয়া আলেকসেন্দ্রোভনা (সোনিয়া), অধ্যাপকের প্রথম পক্ষের মেয়ে

মারিয়া ভাসিলিয়েভনা ভোনিৎস্কায়া, অধ্যাপকের প্রথম পক্ষের শাশুড়ি

ইভান পেত্রোভিচ ভোনিৎ'স্ক (ভানিয়া), অধ্যাপকের প্রথম পক্ষের শালা

মিখাইল লভোভিচ আস্ত্রভ, ডাক্তার

ইলিয়া ইলিচ তেলিয়েগিন (ওয়াফল্), নিঃস্ব হয়ে যাওয়া একজন জমিদার

মারিনা, বৃদ্ধা ধাত্রী

একজন শ্রমিক

সেরেবরিয়াকভের বিরাট অট্টালিকা সুসংলগ্ন বাগান। বুড়ো একটা পপলার গাছের নিচে চায়ের টেবিল পাতা। টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার, চেয়ারের ওপর একটা গিটার পড়ে রয়েছে। দূরে, বাগানের একপাশে শান বাঁধানো আসন, গাছের ডালে ঝোলানো একটা দোলনা। তখন দুপুর প্রায় দুটো। হালকা ধূসর মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে।

মারিনা, বেঁটে, গোলগাল চেহারার একজন রীতিমতো বয়স্কা মহিলা, টেবিলের সামনে চায়ের সাজসরঞ্জাম নিয়ে বসে আছে। আস্ত্রভ অদূরে পায়চারি করছে।

মারিনা : তোমার খানিকটা ভদকার দরকার বলে মনে হচ্ছে ?

আস্ত্রভ : না নানি, ভদকা আমি রোজ খাই না। তাছাড়া দিনের বেলায় তো নয়ই···[একটু নিস্তব্ধতার পর] আচ্ছা নানি, কতদিন ধরে তুমি আমাকে দেখছো বলো তো ?

মারিনা : কতদিন ? [একোঁড় ওকোঁড় হয়ে কি ভেবে] স্মৃতিশক্তি যদি আমার একেবারে লোপ না পেয়ে গিয়ে থাকে···সোনিচকার মা, ভেরা পেত্রোভ্না তখনও বেঁচে ছিলো···উঁ, তা প্রায় বছর এগারো হতে চললো···[একটু ভেবে] চাই কি তার চাইতে বেশিও হতে পারে···

আস্ত্রভ : আচ্ছা, এ ক-বছরে আমি কি অনেক পালটে গেছি ?

মারিনা : হুঁ, অ-নে-ক। তখন তুমি তরুণ ছিলে, আর দেখতেও ছিলে অনেক সুন্দর। আজ তোমার বয়েস হয়েছে···

আস্ত্রভ : হ্যাঁ, এই দশ বছরে আমি যেন অনেক বদলে গেছি। তার অবশ্য কারণও আছে···ভোর থেকে রাত পর্যন্ত আমাকে গাধার মতো খাটতে হয়, শান্তি কি জিনিস কখনও বুঝতেও পারিনি। রাত্তিরে যখনই বিছানায় শুতে যাই, প্রতি মুহূর্তে ভয় হয় এই বুঝি কেউ এসে রুগী দেখার জন্যে কড়া নাড়ছে।

তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত একদিনও আমি ছুটি পাইনি নানি। তাছাড়া গ্রামের এই জঘন্য পরিবেশে, নির্বোধ সব মানুষদের মধ্যে থেকে থেকে আমার জীবনটাও ভীষণ একঘেয়ে হয়ে গ্যাছে [আস্তে আস্তে গোঁফের একটা প্রান্ত পাকাতে পাকাতে] তবু ঈশ্বরের অসীম কৃপা, কিছুটা বিষণ্ণ বোধ করলেও বুদ্ধিটা আমার একেবারে ভোঁতা হয়ে যায়নি। আসলে আমি কারুর কাছে কিছু চাই না, কাউকে ভালোও বাসি না। এখানে শুধু যা তোমাকেই ভালো লাগে। [মারিনার চুলে চুমু দিয়ে] আমি যখন ছোট ছিলুম ঠিক তোমার মতো আমারও একজন বুড়ি আয়া ছিলো।

মারিনা : তুমি কি কিছু খাবে আস্ত্রভ ?

আস্ত্রভ : না। তোমার মনে আছে নানি, এখানে যখন প্রথম এলুম, মালিৎস্কোতে তখন মড়ক লেগেছিলো·· গুটি বসন্ত···মুখে জল দেবার মতো কোনো লোকও সুস্থ ছিলো না। সারাদিনে একটা মুহূর্তের জন্যেও ফুরসুৎ পেতুম না। একদিন রাত্তিরে ঘরে ফিরে দেখলুম রেলস্টেশন থেকে ওরা সংকেতদার নিয়ে এসেছে। অস্ত্রোপচারের জন্যে ওকে সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে নিয়ে গেলুম, কিন্তু বাঁচাতে পারলুম না। সেদিনও ঠিক এমনি ভাবে চোখ বুজিয়ে ভেবেছিলুম ওর মৃত্যুর জন্যে বুঝি আমিই দায়ী। আজও আমি গ্রামের সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে ঠিক এমনিই ভাবি, অথচ ওরা কিন্তু আমাদের কথা আদৌ ভাবে না নানি।

মারিনা : ওরা না ভাবুক, ভগবান ভাববেন।

[দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ঘুম থেকে উঠে আলুথালু বেশে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভোনিৎস্কি বাগানের একটা আসনে বসে, হাত দিয়ে গলাবন্ধটা ঠিক করে নেয়।]

আস্ত্রভ : কি, খুব ঘুমিয়েছো বলে মনে হচ্ছে ?

ভোনিৎস্কি : হ্যাঁ···খুব। [হাই তুলে] যেদিন থেকে অধ্যাপক আর তার বাজোপাজরা এখানে বাস করতে এসেছে, সেদিন থেকেই

আমাদের বাঁধাধরা দৈনন্দিন জীবনের সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে গেছে। এখন আমি অসময়ে খাই, অসময়ে ঘুমোই, মদ খাই···যা আমার শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। আগে এক মুহূর্তও আমার সময় ছিলো না—সোনিয়া আর আমি পাগলের মতো খাটতুম। আর এখন সোনিয়া যখন কাজ করে আমি তখন হয় পড়ে পড়ে ঘুমোই, নয়লো মদ খাই···সত্যিই, জঘন্য!

মারিনা : [মাথা নেড়ে] হ্যাঁ, এখন যা চলেছে সব ভূতুড়ে ব্যাপার! আগে বারোটার আগেই আমাদের দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সব শেষ হয়ে যেতো, এখন মিটতে মিটতে সেই বিকেল। অধ্যাপক সারা রাত জেগে বই পড়বে, লিখবে···আর আমাকে রাত জেগে ওর জন্যে চায়ের সাজসরঞ্জাম সব গুছিয়ে রাখতে হবে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ রাত দুপুরে ঘণ্টি বেজে উঠলো···কি ব্যাপার? না, চা চাই। এখন চায়ের জল গরম করার জন্যে চাকরবাকরদের সব জাগাও···এই তো চলছে!

আস্ত্রভ : ওঁরা কি আরও অনেক দিন এখানে থাকবেন?

তোলিংস্কি : হ্যাঁ, একশো বছরও হতে পারে। ওরা তো ভাবছে বরাবরের জন্যে এখানে থেকেই যাবে।

মারিনা : এই গ্যাখো না, আমি সেই কখন থেকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে রয়েছি, ওদিকে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছে।

[দূরে অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট গলার স্বর শোনা যায়। সেরেবরিয়াকভ, ইলিয়েনা, সোনিয়া এবং তেলিয়েগিন বেড়িয়ে বাগানের অন্তপ্রান্ত থেকে মঞ্চে প্রবেশ করে।]

সেরেবরিয়াকভ : চমৎকার, ভারি চমৎকার!···সত্যি, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কোনো তুলনাই হয় না!

তেলিয়েগিন : হ্যাঁ হুজুর, সবাই এর খুব তারিফ করেন।

সোনিয়া : কাল তোমাকে শাকসব্জীর বাগান দেখতে নিয়ে যাবো বাপি

শোনো, দেখো তোমার খুব ভালো লাগবে।

ভোনিৎস্কি : তোমাদের চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সেরেব্রিয়াকভ : একটু কষ্ট কোরে চাটা আমার পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিও না ভানিয়া। কয়েকটা জরুরী কাজ আমাকে আজই সেরে ফেলতে হবে।

[সেরেব্রিয়াকভ, ইলিয়েনা এবং সোনিয়া বেরিয়ে যায়। তেলিয়েঘিন এগিয়ে এসে মারিনার পাশে বসে]

ভোনিৎস্কি : গরমে লোকের প্রাণ যাচ্ছে, অথচ আমাদের মহান বিদ্যা-দিগ্‌গজ ব্যক্তিটির গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, বগলে ছাতা।

আস্ত্রভ : আসলে উনি শরীরের ওপর যথেষ্ট যত্ন নেন।

ভোনিৎস্কি : কিন্তু হেলেনির মতো এমন সুন্দর আর আশ্চর্য রূপসী মেয়ে আমার জীবনে আর একটাও দেখিনি!

তেলিয়েঘিন : বুঝলে মারিনা, যখনই আমি মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটি, কিংবা বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াই···সত্যি, কি যে ভালো লাগে! এমন সুন্দর আবহাওয়া, চারদিকে পাখির গান···আমরা সবাই সুখে-শান্তিতে রয়েছি, এর চেয়ে বেশি আর কি চাই বলো? [মারিনার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে] ধন্যবাদ মারিনা···

ভোনিৎস্কি : [স্বপ্নাতুর চোখে] এমন দুর্লভ চোখ মেয়েদের বড় একটা দেখাই যায় না।

আস্ত্রভ : অন্য কিছু বলো ইভান।

ভোনিৎস্কি : [উদাস স্বরে] অন্য কি জানতে চাও বলো?

আস্ত্রভ : নতুন কোনো খবর?

ভোনিৎস্কি : কোথাও কোনো নতুন খবর নেই, সবই পুরনো। আমি সেই আগের মতো একই রয়ে গেছি—হয়তো তার চাইতে আরও খারাপ, কেননা দিন দিন আমি ভীষণ কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছি···এক কথায় যাকে বলে একেবারে বুড়োর বাদশা!

আর আমার বুড়ো মা, এক পা কবরের দিকে বাড়িয়েও নতুন জীবনের প্রতি আলোকিত হবার আশায় দিন-রাত সব জ্ঞান-গর্ভ বই পড়ে চলেছে আর বুড়ো তোতার মতো অনর্গল মেয়েদের সামাজিক শৃঙ্খল-মুক্তি সম্পর্কে বকবক করছে।

আন্দ্রভ : আর অধ্যাপক ?

ভোনিৎস্কি : ওর কথা ছাড়ো। ভোর থেকে রাত-দুপুর পর্যন্ত ভ্রূ কুঁচকে কেবল লিখেই চলেছেন, অথচ ছাইভস্ম কি লিখছেন উনি নিজেই জানেন না। এর চেয়ে নিজের আত্মজীবনী লিখলে হয়তো ভালো হতো। অসুস্থ রুগ্ন মানুষ, অথচ হিংসেয় পেট ফুলে ঢোল। অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর শহরে থাকার তো এক কানা-কড়িও মুরোদ নেই, দিদির সম্পত্তির ওপর নির্ভর করেই তাকে বাঁচতে হয়···তার ওপর আবার কত ডাঁট! সব সময়েই নিজেকে মনে করছে কত অসুখী, অথচ ওর মতন সত্যিকারের ভাগ্যবান মানুষ দুনিয়াতে তুমি খুব কমই খুঁজে পাবে। ভেবে ছাখো এক-বার—সাধারণ একজন গির্জার ঘণ্টাবাদকের ছেলে, সে কিনা যাজক হবার জন্যে পড়াশুনা করলো। কোনো রকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিটা পেয়েই চাকরি নিলো অধ্যাপনার, পরে সে-ই কিনা হলো একজন কেউকেটা 'মহামান্য', এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যনির্বাহক সভার সদস্য, এমনি আরও কত কি! সেটাই অবশ্য বড় কথা নয়, ভেবে ছাখো এক-বার···একটা মানুষ ঝাড়া পঁচিশ বছর ধরে কলেজে বক্তৃতা দিচ্ছে, বাস্তববাদ প্রকৃতিবাদ আর শিল্প সম্পর্কে ক্রমাগত লিখে চলেছে, অথচ শিল্প সম্পর্কেও নিজেই কিছু জানে না। সবচেয়ে বড় কথা—সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই নেই···

আন্দ্রভ : আমার মনে হচ্ছে তুমি ওঁকে হিংসে করো ইভান।

ভোনিৎস্কি : হ্যাঁ, করি। বিশেষ করে মেয়েদের সম্পর্কে ওর দুর্লভ

সৌভাগ্যকে। ডন জুয়ানও হার মেনে যায়। ওর প্রথম পক্ষের স্ত্রী, আমার দিদি—সে ছিলো যেমন রূপসী, তেমনি ফুলের মতো নিষ্পাপ আর নীল আকাশের মতো পবিত্র। ওকে ভালোও বাসতো ঠিক দেবদূতের মতন, অথচ ও কিন্তু দিদিকে তার ছাত্রদের চেয়ে একটুও বেশি ভালোবাসতে পারেনি। আর ওর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ইলিয়েনাকে তো নিজে চোখেই দেখেছো…শুধু রূপসী নয়, বিদুষীও বটে। ইলিয়েনা ওকে যখন বিয়ে করলো ও তখন প্রায় বুড়ো—ওই বুড়োটার হাতেই সে তুলে দিলো তার রূপ যৌবন স্বাধীনতা, তার সমস্ত উজ্জ্বল নারীত্ব। অথচ কেন, কিসের জন্যে ?

আস্ত্রভ : উনি কি সত্যিই অধ্যাপকের প্রতি বিশ্বস্তা ?

ভোনিৎস্কি : বলতে আমার খুবই খারাপ লাগছে যে সত্যিই তাই।

আস্ত্রভ : কেন তোমার বলতে খারাপ লাগছে ইভান ?

ভোনিৎস্কি : যেহেতু এ ধরনের বিশ্বস্ততা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়াই অর্থহীন, অহেতুক। এর মধ্যে যতই জাঁকজমক থাকুক না কেন, সত্যিকারের যুক্তি বলতে কিছু নেই। অক্ষম, বৃদ্ধ কোনো স্বামীর কাছে নিজের যৌবন, যোগত্যা, হৃদয়ের সমস্ত সুকুমার অনুভূতিগুলোকে লোহার সিন্দুকে পুরে বেঁচে থাকার মধ্যে যতই গৌরব থাকুক না কেন—সেটা উচিত নয়, অন্যায়।

তেলিয়েঘিন : [সজল চোখে] তুমি যখন এসব বলো আমার ভালো লাগে না ভানিয়া। সত্যি বিশ্বাস করো…কেউ, স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে যে প্রতারণা করে সে নিজের দেশের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

ভোনিৎস্কি : [ক্রুদ্ধ স্বরে] চোখের জল মোছো ওয়াফ্‌ল্।

তেলিয়েঘিন : আমাকে তুমি ক্ষমা করো ভানিয়া। আমাদের বিয়ের পরের দিনই বউ আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যায় সেই লোকটার সঙ্গে যাকে ও ভালোবাসতো—শুধু আমাকে দেখতে ভালো

নয় বলে। কিন্তু সে-দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্যে অবহেলা করিনি। আজও আমি ওকে ভালোবাসি, ওর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্তে আমার যথাসর্বস্ব খুইয়েছি। জীবনে সুখ বলতে কিছুই পাইনি, তবু আমার সান্ত্বনা আমার গর্ব আমি কারুর সঙ্গে প্রতারণা করিনি। অথচ প্রকৃতির নিয়মে ওর যৌবন, রূপ-লাবণ্য বলতে যা কিছু ছিলো সব ম্লান হয়ে গ্যাছে, যে-লোকটাকে ও ভালোবাসতো সেও অনেকদিন আগে মরে গ্যাছে···তবু আমি আজও ওর পেছনে···

[প্রথমে সোনিয়া এবং ইলিয়েনা প্রবেশ করে, একটু পরেই একটা বই হাতে খুব ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন মারিয়া ভাসিলিয়েভনা। উনি নিঃশব্দে একটা চেয়ারে বসে বই পড়তে শুরু করেন। মারিনা ওঁর সামনে এক পেয়ালা চা রাখে। উনি চোখ না তুলেই পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চুমুক দেন।]

সোনিয়া : [দ্রুত মারিনার কাছে এসে] নানি, কয়েকজন চাষী বাইরে অপেক্ষা করছে। তুমি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলো, আমি বরং চায়ের দিকটা দেখছি···

[মারিনা বেরিয়ে যায়। সোনিয়া পেয়ালায় চা ঢালে। ইলিয়েনা তার পেয়ালাটা তুলে নিয়ে দোলনায় গিয়ে বসে।]

আস্ত্রভ : [ইলিয়েনাকে] আমি আপনার স্বামীকে দেখতে এসেছি। আপনি চিঠিতে জানিয়েছিলেন উনি খুব অসুস্থ—বাতের ব্যথায় একেবারে শয্যাশায়ী। কিন্তু এখন তো দেখছি উনি বেশ ভালোই রয়েছেন।

ইলিয়েনা : কাল রাত্তিরে পায়ের ব্যথাটা সত্যিই খুব বেড়েছিলো, আজ অবশ্য উনি অনেকটা ভালো আছেন···

আস্ত্রভ : আর আমি কুড়ি মাইল পথ ঘোড়ায় চড়ে পড়ি-কি-মরি করে

এখানে ছুটে এলুম। বাপ্‌রে, এই অবস্থা আমার কাছে প্রথম নয়। আর কিছু না হোক রাতটা এখানে কাটিয়ে যেতে পারবো, আমার একটু ঘুমনো দরকার।

সোনিয়া : নিশ্চয়ই, খুব ভালো হবে। আপনি আমাদের এখানে রাত্তিরে কোনো দিন থাকেননি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনার দুপুরেও খাওয়া হয়নি ?

আস্ত্রভ : না, মানে ঠিক সময় করে উঠতে পারিনি।

সোনিয়া : আজ রাত্তিরে কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেতে হবে। আজকাল আমাদের রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া খুব সকাল-সকালই মিটে যায়। [চায়ের একটা পেয়ালা তেলিয়েঘিনের দিকে এগিয়ে দিয়ে] নিন, খুব একটা গরম নেই কিন্তু।

তেলিয়েঘিন : ধন্যবাদ সোনিয়া।

মারিনা : ইশ্‌!

সোনিয়া : কি হলো দিদিমা ?

মারিনা : খারকভ থেকে পাভেল আজ একটা নতুন প্রচার-পুস্তিকা পাঠিয়েছে, আলেকসেন্দারকে বলবো একদম ভুলেই গেছি! সত্যি, দিন দিন আমার স্মৃতিশক্তির যা হাল হচ্ছে···

ভোনিৎস্কি : চাটা খেয়ে ফ্যালো মা, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

মারিনা : কিন্তু ওর সঙ্গে আমার একবার কথা বলা দরকার।

ভোনিৎস্কি : দিন-রাতই তো আমরা কেবল কথা বলে চলেছি মা, এবার একটু থামো।

মারিনা : কেন জানি না, আমি লক্ষ্য করেছি, যখনই আমি কথা বলি তুই শুনতে চাস না। এক বছরে তুই এত বদলে গেছিস যে আমি তোকে স্পষ্ট করে চিনতে পারি না ভানিয়া। তোর উচিত আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় এমন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হওয়া, যা থেকে অন্যরা অনুপ্রেরণা পায়···

ভোনিৎস্কি : [চাপা ব্যঙ্গের স্বরে] ভালোই বোলেছো মা! যে নিজে কারুর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পায় না, সে আবার অন্যকে

অম্বুপ্রেরণা যোগাবে ! আজ আমার সাতচল্লিশ বছর বয়েস। এক বছর আগে হলে তবু না হয় জোর করে চোখে হাত চাপা দিয়ে থাকার চেষ্টা করতুম, ঠিক তুমি যেমন পণ্ডিতি ফলাও তোমার পুঁথিগত বিদ্যের জোরে—যাতে জীবনে বাস্তবতা কি জিনিস না দেখতে হয়। কিন্তু আজ আর তা সম্ভব নয় মা। অসহ্য নিঃসঙ্গতায় আমি রাতের পর রাত একা জেগে কাটিয়েছি, যৌবনের রঙিন দিনগুলো একে একে ঝরে গ্যাছে আমার চোখের সামনে।

সোনিয়া : চুপ করো ভানিয়ামামা, চুপ করো, লক্ষ্মীটি !

মারিনা : কিন্তু এর জন্যে যদি কাউকে দোষ দেওয়ার থাকে তো সে তোর নিজেকে, তোর আদর্শকে···তুই যদি চাইতিস, কেউ তোকে বাধা দিতো না।

ভোনিৎস্কি : হ্যাঁ, ঠিক যেমন কেউ বাধা দেয় না অবিরাম লিখে চলা তোমার মহামান্য অধ্যাপককে।

মারিনা : তার মানে ! কি বলতে চাইছিস তুই ?

সোনিয়া : [অনুনয়ের সুরে] আঃ দিদিমা ! ভানিয়ামামা ! আমি মিনতি করছি, দোহাই তোমরা চুপ করো।

ভোনিৎস্কি : বেশ, আমার অন্যায় হয়ে গ্যাছে। এই আমি চুপ করলুম।

[নিটোল এক টুকরো নিস্তব্ধতা]

ইলিয়েনা : না গরম, না শীত···আজকের দিনটা কিন্তু সত্যিই ভারি চমৎকার !

ভোনিৎস্কি : হ্যাঁ, এমন দিনে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে মরার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে !

[গিটারটা তুলে নিয়ে তেলিয়েঘিন মৃদু ঝঙ্কার দেয়, অদূরে মারিনাকে মুরগীদের ডাকতে শোনা যায়। গিটারে পোলকার সুর সবাই কান পেতে শোনে। একটু পরে একজন শ্রমিক প্রবেশ করে]

শ্রমিক ডাক্তারবাবু কি এখানে আছেন ? ও, মিখাইল লভোভিচ,

অনুগ্রহ করে আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

আস্ত্রভ : কোন্ চুলোয় শুনি ?

শ্রমিক : আমাদের কারখানায়।

আস্ত্রভ : ব্যাস, ঘুম আমার মাথায় উঠলো ! কি আর করা যাবে, চলো।

[শ্রমিক বেরিয়ে যায়]

সোনিয়া : এটা খুব অন্যায়…কারখানা থেকে কিন্তু সোজা এখানে ফিরে আসবেন।

আস্ত্রভ : দেখি, যদি সম্ভব হয়…বিদায়। [ইলিয়েনাকে] যদি কখনও আমার কথা মনে পড়ে সোফিয়া আলেকসেন্দ্রোভনাকে নিয়ে সোজা আমার ওখানে চলে যাবেন—সত্যিই খুব খুশি হবো। আমারও প্রায় নব্বুই একর জমির ওপর ছোট্ট একটা বাগানবাড়ি আছে—এমন আদর্শ ফুল আর ফলের বাগান আপনি একশো মাইলের মধ্যেও কোথাও খুঁজে পাবেন না। আমার জমির ঠিক পাশেই সরকারী চাষের আবাদ, আর তার চার-পাশ ঘিরে ঘন সবুজ বনাঞ্চল। বনরক্ষী যে খুবই বৃদ্ধ আর প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে সব কিছু আমাকেই দেখা-শোনা করতে হয়।

ইলিয়েনা : বন পাহাড় ঝরনা আমার ভীষণ ভালো লাগে। চারদিকে শুধু গাছ গাছ আর গাছ, মাঝখানে ফুলের বাগান…ভাবতেই সারা মন আমার আনন্দে দুলে উঠছে ! কিন্তু সারাদিন ডাক্তারের জন্যে ঘোরাঘুরি করে ওই সব দেখাশোনা করার সময় পান কখন ? নিশ্চয় খুব একঘেয়ে লাগে ?

সোনিয়া : না না, তুমি জানো না হেলেনি, মিখাইল লভোভিচ গাছ-পালা ভীষণ ভালোবাসেন। প্রতি বছর নতুন নতুন সব গাছ বসান। এর জন্যে উনি কয়েকবার ব্রোঞ্জের পদকও পেয়েছেন। বন থেকে কেউ গাছ কাটলে উনি ভীষণ কষ্ট পান…

আস্ত্রভ : সেটা খুবই স্বাভাবিক। শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে নিক কিংবা নিতান্ত প্রয়োজনের জন্যে কেউ গাছ কাটুক, সেটা

আলাদা কথা। কিন্তু অরণ্যের পর অরণ্য ধ্বংস করে দেওয়ার অর্থই হলো দেশকে উচ্ছন্নের পথে টেনে নিয়ে যাওয়া। বছরে লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে নেওয়ার ফলেই আজ দেশের আবহাওয়া পালটে যাচ্ছে, নদীগুলো মজে আসছে, অরণ্যের পশুপাখিরা তাদের আবাস ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরকালের জন্যে উধাও হয়ে যাচ্ছে—এর একমাত্র কারণ সাধারণ মানুষেব মূর্খামি আর অলসতা, [ইলিয়েনাকে] তাই নয় কি মাদাম ?

ইলিয়েনা : [অস্ফুট স্বরে] নিশ্চয়ই !

আস্ত্রভ : আপনি হয়তো ঠিক বিশ্বাস করবেন না, আমি জানি অরণ্য কারুর একার নয়, সবার···কিন্তু আমি যখন বনের মধ্যে একা একা হেঁটে বেড়াই, আর নিজের হাতে লাগানো সতেজ চারা গাছগুলোর দিকে তাকাই গর্বে আমার বুক ভরে ওঠে, মনে হয় মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে আমি আর এক মুহূর্তের জন্যে বাড়িয়ে দিলুম। তাই দূরে যখন লুকিয়ে-কাটা কুড়ুলের শব্দ শুনি বা বাতাসে সবুজ ডালপালা দুলিয়ে কোনো তরুণ বার্চ-গাছকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখি—অসহ্য যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা আমার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়···[মঞ্চের সামনে শ্রমিককে দেখে] হ্যাঁ, চলো যাচ্ছি। আবার হয়তো দেখা হবে, বিদায়।

সোনিয়া : [আস্ত্রভের হাতটা মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে] তার মানে আজ আর আসছেন না ?

আস্ত্রভ : কি জানি ঠিক বলতে পারছি না।

[সোনিয়া আর আস্ত্রভ দুজনে বেরিয়ে যায়। মারিনা আর তেলিয়েঘিন দুজনে পাশাপাশি টেবিলের কাছে বসে থাকে। ইলিয়েনা আর ভোনিৎস্কি বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।]

ইলিয়েনা : আপনি কিন্তু আবার সেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করেছেন ইভান পেত্রোভিচ। মাকে রাগিয়ে দিলেন, দুপুরে খাবার

সময় আলেকসেন্দারের সঙ্গে সমানে তর্ক করে গ্যালেন। মিছিমিছি এ সব করে কি লাভ!

তোনিংস্কি : কি করবো যদি ওকে আমার ভালো না লাগে ?

ইলিয়েনা : ওকে ভালো না লাগার কি কারণ সেইটেই তো আমি বুঝতে পারছি না! ও তো ঠিক আর পাঁচজনেরই মতন, আপনার চেয়ে ও কোনো অংশে খারাপ নয়।

তোনিংস্কি : যদি তোমার নিজের মুখটা একবার দেখতে পেতে হেলেনি···

ইলিয়েনা : [বাধা দিয়ে] জানি আপনি কি বলতে চাইছেন। বুড়ো বলে সবাই আমার স্বামীকে দোষ দেয়, আর তার জন্যে এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকায়—যেন আমি কত দুঃখী। কারুর করুণা আমার অসহ্য ইভান পেত্রোভিচ। একটু আগে ডাক্তার যা বললেন, ওঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত—একটা একটা করে গাছ কাটতে কাটতে যেমন শুধু অরণ্য নয়, পশু পাখি আবহাওয়া নদীও ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের জীবনেও বিশ্বস্ততা পবিত্রতা আত্মত্যাগ না থাকলে মানব-সমাজেরও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

তোনিংস্কি : এই সব দার্শনিকতা আমার এই মুহূর্তে ভালো লাগছে না হেলেনি। আমি যদি তোমাকে ভালোবেসে ফেলি কি করবো বলো ? তুমি জানো না হেলেনি—তুমিই আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ, আমার জীবন আমার যৌবন! আমি জানি তোমার কাছে আমার এ-আর্তির কোনো মূল্য নেই—তবু তোমার মুখের দিকে আমি না তাকিয়ে পারি না, তোমার কণ্ঠস্বর না শুনলে আমি···

ইলিয়েনা : [বাধা দিয়ে] চুপ, চুপ করুন, ওরা শুনতে পাবে।

[ওরা মঞ্চের ওপারে চলে যায়]

তোনিংস্কি : না হেলেনি, না, তুমি আমাকে বাধা দিও না···আর কিছু না হোক, অন্তত আমাকে আমার ভালোবাসার কথা বলতে

দাও, আমার এই বিপুল আনন্দকে তুমি এভাবে নষ্ট করে দিও না…

ইলিয়েনা : কিন্তু এ অন্যায়, সত্যিই অন্যায় ইভান পেত্রোভিচ…

[ওদের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়। তেলিয়েঘিন গিটারে পোলকার সুর তোলে, মারিনা তার পড়ার মধ্যে গভীর ভাবে ডুবে যায়।]

ধীরে ধীরে পরদা নেমে আসে।

সেরেব্রিয়াকভের বাড়ির খাবার ঘর। বাগানে রাত-প্রহরীর লাঠির ঠক-ঠক শব্দ শোনা যাচ্ছে। খোলা একটা জানলার সামনে সেরেব্রিয়াকভ আরাম-কুর্সিতে বসে ঝিমুচ্ছে। ইলিয়েনা তার পাশে বসে, সেও ঝিমুচ্ছে।

সেরেব্রিয়াকভ : [জেগে উঠে] কে ? কে ওখানে ? সোনিয়া ?

ইলিয়েনা : না, আমি···

সেরেব্রিয়াকভ : ও, লিয়েনোচকা ! উঃ, পায়ের ব্যথাটা আবার অসহ্য হয়ে উঠেছে !

ইলিয়েনা : কম্বলটা মাটিতে পড়ে গ্যাছে [পাদুটো ভালো করে জড়িয়ে দিয়ে]···জানলাটা কি বন্ধ করে দেবো আলেকসেন্দার ?

সেরেব্রিয়াকভ : না, থাক···জানলা বন্ধ করে দিলে আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। জানো, একটুখানির জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, আর তখন স্বপ্ন দেখছিলুম পাদুটো যেন আমার নিজের নয়। অসহ্য যন্ত্রণায় হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গ্যালো। এখন কটা বাজে ?

ইলিয়েনা : বারোটা কুড়ি।

সেরেব্রিয়াকভ : আমার মনে হয় আমাদের নিজস্ব সংগ্রহে বাতিয়ুস-কভের কিছু কবিতার বই ছিলো, ভোরবেলায় একবার দেখো তো।

ইলিয়েনা : আচ্ছা।

সেরেব্রিয়াকভ : কিন্তু আমার নিঃশ্বাস নিতে এত কষ্ট হচ্ছে কেন, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না !

ইলিয়েনা : ক্লান্তির জন্যেই হচ্ছে। গত দু রাত তুমি একদম ঘুমতে পারোনি।

সেরেব্রিয়াকভ : আমি শুনেছি বৃদ্ধ বয়েসে তুর্গেনিভও বাতে অসম্ভব কষ্ট পেয়েছিলেন। আমার ভয় হচ্ছে, আমারও কপালে

তেমন কিছু ঘটবে কি না কে জানে। এই বুড়ো বয়েসটাই সবচেয়ে জঘন্য, মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

ইলিয়েনা : মাঝে মাঝে তুমি এমন ভাবে কথা বলো—যেন তোমার বুড়ো হওয়ার জন্যে আমরাই একমাত্র দায়ী।

সেরেবরিয়াকভ : না লিয়েনোচকা, আমি বোকা নই, আমি বুঝি। তুমি শুধু আশ্চর্য রূপসীই নও, তরুণী, স্বাস্থ্যবতী, তুমি চাও জীবন …আর আমি জীর্ণ রুগ্ন বৃদ্ধ, প্রায় মৃত। তুমি কি ভাবো আমি বুঝি না ? বুঝি লিয়েনোচকা। আসলে এর পর আমার বেঁচে থাকাটাই মূর্খামি। কিন্তু আর কটা দিন আমাকে সময় দাও, তোমাকে আর বেশিদিন জড়িয়ে রাখবো না…

ইলিয়েনা : উঃ, সেই একই পুরনো কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেলো…দোহাই, দোহাই তোমার একটু চুপ করো !

সেরেবরিয়াকভ : কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয় লিয়েনোচকা…সবার ধারণা একমাত্র আমিই যেন জীবনটাকে ভোগ করে চলেছি…

ইলিয়েনা : [সজল চোখে] আঃ, অসহ্য ! বলো, তুমি কি চাও আমার কাছ থেকে ?

সেরেবরিয়াকভ : কিছু না।

ইলিয়েনা : তাহলে, মিনতি করছি তুমি চুপ কর।

সেরেবরিয়াকভ : [অনেকটা স্বগত স্বরে] আশ্চর্য, ইভান পেত্রোভিচ, এমন কি বুড়ি থুত্থুড়ি মারিনা ভাসিলিয়েভনাও যখন কথা বলতে শুরু করে, সবাই তখন কান পেতে শোনে। অথচ আমি একটা শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে না করতেই সবাই ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে। উঃ, আমি এমনই ক্লান্তিকর, স্বার্থপর। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়েসেও যে মানুষের একটু সান্ত্বনা, একটু কোমল ভালোবাসার প্রয়োজন, সে-কথা কেউ একবার ভুলেও ভাবে না।

ইলিয়েনা : কেউ তা অস্বীকার করছে না…কেউ যে ভাবে না এ-কথাও

সত্যি নয়। [জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সামান্য একটু বিরতির পর] ঝড় উঠেছে, এখুনি বৃষ্টি নামবে···জানলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি।

[দূর থেকে শোনা যায় প্রহরীর লাঠির শব্দ আর গানের সুর]

সেরেবরিয়াকভ : সারা জীবন সুন্দর একটা পরিবেশে পড়াশোনার মধ্যে কাটিয়ে এসে আজ হঠাৎ এমন সব অদ্ভুত মানুষের মধ্যে এসে পড়লুম যারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না, তুচ্ছতা ছাড়া যাদের জীবনে গভীরতা বলতে কিছুই নেই। অথচ আমি বাঁচতে চাই, চাই সম্মান, প্রতিষ্ঠা··· আমার সৃষ্টির মধ্যেই এমন একজন উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে উঠতে চাই, যার নাম শুনে সবাই মাথা নত করবে। কিন্তু এখানে আমি যেন বন্দী, মৃত্যুভয়ে কেবলই শংকিত হয়ে উঠছি···বুড়ো হয়েছি বলে···

ইলিয়েনা : ভয় নেই, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো···দেখবে পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে আমিও বুড়ি হয়ে গেছি।

সোনিয়া : [ভেতরে প্রবেশ করে] বাপি, ডাক্তার আস্ত্রভ এসেছিলেন···

সেরেবরিয়াকভ : ওসব হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে আমার কোনো কাজ হবে না। ওকে তুমি স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে বলতে পারো।

সোনিয়া : বেশ, তাই বলবো।

[সোনিয়া দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

সেরেবরিয়াকভ : শোনো, টেবিল থেকে আমাকে ওই ছোট ওষুধের শিশিটা দাও···উঃ, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে!

সোনিয়া : [টেবিল থেকে ছোট একটা শিশি তুলে নিয়ে] এই নাও।

সেরেবরিয়াকভ : [অধৈর্য হয়ে] এই ওষুধটা কি তোমার কাছে চাইলুম? নাঃ, কাউকে কিছু বলা আর না-বলা দুই-ই সমান!

সোনিয়া : তুমি কিন্তু দিন দিন বড্ড খিটখিটে হয়ে যাচ্ছো বাপি, এসব আমার একদম ভালো লাগে না। তাছাড়া আমার একটুও

সময় নেই, কাল খুব ভোরে উঠেই আবার কলাই-মাড়াইয়ের বিলিব্যবস্থা করতে হবে।

[রাতের পোশাক পরে, হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে ভোনিৎস্কি প্রবেশ করে। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।]

ভোনিৎস্কি : ঝড় উঠেছে, এখুনি বৃষ্টি আসবে। হেলেনি, সোনিয়া, তোমরা শুতে যাও, আমি এখানে থাকছি।

সেরেবরিয়াকভ : [সতর্ক হয়ে] না না, লিয়েনোচকা, ওকে আমার কাছে রেখে যেও না। কথা বলিয়ে বলিয়ে ও আমাকে মেরে ফেলবে।

ভোনিৎস্কি : কিন্তু ওদের তো একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার না কি? গত দু রাত ওরা একটুও ঘুমতে পারেনি।

সেরেবরিয়াকভ : বেশ, ওরা না হয় শুতে যাক, কিন্তু তার সঙ্গে তুমিও যাও ··[ভোনিৎস্কি কিছু বলতে গেলে বাধা দিয়ে] দোহাই তোমার, এখন কিছু বোলো না, পরে শোনার অনেক সময় পাবো।

সোনিয়া : কি দরকার ভানিয়ামামা, চুপ করো।

[মোমবাতি হাতে মারিনা প্রবেশ করে]

সোনিয়া : এত রাত হয়ে গেলো, তুমি এখনও শুতে যাওনি নাকি?

মারিনা : এখনও যে আমার চায়ের সরঞ্জামই গুছনো হয়নি।

সেরেবরিয়াকভ : সবাই ক্লান্ত, সবাই এত রাত পর্যন্ত আমার জন্যে জেগে রয়েছে···আর আমি, বুড়ো হয়ে প্রায় মরতে চললুম, অথচ জীবনের আনন্দকে সমানে ভোগ করে চলেছি।

মারিনা : [ওর কাছে এসে কোমল স্বরে] কি হয়েছে? আবার তোমার পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে বুঝি? নাঃ, তোমার আর আমার অবস্থা দেখছি একই। [কম্বলটা ভালো করে পায়ের তলায় গুঁজে দিয়ে] তোমার এই পুরনো রোগটা আর গেলো না···সোনিচকার মা, ভেরা পেত্রোভনাও খুব মুষড়ে পড়তো···ও-ও সারা রাত ঘুমতে পারতো না। আসলে কি

জানো,—বুড়োরা হলো ঠিক বাচ্চাদের মতন, ওরা চায় ওদের বেশ কেউ একটু আদর-যত্ন করুক···কিন্তু বুড়োদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। আমার মনে হয় তোমার একটু ঘুমনো দরকার।

সেরেবরিয়াকভ : সেই ভালো মারিনা, [সোজা হয়ে বসে] তুমি বরং আমাকে একটু ধরো।

[সোনিয়া এগিয়ে এসে বাবাকে তুলতে সাহায্য করে। সোনিয়া ও মারিনার কাঁধে ভর রেখে সেরেবরিয়াকভ ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। মঞ্চের ওপার থেকেও শোনা যায় মারিনার কণ্ঠস্বর]

মারিনা : একটু ঘুমতে পারলে দেখবে কষ্ট অনেক কমে গ্যাছে···আমি তোমাকে লেবুর ফুল দিয়ে খুব সুন্দর করে চা বানিয়ে দেবো, পায়ে গরম কাপড়ের সেঁক দিয়ে দেবো···দেখো খুব আরাম পাবে···

ইলিয়েনা : [নিটোল একটুকরো নিস্তব্ধতার পর] উঃ, ওকে নিয়ে আমি সত্যিই ক্লান্ত হয়ে গেছি !

ভোনিৎস্কি : ওকে নিয়ে তুমি ক্লান্ত হয়ে গ্যাছো, আর আমি আমার নিজেকে নিয়ে। আজ তিন রাত আমি ঘুমতে পারিনি।

ইলিয়েনা : এ বাড়ির সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত ! আপনার মা কেবল আমার স্বামীকে ছাড়া আর কাউকেই সহ্য করতে পারেন না ; অথচ আমার স্বামীও দিন দিন অসম্ভব খিটখিটে হয়ে উঠছে···ও আমাকে বিশ্বাস করে না, আপনাকে সহ্য করতে পারে না। ওদিকে সোনিয়াও তার বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না, আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। দু সপ্তা ও আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। আপনিও আমার স্বামীকে একদম পছন্দ করেন না, মাকে অবজ্ঞা করেন। আর আমার হয়েছে যত জ্বালা···জানেন, মাঝে মাঝে আমার কান্না পেয়ে যায় ! এ বাড়িতে আমার কিছু

ভালো লাগে না, কিচ্ছু, না···

ভোনিৎস্কি : শোনো হেলেনি, এসব ছেলেমানুষির কোনো মানে হয় না।

ইলিয়েনা : আপনি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ইভান পেত্রোভিচ—একটা জিনিস আপনার নিশ্চয়ই বোঝা উচিত, আগুন লাগিয়ে বা লুঠতরাজ করে পৃথিবীর যত না ক্ষতি হয়, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি ক্ষতি হতে পারে এইসব ছোটখাটো তুচ্ছতা, ঘৃণা বিদ্বেষ আর শত্রুতায়। বিবাদ বা অসন্তোষ নয়, পারস্পরিক ভালোবাসা দিয়েই মানুষকে কাছে টেনে নিতে হয়।

ভোনিৎস্কি : কিন্তু প্রিয়তমা···[অদ্ভুত একটা আবেগে ইলিয়েনার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু দেয়] আমার নিজের যে কিছু ভালোবাসা পাওয়া দরকার···

ইলিয়েনা : আঃ, কি হচ্ছে কি ! [হাতটা টেনে নিয়ে] ছাড়ুন।

ভোনিৎস্কি : হেলেনি, লক্ষ্মীটি শোনো···আর একটু পরেই বৃষ্টি থেমে যাবে, এ পৃথিবীর সবকিছুই মনে হবে কি আশ্চর্য পবিত্র! কেবল আমিই এক কোণে পড়ে থাকবো, আর দিনরাত আর্তনাদ করে মরবো এ হৃদয় যেন চিরকালের মতো কোথায় হারিয়ে এসেছি। অতীত বলতে আমার কিছু নেই, বর্তমান তুচ্ছ অর্থহীন। অথচ আমার এই জীবন, এই ভালোবাসা— একে নিয়ে আমি কি করবো তুমি বলতে পারো ?

ইলিয়েনা : আপনি যখন আপনার ভালোবাসার কথা বলেন, আমার কথা বলেন, তখন আমি সত্যিই আপনাকে বুঝতে পারি না ইভান পেত্রোভিচ। সত্যি, বিশ্বাস করুন···আসলে আপনাকে আমার কিছুই বলার নেই। [দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে] শুভরাত্রি !

ভোনিৎস্কি : [ওর পথ আটকিয়ে] যেও না, দাঁড়াও, লক্ষ্মীটি ! তুমি আমাকে ঠিকই বুঝতে পারতে হেলেনি—যদি কখনও জানার চেষ্টা করতে আমার সারা বুক জুড়ে কি ভীষণ অসহ্য যন্ত্রণা। যখন আমি ভাবি, আমার এত কাছে, একই ছাদের

নিচে এমন দুর্লভ একটা জীবন—ফুলের মতো পবিত্র তোমার জীবন অকালে শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে, তখন আমি কেমন করে তোমার কথা না ভেবে পারি বলো ?

ইলিয়েনা : [তীক্ষ্ণ কটাক্ষে] ইভান পেত্রোভিচ, আপনি কিন্তু সত্যাই মাতাল হয়েছেন।

ভোনিৎস্কি : হয়তো, হয়তো নয়···কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না সোনামণি।

ইলিয়েনা : ডাক্তার নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন ?

ভোনিৎস্কি : হ্যাঁ, রাতটা ও আজ আমার সঙ্গেই থাকবে।

ইলিয়েনা : তাই রাত্তিরেই আবার মদ গিলে মাতাল হয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি এর কোন দরকার ছিলো ইভান পেত্রোভিচ ?

ভোনিৎস্কি : হ্যাঁ, হেলেনি···জীবনের স্বপ্নগুলোকে রাঙিয়ে তোলার জন্যে অন্তত এর প্রয়োজন ছিলো।

ইলিয়েনা : বেশ, তাহলে বিছনায় শুয়ে শুয়েই রঙিন স্বপ্ন দেখুন, আমাকে ছেড়ে দিন।

ভোনিৎস্কি : হেলেনি, লক্ষীটি, শোনো···[অধীর আবেগে হাতটা তুলে নিয়ে আবার চুমু দেয়] তোমার মতো এমন দুর্লভ···

ইলিয়েনা : [তীক্ষ্ণ স্বরে] নাঃ, এ অসহ্য ! ছাড়ুন !

[দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়]

ভোনিৎস্কি : [স্বগত ভঙ্গিতে] আজ ও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলো, অথচ দশ বছর আমার বোনের বাড়িতে কতবার দেখেছি ওকে। ওর তখন বয়েস সতেরো আর আমার সাঁইত্রিশ। সেদিনই কেন যে ওর প্রেমে পড়িনি, ওকে বিয়ে করার কথা বলিনি—আজ ভাবতেও অবাক লাগে ! অথচ সেদিন আমি অনায়াসেই তা পারতুম ; ও হতো আমার প্রিয়তমা বধূ··· হয়তো এমনি ঝড়ের রাতে আমরা দুজন জেগে উঠতুম ; বাজ পড়ার শব্দে বিদ্যুতের ঝলকে ও ভীষণ ভয় পেয়ে যেতো, আর আমি ওকে দু হাতে নিবিড় করে বুকের মধ্যে

জড়িয়ে সান্ত্বনা দিতুম—ভয় কি সোনামণি, আমি তো তোমার কাছে রয়েছি। আঃ, এমনি কোনো নিবিড় মুহূর্তের কথা ভাবলেই আবেশে সারা শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার সমস্ত ভাবনা কেন এমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে···কেন ও আমার দিকে অমন ঘৃণার চোখে তাকালো? অথচ আশ্চর্য, একদিন এই বুড়ো বেতো অধ্যাপকটাকে কি শ্রদ্ধাই না করতুম, নিজেরা না খেয়ে আমি আর সোনিয়া জমিতে দিন রাত গাধার মতো খেটে ওকে বছরে হাজার হাজার রুবল পাঠিয়েছি! ওর শিক্ষা-দীক্ষা, পাণ্ডিত্যের জন্যে আমার নিজেরই গর্ব হোতো, যা কিছু লিখতো মনে হোতো কি আশ্চর্য প্রতিভাদীপ্ত···কিন্তু আজ আমি বুঝতে পেরেছি —প্রতিভা বলতে নিজের ওর কিছু নেই, বুদ্বুদের মতো একদিন ঠিকই মিলিয়ে যাবে···

[আলুথালু বেশে, কিছুটা মাতাল অবস্থাতেই আস্ত্রভ প্রবেশ করে। ওর পেছনে গিটার হাতে তেলিয়েঘিন।]

আস্ত্রভ : আরে ভাই, বাজাও বাজাও!

তেলিয়েঘিন : না, মানে···সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে তো···

আস্ত্রভ : যাঃ বাব্বা, তুমি এখানে! আর আমি সারা বাড়ি তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি! বাজ পড়ার শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো, জেগে দেখি তুমি ঘরে নেই। যাই বলো, দারুণ কিন্তু এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেলো। কটা বাজে বলো তো?

ভোনিৎস্কি : কে জানে!

আস্ত্রভ : মেয়েরা সব গেলো কোথায়? একটু আগেও তো ইলিয়েনা আন্দ্রিয়েভনার গলা পাচ্ছিলুম তাই না?

ভোনিৎস্কি : হ্যাঁ, একটু আগে ও এখানেই ছিলো।

আস্ত্রভ : ভদ্রমহিলা কিন্তু সত্যিই রূপসী, মানে যাকে বলে রীতিমতো আকর্ষণীয়া! [টেবিলে ওষুধের শিশিগুলো নাড়তে নাড়তে] বাব্বাঃ, এ যে দেখছি একেবারে ওষুধের কারখানা! হারকভ,

মস্কো, তুলা—কোথাও থেকে আর আসতে বাকি নেই। বাতের জন্যে উনি সারা রাশিয়া চষে ফেলেছেন দেখছি। [হঠাৎ তোনিংস্কির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে] কি ব্যাপার, তোমাকে আজ এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? অধ্যাপকের জন্যে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

তোনিংস্কি : বাজে বোকো না!

আস্ত্রভ : তাহলে, অধ্যাপকের স্ত্রীর প্রেমে পড়েছো?

তোনিংস্কি : ও আমার বন্ধু।

আস্ত্রভ : এখনও?

তোনিংস্কি : এখনও বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?

আস্ত্রভ : মেয়েরা পুরুষের বন্ধু হতে পারে তিনটে পর্যায় অতিক্রম করে এসে তবে—প্রথমে অন্তরঙ্গ, পরে কর্ত্রী, সবশেষে বন্ধু।

তোনিংস্কি : তোমার এ ধরনের নিষ্ঠুর দার্শনিকতার কোন মানে হয় না।

আস্ত্রভ : হুঁ, তা অবশ্য বলতে পারো···আসলে কি জানো ভায়া, আজ আমি একটু মাতাল হয়ে পড়েছি। সাধারণত এই ধরনের মাতাল আমি মাসে একবারই হই। তা বলে তুমি আবার ভেবো না যেন এরকম অবস্থায় আমি আমার সত্তাকে হারিয়ে ফেলি। বরং ঠিক তার উলটো। এমনি অবস্থায় আমি দারুণ মৌজে থাকি, ভবিষ্যতের জন্যে অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর সব পরিকল্পনা করি। জটিলতম অস্ত্রোপচারগুলো তখন আমার কাছে জলের মতো সহজ মনে হয়···বিশ্বাস করো, কেবল তখনই আমার মনে হয় সাধারণ মানুষের জন্যে আমি দারুণ কিছু একটা করছি। আর তেমনি কোনো অবস্থায় আমার নিজস্ব দার্শনিক ভাবনাগুলো একটা নির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে, যা তোমাদের কাছে মনে হতে পারে নিষ্ঠুর অবাস্তব। যাগ্‌গে, ছাড়ো ওসব বাজে কথা, [তেলিয়েগিনকে] দোস্ত, তুমি বরং আমাদের কিছু একটা বাজিয়ে শোনাও।

তেলিয়েঘিন : শোনাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আস্ত্রভ : আরে কিছু হবে না, আস্তে আস্তে বাজাও।

[তেলিয়েঘিন খুব আস্তে আস্তে করুণ একটা সুর বাজায়।]

আস্ত্রভ : আর একটু কিছু পান করতে পারলে ভালো হতো। আমার মনে হয় বোতলে এখনও খানিকটা ব্রাণ্ডি পড়ে রয়েছে···

[হঠাৎ সোনিয়াকে প্রবেশ করতে দেখে কথা ঘুরিয়ে নেয়]

ইস্, দেখেছো কাণ্ড···আমি টাইটাই পরতে ভুলে গেছি।

[দ্রুত বেরিয়ে যায়। তেলিয়েঘিন ওকে অনুসরণ করে।]

সোনিয়া : ভানিয়ামামা, তুমি আবার ডাক্তারের সঙ্গে মদ খেয়েছো? তোমরা দুজনে বেশ জুটেছো ভালো! এই বয়েসে অতটা করে মদ না খেলেই পারো।

ভোনিৎস্কি : বয়েসের সঙ্গে এর কোথাও কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যি-কারের জীবন বলতে যখন মানুষের কিছু থাকে না, তখন কল্পনাকেই আঁকড়ে ধরতে হয়। তবু কিছু না-থাকার চেয়ে কিছু থাকা ভালো।

সোনিয়া : কিন্তু ভানিয়ামামা, ফসল সব কাটা হয়ে গ্যাছে, প্রতিদিন যে ভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, মাড়ায়ের আগেই তা নষ্ট হয়ে যাবে, আর তুমি এখনও কল্পনাকে আঁকড়ে ধরে রঙিন সব স্বপ্ন দেখছো। তুমি কিন্তু ক্ষেত-খামারের কাজ কিছু দেখছো না ভানিয়ামামা···আমি একা খাটতে খাটতে প্রায় সারা হয়ে যাচ্ছি··· [সতর্ক হয়ে] একি ভানিয়ামামা, তোমার চোখে জল কেন!

ভোনিৎস্কি : জল। ও কিছু নয়। [সোনিয়ার হাতে গালে চুমু দিয়ে] নাঃ, তুইও দেখছি ঠিক তোর মার মতো হয়েছিস। আঃ, ও যদি জানতে পারতো···

সোনিয়া : [অবাক হয়ে] তোমার কি হয়েছে ভানিয়ামামা ?

ভোনিৎস্কি : কি হয়েছে আমি নিজেই জানি না···কোথায় কেন জানি একটা যন্ত্রণা হচ্ছে···তুই কিছু ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে···আমি যাই···

[ভোনিৎস্কি বেরিয়ে যায়। সোনিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। পরমুহূর্তেই আস্ত্রভ প্রবেশ করে— টাই পরা, বেশবাস অনেকটা সংযত]

আস্ত্রভ : বুঝলে ভানিয়া, যা ভেবেছি ঠিক তাই···বোতলে এখনও অনেকটা···

সোনিয়া : মিখাইল লভোভিচ !

আস্ত্রভ : [চমকে] কে, সোনিয়া ?

সোনিয়া : ভালো লাগলে আপনি একা যত খুশি পান করুন, কিন্তু ভানিয়ামামাকে আর দলে টানবেন না। দোহাই আপনার, আমি মিনতি করছি ! অত পান করাটা ওঁর শরীরের পক্ষে সত্যিই খুব ক্ষতিকর !

আস্ত্রভ : না না, বেশ, ঠিক আছে···আমরা দুজনেই আর কেউ পান করবো না। [সামান্য একটু বিরতির পর] তাছাড়া আমার এখন বাড়ি ফেরা দরকার। ঘোড়া জুতে ঠিকঠাক করতে করতে হয়তো ভোরই হয়ে যাবে।

সোনিয়া : এখনও তো বৃষ্টি পড়ছে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে যান।

আস্ত্রভ : কিন্তু এখনই বেরিয়ে পড়তে না পারলে আমার আবার দেরি হয়ে যাবে।

সোনিয়া : তার আগে কিছু খেয়ে যান। সন্ধ্যে থেকে নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয়নি ?

আস্ত্রভ : সত্যিই তাই। সন্ধ্যে থেকে কেন, সারাদিনই আজ আর কিছু পেটে পড়েনি।

সোনিয়া : ওমা, সে কি কথা ! বলবেন তো···

[সোনিয়া ব্যস্ত হাতে খাবার রাখার ছোট আলমারিটা খুলে ছুটো প্লেটে রুটিতে মাখিয়ে রাখে। আস্ত্রভ জলের বোতল থেকে এক গেলাস জল ঢেলে পান করে। সোনিয়া একটা প্লেট আস্ত্রভের দিকে এগিয়ে দেয়।]

সোনিয়া : নিন। [বিরতি] আপনি কিন্তু আর একটু অপেক্ষা করে গেলেই পারতেন।

আস্ত্রভ : [খেতে খেতে] আঁসলে কি জানো, তোমাদের বাড়িতে, তোমাদের এই অদ্ভুত পরিবেশে আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে···তোমার বাবা তো দিনরাত পড়াশোনা আর বাতের ব্যথা নিয়েই অস্থির, ভানিয়ামামা হতাশায় গলা পর্যন্ত ডুবে রয়েছে, তোমার দিদিমা আর সৎমাও···

সোনিয়া : কেন, আমার সৎমার আবার কি হলো ?

আস্ত্রভ : ওঁর সবকিছুই সুন্দর—চোখ মুখ চুল, পোশাক-পরিচ্ছদ, মন, এমন কি কথা বলার ভঙ্গিটাও আশ্চর্য সুন্দর···উনি যে রীতি-মতো রূপসী এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু খাওয়া ঘুমনো আর আমাদের দিকে রূপের ছটা ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উনি আর কিছুই করেন না। দায়িত্ববোধ বলতে ওঁর কিছুই নেই, অথচ সবাই ওঁর হয়ে খেটে চলেছে, তাই নয় কি না বলো ? অলস জীবন কখনই সুন্দর হতে পারে না। অবশ্য আমি জানি না, এসব বলার কোনো অধিকার আমার আছে কিনা, হয়তো আমি তোমার ভানিয়ামামারই মতো হতাশায়, বিতৃষ্ণায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি।

সোনিয়া : ও, আপনিও তাহলে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভুগছেন মিখাইল লভোভিচ ?

আস্ত্রভ : 'না মানে···জীবনকে আমি খুবই ভালোবাসি। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবন, রাশিয়ার অজ গ্রাম্য জীবন আমি কেমন যেন ঠিক সহ্য করতে পারছি না। আসলে এর মধ্যে কোনো নতুনত্ব, কোনো আশার আলোই আমি খুঁজে পাই না।

গাঢ় অন্ধকার রাতে অরণ্যের মধ্যে পথ হারিয়ে তুমি যদি একা পাগলের মতো ছুটে বেড়াও আর তখন যদি দূরে ছোট্ট একটা আলোর বিন্দু তোমার চোখে পড়ে, তখন তোমার ক্লান্তির কথা একবারও মনে পড়বে না, মনে পড়বে না অন্ধকারের কথা, ঝোপঝাড় বা ডাল-পালায় হাত মুখ ছড়ে যাওয়ার কথা। তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না, এ অঞ্চলে আমি সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করি, অথচ কোথাও দূরতম একটা আলোর রেখাও আমার চোখে পড়ে না···মাঝে মাঝে মনে হয় এ জীবন সত্যিই দুর্বিষহ। লোকজন আমার একদম ভাল লাগে না, কাউকে যেন ঠিক সহ্য করতে পারি না।

সোনিয়া : কাউকে না?

আস্ত্রভ : কাউকে না। শুধু তোমাদের বুড়ি নানি মারিনাকেই যা আমার একটু ভালো লাগে, হয়তো বয়েস হয়েছে বলে। নইলে এখানকার প্রায় সব চাষীরাই সমান, অশিক্ষিত। আর যাঁরা শিক্ষিত, নাক তাঁদের অসম্ভব উঁচু। নিজেদের গণ্ডির বাইরে ওঁরা আর কিছুই দেখেন না, কিছুই শোনেন না। পাণ্ডিত্যের গরিমায় ওঁরা মানুষের দিকে অবজ্ঞার চোখে ছাড়া তাকাতেই জানেন না। জানো, এখানকার সব কিছুই আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়। আমি যে অরণ্যকে ভালোবাসি—সেটাও অদ্ভুত। আমি যে মাংস খাই না—সেটাও অদ্ভুত। প্রকৃতি বা মানুষের মধ্যে নিরপেক্ষ মনোভাব দেখানোর মতো আর কোনো জিনিসই অবশিষ্ট নেই। এখন আর একটু পান করতে পারলে বেশ ভালো হতো···

সোনিয়া : [বাধা দিয়ে] না না, দোহাই আপনার, মিনতি করছি, আপনি আর পান করবেন না।

আস্ত্রভ : কেন?

সোনিয়া : আপনি এত ভালো, এত সুন্দর···আর পাঁচজন সাধারণ

মানুষ, মদ গিলে তাস পিটে যারা সারাটা দিন কাটিয়ে দেয় তাদের সঙ্গে নিজেকে কেন এমন করে মিশিয়ে ফেলতে চাইছেন? আপনিই তো বলেন—ঈশ্বরের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাকে ধ্বংস করা ছাড়া মানুষ নিজে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। তাহলে আপনিই বা নিজেকে এমন মিছিমিছি ধ্বংস করছেন কেন? দোহাই আপনার, এভাবে আর নিজেকে নষ্ট করবেন না···

আস্ত্রভ : বেশ, আমি আর মদ খাবো না।

সোনিয়া : কথা দিন।

আস্ত্রভ : আমি শপথ করে বলছি।

সোনিয়া : [হাতদুটো নিবিড় করে জড়িয়ে] অসংখ্য ধন্যবাদ!

আস্ত্রভ : নাঃ, মাথা আমার এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। দিন দিন আমি খুব রুক্ষ আর ভোঁতা হয়ে যাচ্ছি, তাই না? আসলে কি জানো, আমি কখনও কাউকে ভালোবাসিনি, কোনোদিন বাসতেও পারবো না। এখনও আমাকে যা আকর্ষণ করে তা হলো রূপ। এবং ইলিয়েনা আন্দ্রিয়েভনার মতো কোনো রূপসী মেয়ে হলে হয়তো এমন উদাসীনও থাকতে পারবো না। কিন্তু সেটা আর যা-ই হোক, নিশ্চয় ভালোবাসা নয়···

সোনিয়া : আচ্ছা মিখাইল লভোভিচ, ধরুন আমার যদি কোনো বান্ধবী থাকতো, কিংবা ছোট বোন···আর আপনি যদি জানতে পারতেন সে আপনাকে ভালোবাসে? তাহলে কি করতেন?

আস্ত্রভ : আমি? কি জানি, জানি না। সম্ভবত কিছুই না। হয়তো জানাতুম আমি ওকে ভালোবাসি না···মানে ভালো বাসতে পারি না। [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] নাঃ, এখনই আমার বেরিয়ে পড়া উচিত, নইলে ভোরের আগে পৌঁছতে পারবো না। আমি এখান থেকে চুপিচুপি কেটে পড়ি, নইলে তোমার ভানিয়ামামা আবার পাকড়াও করবে। [ঝাঁকুনি দিয়ে সোনিয়ার হাতটা ছেড়ে দেয়] বিদায়।

[আস্ত্রভ বেরিয়ে যায়]

সোনিয়া : [স্বগত স্বরে] ও আমাকে একটা কথাও বললো না… ওর হৃদয়, ওর মন এখনও আমার কাছে অজানা। তাহলে কেন আমার এত ভালো লাগছে, কেন নিজেকে এমন সুখী সুখী মনে হচ্ছে? [আশ্চর্য করুণ, ম্লান ভঙ্গিতে হেসে] আচ্ছা, যখন বললুম—আপনি ভালো, আপনি খুব সুন্দর, আপনি আর পাঁচজনের মতো নন, তখন কি খুব খারাপ শোনাচ্ছিলো? যখন আমার বান্ধবী বা ছোট বোনের কথা বললুম, ও কিন্তু কিছু বুঝতে পারেনি। ইশ্, আমি যদি দেখতে সুন্দর হতুম, ইলিয়েনা আন্দ্রিয়েভনার মতো রূপসী, তাহলে ও আমাকে নিশ্চয়ই ভালো না বেসে পারতো না…

[ইলিয়েনা প্রবেশ করে]

ইলিয়েনা : [জানলাটা খুলে দিয়ে] ঝড় থেমে গ্যাছে। আঃ, কি মিষ্টি আর ঠাণ্ডা বাতাস বইছে! [ঘুরে দাঁড়িয়ে] ডাক্তার, ডাক্তার গ্যালেন কোথায়?

সোনিয়া : চলে গ্যাছেন।

[কয়েক মুহূর্তের জন্যে এক নিটোল নিস্তব্ধতা]

ইলিয়েনা : সোনিয়া?

সোনিয়া : উঁ!

ইলিয়েনা : আর কত দিন আমার ওপর রাগ করে এমন মুখ গোমড়া করে থাকবে বলো তো? আমরা দুজনে তো পরস্পরকে কখনও আঘাত করিনি, ঝগড়া করিনি, তাহলে তুমি কেন আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা করছো?

সোনিয়া : আর কখনও করবো না।

ইলিয়েনা : বেশ, এখন থেকে তাহলে ভাব হয়ে গ্যালো?

সোনিয়া : হাঁ, [ইলিয়েনাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে] ভাব, ভাব, ভাব।

[বিরতি]

সোনিয়া : বাপি শুয়ে পড়েছে?

ইলিয়েনা : না, বৈঠকখানায় জেগে বসে রয়েছে। জানো, আমরাও দুজনে গত কয়েক সপ্তা ধরে কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলি না …অথচ কোনো কারণ নেই। [ছোট আলমারিটার দিকে হঠাৎ নজর পড়তে] একি, এটা আবার কে খুললো ?

সোনিয়া : আমি। মিখাইল লভোভিচের খুব খিদে পেয়েছিলো, তাই।

ইলিয়েনা : ভাবই হয়ে গ্যালো যখন, এসো, দুজনে মিলে কিছু পান করা যাক।

সোনিয়া : দাঁড়াও, আমি নিজে ঢেলে দিচ্ছি।

[দুজনে গেলাসে ছোট ছোট কয়েকটা চুমুক দিয়ে পরস্পরকে চুম্বন করে]

ইলিয়েনা : আমি জানি কেন তুমি আমার ওপর রাগ করেছিলে, তুমি ভেবেছিলে তোমার বাবাকে বিয়ে করার পেছনে হয়তো আমার কোনো দুরভিসন্ধি আছে। কিন্তু আমি শপথ করে বলছি, তুমি বিশ্বাস করো, আমি ওকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলুম শিক্ষিত, শোভন, কৃতিসম্মত একজন মানুষ হিসেবে আমি নিজে থেকেই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলুম। তখন বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলুম ওইটেই বুঝি ভালোবাসা। হ্যাঁ, সব দোষ আমার। তা বলে তুমি এভাবে আমার মনে কষ্ট দিতে পারো না।

সোনিয়া : সত্যি বলছি, আর দেবো না…কক্ষোনো না। [মুহূর্তের বিরতির পর] আচ্ছা হেলেনি, সত্যি করে বলো তো— তুমি সুখী ?

ইলিয়েনা : না।

সোনিয়া : আমি জানতুম। আর একটা কথা, একটুও কিন্তু গোপন করবে না…

ইলিয়েনা : করবো না।

সোনিয়া : কথা দাও।

ইলিয়েনা : দিলুম।

সোনিয়া : তোমার স্বামীর বয়েস যদি আরও অনেক কম হতো তুমি খুব খুশি হতে, তাই না ?

ইলিয়েনা : তুমি কিন্তু আজকাল ভীষণ দুষ্টু হয়েছো ! [চেউ তুলে হাসতে হাসতে] নিশ্চয়ই খুশি হতুম।

সোনিয়া : এবার আর একটা প্রশ্ন করবো, তুমি কিন্তু একটুও রাগ করবে না।

ইলিয়েনা : না না, যত খুশি প্রশ্ন করো, আমি একটুও রাগ করবো না।

সোনিয়া : তুমি কি মিখাইল লভোভিচকে পছন্দ করো ?

ইলিয়েনা : হাঁা, খুব।

সোনিয়া : [হাসতে হাসতে] ইশ্‌, অথচ দ্যাখো, আমি কি বোকা, কি ভীষণ বোকা ! নিশ্চয়ই···ও চলে গ্যাছে, তবু আমি যেন এখনও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ওর কণ্ঠস্বর, ওর পায়ের শব্দ। যখনই আমি ওই অন্ধকার জানলাটার দিকে তাকাই, আমি তার কাচে ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাই। এই, ওর কথা আমাকে কিছু বলো না লক্ষীটি···

ইলিয়েনা : ওমা, আমি কি বলবো !

সোনিয়া : যা হোক কিছু···জানো, ও কিন্তু ভীষণ চালাক, অনেককিছু জানে···রোগের চিকিৎসা করা, গাছপালা লাগিয়ে অরণ্যকে সাজানো···

ইলিয়েনা : হাঁা, আসলে ওঁর প্রতিভা আছে। সৎ, সাহসী, স্বাধীনচেতা ও ···শুধু তাই নয়, কি হলে মানুষ ভবিষ্যৎ-জীবনে সুখী হতে পারবে, মনে মনে সেই ছবি আঁকার মতো প্রশস্ত দূর-দৃষ্টিও আছে। এমন ঋজু প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ আজকে দিনের রাশিয়ায় খুব কমই চোখে পড়ে, আর চোখে পড়লে আমরা তাকে ভালো না বেসে থাকতে পারি না। মাঝে মধ্যে উনি পান করেন ঠিকই, কিন্তু সেটা এমন কিছুই না। সারা দিন ওঁকে যে হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়—রোদ নেই, ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, চারদিকে কেবল রোগ, শোক আর দুখ,

এর মধ্যে একা একা মুখ বুজে সংগ্রাম করে যাওয়া সত্যিই খুব কঠিন। ওঁর জীবনটাই অদ্ভুত! অথচ আমরা, আমার কথাই ধরো না কেন··· [বিষণ্ণ স্বরে] এ জীবনে আমার কোথাও কোনো মূল্য নেই—না পারিবারিক জীবনে, না গানের ক্লাসে, না ভালোবাসায়। সত্যি সোনিয়া, তুমি বিশ্বাস করো · আমার চেয়ে অসুখী বোধহয় আর কেউ নেই, কেউ না···এ্যাকি, তুমি হাসছো কেন?

সোনিয়া : [হাসতে হাসতে দু হাতে মুখ ঢাকে] আমি সুখী, আমি সুখী, আমি সবচেয়ে সুখী···[ইলিয়েনাকে দু হাতে জড়িয়ে] এই, একটা গান শোনাও না লক্ষ্মীটি··

ইলিয়েনা : কিন্তু তোমার বাবা যে এখনও ঘুমোয়নি। অসুস্থ থাকলে ও গান একদম সহ্য করতে পারে না। তুমি জিগেস করে এসো, ওর যদি অসুবিধে না হয় আমি তোমাকে নিশ্চয়ই শোনাবো।

সোনিয়া : এক মিনিট, আমি একখুনি জিগ্যেস করে আসছি।

[সোনিয়া দ্রুত বেরিয়ে যায়। বাগান থেকে ভেসে আসে বাড়-প্রহরীর লাঠির ঠক ঠক শব্দ।]

ইলিয়েনা : [আপন মনে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে] আঃ, কত দিন যে পিয়ানোর সামনে এসে বসিনি আমি নিজেই জানি না! আজ আমি সবচেয়ে করুণ একটা গান গাইবো আর অবুঝ একটা মেয়ের মতো ঝর ঝর করে কাঁদবো। [জানলা থেকে চেঁচিয়ে] কে, ইয়েফিম?

প্রহরী : হ্যাঁ, আমি ম্যাডাম।

ইলিয়েনা : অত জোরে জোরে শব্দ কোরো না, মনিব এখনও জেগে রয়েছেন।

প্রহরী : ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি চলে যাচ্ছি।

[বিরতি]

সোনিয়া : [প্রবেশ করে] না, কিছুতেই রাজি করাতে পারলুম না।

সেরেব্রিয়াকভের বাড়ির বৈঠকখানা। ডান দিকে, বাঁ দিকে এবং মাঝখানে একটা করে দরজা। তখন দিনের আলোয় সারা ঘর ভরে রয়েছে। ভোনিংস্কি আর সোনিয়া বসে রয়েছে, ইলিয়েনা আন্দ্রিয়েভনা আপন মনে পায়চারি করছে।

ভোনিংস্কি : অনুগ্রহ করে মহামান্য অধ্যাপক আজ আমাদের এই বৈঠকখানায় বেলা একটার সময় সমবেত হবার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। অথচ [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] পনেরো মিনিট হয়ে গেলো এখনও ওঁর পাত্তাই নেই।

ইলিয়েনা : হয়তো বিশেষ কোনো কাজে আটকে পড়েছে।

ভোনিংস্কি : ও তো কোনো কাজই করে না, তার আবার বিশেষ কি? সারাদিন পড়ে পড়ে ছাইভস্ম লেখা, আর অন্যকে হিংসে করা—এ ছাড়া ওর আর কাজটা কি শুনি?

সোনিয়া : [ভর্ৎসনার সুরে] আঃ, ভানিয়ামামা।

ভোনিংস্কি : হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক···বেশ, আমি আর কিচ্ছু বলবো না। [ইলিয়েনার প্রতি ইঙ্গিত করে] এই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি

ইলিয়েনা : আপনি কিন্তু একটু পরেই আবার ভুলে যাবেন। আসলে আপনি সারাক্ষণ কিছু একটা নিয়ে বকবক না করে থাকতে পারেন না। [বিষণ্ণ সুরে] সত্যি, মাঝে মাঝে এমন ক্লান্ত, এমন বিশ্রী, একঘেয়ে লাগে। তবু যদি কিছু একটা করার থাকতো···

সোনিয়া : একটা কেন, হাজারটা আছে। এবং ইচ্ছে থাকলেই তা করা যায়।

ইলিয়েনা : যেমন?

সোনিয়া : সম্পত্তিটা চালানোর কাজে সাহায্য করতে পারো, বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাতে পারো, রোগীদের দেখাশোনা করতে

পারো। এমনি আরও অনেক কিছু। তুমি আর বাণি এখানে বাস করতে আসার আগে পর্যন্ত আমি আর ভানিয়ামামা, আমরা দুজনে শাক-সব্জী গম বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতুম।

ইলিয়েনা : এসব আমি জীবনে কখনও করিনি, তাছাড়া ও আমার ভালোও লাগে না।

সোনিয়া : তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে সবকিছুই অভ্যেস হয়ে যায়। [হাসতে হাসতে] তবে আর যা-ই করো, নিজেকে নিয়ে এমন ক্লান্ত হয়ে পোড়ো না লক্ষ্মীটি। বিষণ্ণ হওয়া আর আলসেমি করে সময় কাটানো, দুটো প্রায় একই জিনিস। এই দ্যাখো না, ভানিয়ামামা কুঁড়েমি করে কোনো দিকে না তাকিয়ে তোমাকে কেবল ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে। আমি সব কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে বসে বসে বকবক করছি। আমিও ভীষণ কুঁড়ে হয়ে গেছি। আগে ডাক্তার মিখাইল লভোভিচ আমাদের এখানে খুব কমই আসতো, বার বার উপরোধ-অনুরোধ করলে বড় জোর মাসে হয়তো একবার আসতো। কিন্তু এখন প্রায় প্রতিদিনই আসে, রুগী দেখা, গাছপালা লাগানো ওর মাথায় উঠেছে। না ভাই, যা-ই বলো, সত্যিই তুমি জাদু জানো।

ভোনিৎস্কি : ঠিক, ঠিক বলেছো…[গভীর উদ্দীপনায় ইলিয়েনার দিকে তাকিয়ে] উহুঁ, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, সোনিয়া ঠিকই বলেছে। তোমার রক্তে আশ্চর্য একটা জাদু আছে! জল-পরীদের মতো গভীর ভালোবাসায় তুমি যদি কারুর দিকে চোখ তুলে তাকাও…

ইলিয়েনা : আঃ, চুপ করুন! আমাকে একটু একা থাকতে দিন। নাঃ, এ কিন্তু ভীষণ অন্যায়।

[ছুটে বেরিয়ে যাবার আগেই ভোনিৎস্কি বাধা দেয়]

তোনিংস্কি : যেও না, লক্ষীটি, শোনো ! নাঃ, সত্যিই আমার অন্যায় হয়ে গ্যাছে, আমি [হাতে চুমু দিয়ে] ক্ষমা চাইছি।

ইলিয়েনা : আপনি জানেন না, মনে মনে আমি কি ভীষণ অধৈর্য হয়ে উঠেছি !

তোনিংস্কি : বেশ, ঠিক আছে, আর ঝগড়া করবো না। আঘাত করার প্রতিদানে তোমাকে খুব সুন্দর একটা উপহার দেবো। শরতের এক গুচ্ছ টকটকে লাল গোলাপ। আজ ভোরে তোমার জন্যে আমি তুলে রেখেছি।

[বেরিয়ে যায়]

ইলিয়েনা : [গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানলার দিকে এগিয়ে যায়] দেখতে দেখতে শরৎ শেষ হয়ে গেলো, শীতকালটা যে এখানে কি ভাবে কাটবে কে জানে। [বিরতি] ডাক্তার কোথায়, কই, ওঁকে তো দেখছি না ?

সোনিয়া : ভানিয়ামামার ঘরে। কি যেন লিখছে! [বিরতি] আচ্ছা হেলেনি, আমি একটুও দেখতে সুন্দর নই, তাই না ?

ইলিয়েনা : [চুলে হাত বোলাতে বোলাতে] তোমার চুলগুলো কিন্তু সত্যিই খুব সুন্দর।

সোনিয়া : না হেলেনি, না! তুমি জানো না, ছ বছর ধরে আমি ওকে ভালোবেসেছি, আমি ওকে আমার মার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি। প্রতিমুহূর্তে আমি যেন ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, রক্তের প্রতিটা স্পন্দনে ওর স্পর্শ পাই, দরজার দিকে কেবলই তাকিয়ে থাকি, ভাবি এই বুঝি আসবে। ও কিন্তু আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। [কান্নার মতো করুণ স্বরে] আমি একটুও দেখতে সুন্দর নই, অথচ ওকে আমি কি ভীষণ ভালোবাসি। যখনই ওর মুখের দিকে তাকাই, নিজেকে আমি কিছুতেই ধরে রাখতে পারি না। কাল আমি ভানিয়ামামাকে সব বলেছি···বাড়ির ঝি-চাকররা সবাই জানে আমি ওকে ভালোবাসি।

ইলিয়েনা : আর ডাক্তার, উনি জানেন তুমি ওঁকে ভালোবাসো ?

সোনিয়া : ও-ই শুধু জানে না।

ইলিয়েনা : সত্যি, উনি ভারি অদ্ভুত মানুষ ! দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে···না, তার আগে ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি। আজই আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলবো·· [কি যেন ভেবে] নিশ্চয়ই, এভাবে আর কতদিন তুমি একা একা দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াবে !

সোনিয়া : হেলেনি, লক্ষ্মীটি···

ইলিয়েনা : তুমি কিচ্ছু ভেবো না। একটু ছলনার আশ্রয় নিলে উনি তোমাকে ভালোবাসেন কি না জেনে নেওয়া কিছুই কঠিন হবে না। আরে বোকা মেয়ে, না না·· [আদর করে] এতে দুঃখ বা লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমি ওঁকে এমন ভাবে প্রশ্ন করবো উনি কিছু বুঝতেই পারবেন না। আমার শুধু জানা দরকার হ্যাঁ কি না যদি না হয়, তাহলে কিন্তু ওঁর আর এখানে আসা উচিত নয়। তাই কি না বলো ?

সোনিয়া : [অস্ফুট স্বরে] হ্যাঁ।

ইলিয়েনা : চোখের সামনে ওঁকে দেখতে না পেলে তখন তোমার আর এত কষ্ট হবে না।

সোনিয়া : কিন্তু ওকে যদি আর কখনও না দেখতে পাই ?

ইলিয়েনা : তবু মিছিমিছি আশা করে বসে থাকাটা আরও খারাপ। ঠিক আছে, যা বলার আমি নিজে বলবো, তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না! উনি আমাকে বলেছিলেন কি যেন একটা হাতের কাজ দেখাবেন···যাও, তুমি গিয়ে বলো আমি ওটা দেখতে চাই।

[দরজার কাছ পর্যন্ত দাঁড়ায় এসে সোনিয়া কি যেন বলবে বলে থমকে]

ইলিয়েনা : কিছু বলবে ?

সোনিয়া : নাঃ, থাক।

[সোনিয়া বেরিয়ে যায়]

ইলিয়েনা : [স্বগত স্বরে] অন্যের কারুর মনের গোপন কথা জেনে তাকে সাহায্য না করতে পারার চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই। আমি জানি, ডাক্তার ওকে নিশ্চয়ই ভালোবাসেন না—কিন্তু ওকে বিয়ে না করারই বা কি কারণ থাকতে পারে? হয়তো ও দেখতে আশ্চর্য রূপসী নয়, কিন্তু গ্রাম্য একজন ডাক্তারের পক্ষে চমৎকার মানাতো, বিশেষ করে ওঁর জীবনের ঠিক এই সময়টাতে। সোনিয়া খুবই বুদ্ধিমতী আর ভীষণ সরল··· সত্যি, বেচারির জন্যে আমার কষ্ট হয়! আসলে চারপাশে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ানো একঘেয়ে ক্লান্ত মানুষদের মধ্যে থেকে থেকে ও-ও ক্লান্ত হয়ে গ্যাছে। কিন্তু আর যা-ই হোক, ও-ও তো মানুষ, আর পাঁচজনের সঙ্গে ওর এমন একটা কিছু তফাৎ নেই, অন্ধকার রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো বুদ্ধিদীপ্ত কোনো রূপবান যদি ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, ও কি তাকে ভালো না বেসে থাকতে পারে? শুধু ও কেন, হয়তো কোনো মেয়েরই পক্ষেই তা সম্ভব নয়! এমন কি আমার নিজের দুর্বলতাও তো আমার কাছে অজানা নয়···নিশ্চয়ই, মাঝে মাঝে ওঁকে দেখতে না পেলে আমারও ভীষণ খারাপ লাগে। ইভান পেত্রোভিচ তো সেদিন স্পষ্টই বললেন আমার রক্তে একটা আশ্চর্য জাদু আছে, জলপরীদের মতো গভীর ভালোবাসায় যদি কারুর দিকে চোখ তুলে তাকাই···না না, তা হয় না···আমি বরং চলেই যাবো, খাঁচা-খোলা পাখির মতো যে দিকে দু চোখ যায় সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে যাবো। কিন্তু আমি আবার ভীষণ ভীরু আর লাজুক···নইলে উনি এখানে প্রায় প্রতিদিনই আসেন, আমি জানি কেন আসেন··· আমার উচিত সোনিয়ার হাতদুটো ধরে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া···

আস্ত্রভ : [গোল করে পাকানো একটা কাগজ নিয়ে প্রবেশ করে] আজকের দিনটা কিন্তু সত্যিই ভারী চমৎকার!

ইলিয়েনা : হ্যাঁ। [এগিয়ে এসে] কি যেন একটা হাতের কাজ দেখাবেন বলেছিলেন, এনেছেন ?

আস্ত্রভ : [চমকে ওঠে] নিশ্চয়ই। [কাগজখানা টেবিলের ওপর বিছিয়ে ছবি আঁকার পিন দিয়ে আটকে দেয়] এই যে…না, তার আগে বলুন, আপনি কোথায় জন্মেছেন ?

ইলিয়েনা : পিটার্সবার্গে।

আস্ত্রভ : আর কোথায় লেখাপড়া করেছেন ?

ইলিয়েনা : গানের স্কুলে।

আস্ত্রভ : আমার মনে হয় এটা হয়তো আপনার কেমন একটা ভালো লাগবে না।

ইলিয়েনা : ওঃ, কেন নয়, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে! অবশ্য এটা ঠিক, গ্রাম সম্পর্কে ধারণা আমার খুবই অল্প, কিন্তু আমি পড়েছি অনেক।

আস্ত্রভ : ইভান পেত্রোভিচের ঘরে আমার নিজস্ব একটা টেবিল আছে। যখন খুব ক্লান্ত লাগে, যখন কিচ্ছু ভালো লাগে না, তখন ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে এখানে পালিয়ে আসি। ইভান পেত্রোভিচ আর সোফিয়া আলেকসেন্দ্রোভনা, দুজনে বসে বসে সারা দিনের হিসেবপত্র মেলান, আর আমি ঝিঁঝির চুপচাপ মনের আনন্দে ছবি আঁকি। কিন্তু এ সুখ আমার মাসে একবারও জোটে কি না সন্দেহ। যাগ্‌গে, ছেড়ে দিন ওসব বাজে কথা। [কাগজের দিকে নির্দেশ করে] এই যে ছবিটা দেখছেন, এটা আমাদের প্রদেশের মানচিত্র… মানে পঞ্চাশ বছর আগে ঠিক যেমনটা ছিলো। কালো আর হালকা সবুজের এই ছোপগুলো অরণ্য। সারা প্রদেশের প্রায় অর্ধেকটাই ছিলো অরণ্যে ঢাকা। সবুজের ওপর এই যে লাল লাল ডোরাকাটা দাগগুলো দেখছেন, এখানে এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে সম্বর আর বুনো ছাগল পাওয়া যেতো। এই মানচিত্রে উদ্ভিদ আর প্রাণী, দুটোকেই আমি

পাশাপাশি দেখাবার চেষ্টা করেছি। এই যে নীল ছোপটা দেখছেন, এটা হ্রদ—রাজহাঁস, পাতিহাঁস, আর বুনো হাঁস-দের আস্তানা। আগেকার দিনের লোকেরা বলতো—হেন পাখি নেই যা নাকি এই হ্রদ-অঞ্চলে পাওয়া যেতো না। ওরা যখন দল বেঁধে উড়তো, মেঘের মতো কালো কালো ডানায় আকাশ ছেয়ে যেতো। পাহাড়ের গায়ে, অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে এগুলো ছোট ছোট গ্রাম···দেখেছেন, এক একটা গ্রাম কত দূরে দূরে আর কতখানি জায়গা নিয়ে? এক সময়ে এখানে প্রচুর পরিমাণে ছাগল ভেড়া ঘোড়া পাওয়া যেতো। প্রতিটা পরিবারে গড়ে কম করেও তিনটে করে ঘোড়া থাকতো। এবার নিচের এই ছবিটা দেখুন—পাঁচশ বছর আগেকার মানচিত্র। অর্ধেকের জায়গায় অরণ্য কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে এক-তৃতীয়াংশে। বুনো ছাগল তেমন করে পাওয়া না গেলেও, কিছু কিছু সম্বর তখনও পাওয়া যেতো। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, সবুজ আর নীল ছোপগুলো আস্তে আস্তে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গ্যাছে। এবার সবচেয়ে নিচের মানচিত্রটা দেখুন—আজকালকার দিনে প্রদেশের যা চেহারা। এখানে ওখানে যদিও বা কিছু সবুজের চিহ্ন আছে, কিন্তু একটানা নয়, ছাড়া ছাড়া। সম্বর, রাজহাঁস, বনতিতিররা সব উধাও হয়ে গ্যাছে। স্পষ্টই বুঝতে পারছেন ধীরে ধীরে সব কিছু কি ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং আমার ধারণা আর দু-এক দশকের মধ্যে অরণ্যেরও কোনো চিহ্ন থাকবে না। আপনি হয়তো বলবেন আধুনিক সভ্যতার প্রভাবেই এমনটা ঘটছে—নতুনের জন্যে পুরনোকে স্থান ছেড়ে দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমিও আপনার সঙ্গে একমত হতুম যদি দেখতুম যে বন কেটে রাস্তাঘাট বানানো হচ্ছে, রেললাইন পাতা হচ্ছে, কলকারখানা ইস্কুল লোকালয় গড়ে উঠছে। তাতে আর কিছু না হোক, জন-

সাধারণের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত হতো। কিন্তু না, এখানে তেমন করে নতুন কিছুই ঘটেনি—বদ্ধ জলাভূমি, মশা, দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-শোক ঠিক আগের মতোই রয়েছে। আসলে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আদৌ সচেতন নই… [হঠাৎ ইলিয়েনার মুখের দিকে তাকিয়ে] আপনি কিন্তু আমার কথা একটুও মন দিয়ে শুনছেন না।

ইলিয়েনা : না, মানে…এসব ব্যাপার আমি আবার ঠিক ভালো বুঝতে পারি না।

আস্ত্রভ : এতে বোঝাবুঝির তো কিছু নেই…

ইলিয়েনা : না, আসলে কি জানেন…যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো, এবং তার জন্যে মনে মনে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি। ঠিক বুঝতে পারছি না কি ভাবে শুরু কববো…

আস্ত্রভ : না না, আপনি আমাকে নিঃসংকোচে যা খুশি প্রশ্ন করতে পারেন…

ইলিয়েনা : তাহলে আসুন দুজনে এখানটায় একটু বসি। [দুজনে পাশাপাশি একটা সোফায় বসে] মিছিমিছি আর ভনিতা না করে দুজনে বন্ধুর মতোই খোলাখুলি আলোচনা করি, কি বলেন ?

আস্ত্রভ : [উৎসুক চোখে] নিশ্চয়ই !

ইলিয়েনা : কিন্তু তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে, যা কিছু আমরা আলোচনা করবো সব ভুলে যাবো।

আস্ত্রভ : বেশ, আমি রাজি।

ইলিয়েনা : ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক আমার নিজের নয়, সোনিয়ার। আচ্ছা, আপনি কি ওকে পছন্দ করেন ?

আস্ত্রভ : নিশ্চয়ই, আমি ওকে খুবই শ্রদ্ধা করি।

ইলিয়েনা : না, প্রশ্নটা ঠিক তা নয়, পাত্রী হিসেবে আপনি কি ওকে পছন্দ করেন ?

আস্ত্রভ : [মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভেবে] না।

ইলিয়েনা : আর একটা প্রশ্ন করবো—আপনি কি কিছু লক্ষ্য করেছেন ?

আস্ত্রভ : [বিস্ময়ে] কই, না তো !

ইলিয়েনা : [ডাক্তারের হাতটা আলতো করে তুলে নিয়ে] আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি আপনি ওকে ভালোবাসেন না। কিন্তু...মানে মানে ও আপনাকে সত্যিই ভীষণ ভালোবাসে... বুঝতেই পারছেন, এতে ও কতটা আঘাত পাবে। এখন থেকে এ বাড়িতে আপনার আর আসা উচিত নয়।

আস্ত্রভ : বেশ, আর আসবো না। [উঠে দাঁড়িয়ে] আমি চলি।

ইলিয়েনা : না, শুনুন...আমি হয়তো ঠিক এভাবে বলতে চাইনি, আপনি কিন্তু কিছু মনে করবেন না...

আস্ত্রভ : না না, আমি কিছু মনে করিনি। মাস দুয়েক আগে যদি বলতেন, আমি নিশ্চয়ই ভেবে দেখতুম, কিন্তু এখন...অসম্ভব ! সোনিয়ার আঘাত পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, এবং এটা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, [ইলিয়েনার মুখের দিকে তাকিয়ে] আপনি এভাবে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন কেন ?

ইলিয়েনা : [স্তব্ধ বিস্ময়ে] তার মানে ! কি বলতে চাইছেন আপনি ?

আস্ত্রভ : দোহাই আপনার, এমন অবাক হবেন না। আপনি খুব ভালো করেই জানেন কাজকর্ম সব শিকেয় তুলে কেন আমি রোজ এখানে ছুটে আসি, কেন আমি বনতিতিরের মতো আপনার চারপাশে ঘুরঘুর করি...

ইলিয়েনা : এ আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না !

আস্ত্রভ : [হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করে অভিবাদন জানিয়ে] হ্যাঁ, আমি নত মস্তকেই স্বীকার করছি—এই আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।

ইলিয়েনা : এ আপনি কি বলছেন !

আস্ত্রভ : [বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হেসে] আপনি কিন্তু ভাষণ লাজুক…

ইলিয়েনা : আপনারা যতটা ভাবেন আমি কিন্তু ততটা খারাপ নই মিখাইল লভোভিচ !

[ইলিয়েনা দরজার দিকে এগিয়ে যায়, আস্ত্রভ বাধা দেয়]

আস্ত্রভ : বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, আর কখনও আসবো না। কিন্তু… [ইলিয়েনার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে চারদিকে তাকায়] কোথায় আবার আপনার দেখা পাবো ? কেউ হয়তো এসে পড়বে, তাড়াতাড়ি বলুন, লক্ষ্মীটি…কোথায় আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে ? [উদ্দীপ্ত আবেগে] আঃ, একই অঙ্গে এত রূপ, এত লাবণ্য আমি আর কখনও দেখি-নি ! শুধু তোমার কপালে, তোমার সুগন্ধি চুলে যদি একটা চুমু দিতে পারতুম হেলেনি…

ইলিয়েনা : আপনি বিশ্বাস করুন, আমি শপথ করে বলছি…

আস্ত্রভ : [বাধা দিয়ে] না না, মিছিমিছি শপথ করার কোনো দর-কার নেই…এত সুন্দর তুমি ! এমন মসৃণ তোমার হাতদুটো !

[ইলিয়েনার হাতে চুমু দেয়]

ইলিয়েনা : নাঃ, এ অসম্ভব ! [হাতদুটো সরিয়ে নিয়ে] অনুগ্রহ করে চলে যান। সত্যিই আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে গ্যাছে !

আস্ত্রভ : না না, থেমো না হেলেনি, বলো…দোহাই তোমার, বলো, কাল কোথায় আবার আমাদের দেখা হবে ? [দু হাতে ইলিয়েনার কোমরটা নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে] তুমি বুঝতে পারছো না হেলেনি, তোমাকে না দেখতে পেলে আমি কিছু-তেই…

[ওকে চুমু দেবার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে এক তোড়া গোলাপ নিয়ে প্রবেশ করতে গিয়েও ভোনিৎস্কি দরজার সামনে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউই ওকে লক্ষ্য করে না]

ইলিয়েনা : আঃ, ছাড়ুন…[নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে]

ছাড়ুন···না, ছেড়ে দিন আমাকে···

আস্ত্রভ : কাল ছটোর সময় বাগানবাড়ির সামনে থেকো, ভুলো না কিন্তু···

ইলিয়েনা : ছেড়ে দিন আমায় ! প্রত্যেকেরই সহ্যের একটা সীমা থাকে !

[হঠাৎ দরজার সামনে ভোনিৎস্কিকে দেখে ডাক্তারকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বিহ্বল ভঙ্গিতে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভোনিৎস্কিও স্তম্ভিত। ফুলের তোড়াটা টেবি-লের ওপর রেখে রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের পেছনটা মুছতে মুছতে]

ভোনিৎস্কি : না, মানে···আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। নইলে হঠাৎ এভাবে···

আস্ত্রভ : [বাহাদুরি নেবার ভঙ্গিতে] যাই বলো, আবহাওয়াটা কিন্তু আজ মোটেই খারাপ নয়। ভোরের দিকে আকাশ মেঘলা দেখে ভেবেছিলুম বুঝি বৃষ্টি হবে, কিন্তু এখন দেখছি রীতি-মত রোদ ঝলমল করছে। [মানচিত্রটা গোটাতে গোটাতে] শীতের ফসল এবার খুব ভালোই হবে বলে মনে হচ্ছে। চলি, বিদায়।

[ডাক্তার বেরিয়ে যায়]

ইলিয়েনা : [দ্রুত ভোনিৎস্কির দিকে এগিয়ে এসে] ইভান পেত্রো-ভিচ, আজই আমি আর আমার স্বামী এখান থেকে চলে যেতে চাই।

ভোনিৎস্কি : কি বললে !

ইলিয়েনা : আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করুন যাতে আমাদের এখান থেকে যেতে কোনো অসুবিধে না হয়।

ভোনিৎস্কি : ও, হ্যাঁ···বেশ, ঠিক আছে···

[সেরেবরিয়াকভ, ভেলিয়েঘিন, সোনিয়া এবং মারিনা প্রবেশ করে]

তেলিয়েঘিন : কয়েকদিন ধরে শরীরটা একদম ভালো যাচ্ছে না। কি জানি কি হয়েছে, খালি মাথা ঝিমঝিম করে।

সেরেবরিয়াকভ : কিন্তু আর সব গ্যালো কোথায় ? সত্যি, এটা একটা অদ্ভুত বাড়ি, ঠিক যেন গোলোকধাঁধা। ছাব্বিশটা বড় বড় ঘর, সব সময়েই লোক এঘর ওঘর করছে, কিন্তু কেউ কাউকে খুঁজে পায় না। [মারিনাকে] যাও, মারিয়া ভাসিলিয়েভনা আর ইলিয়েনাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ইলিয়েনা : আমি এখানেই আছি।

সেরেবরিয়াকভ : বোসো, বোসো, সবাই বোসো।

সোনিয়া : [ইলিয়েনার কাছে গিয়ে চাপা স্বরে] ও কি বললো ?

ইলিয়েনা : আমি তোমাকে পরে বলবো।

সোনিয়া : একি, তুমি কাঁপছো কেন ! [মুখের দিকে তাকিয়ে] বুঝতে পেরেছি, ও বলেছে এ বাড়িতে আর কখনও আসবে না···কি তাই তো ?

[বিস্ফারিত চোখে ইলিয়েনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়]

সেরেবরিয়াকভ : [তেলিয়েঘিনকে] মাঝে মধ্যে শরীর খারাপ হওয়া একটা জিনিস। কিন্তু গ্রামের এই জীবনযাত্রার ধরনটাই আমার কেমন যেন ঠিক সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পৃথিবী থেকে আমাকে যেন অন্য একটা অজানা গ্রহে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। এ কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো। সোনিয়া ?

[সোনিয়া ওঁর কথা শুনতেই পেলো না, করুণ প্রতিমূর্তির মতো মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো]

সোনিয়া ? [বিরক্তি] ও আমার কথা শুনতেই পাচ্ছে না ! [মারিনাকে] একি নানি, তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।

[মারিনা ওঁর পাশে বসে একটা মোজা বুনতে লাগলো]

সবাই মন দিয়ে শোনো, আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই।

ভোনিৎস্কি : আশা করি এখানে আমাকে নিশ্চয়ই কোনো দরকার হবে

না। আমি কি যেতে পারি?

সেরেবরিয়াকভ: না, তোমাকে আমার সবচেয়ে বেশি দরকার।

ভোনিৎস্কি: তা আমাকে দরকারটা কি শুনতে পারি কি?

সেরেবরিয়াকভ: কি ব্যাপার, তুমি খুব রেগে রয়েছো বলে মনে হচ্ছে? [বিরতি] শোনো ভানিয়া, আমি যদি তোমাকে সত্যিই কোথাও কোনো আঘাত দিয়ে থাকি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো ভাই।

ভোনিৎস্কি: থাক, ওভাবে কথা বলার কোনো দরকার নেই। কাজের কথায় এসো। তুমি কি চাও শুধু তাই বলো?

[মারিয়া ভাসিলিয়েভনা প্রবেশ করেন]

সেরেবরিয়াকভ: এই তো মা এসে গ্যাছেন। তাহলে এবার শুরু করা যাক, কি বলো? আমি তোমাদের সবাইকে ডেকেছি একটা খবর জানাতে—ইনেসপেক্টর জেনারেল আমাদের এখানে আসছেন। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি সারা জীবন বইয়ের মধ্যেই মুখ গুঁজে কাটিয়েছি, বাস্তব জীবন সম্পর্কে আমার আদৌ কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বিশেষ করে মা, ভানিয়া, ইলিয়া ইলিচ—তোমাদের উপদেশ এবং সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। একেই আমার বয়েস হয়েছে, তার ওপর অসুস্থ—আমার মনে হয় বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে এখনই কিছু একটা স্থির করা উচিত। আমি আমার নিজের জন্যে ভাবছি না—ভাবছি আমার অল্পবয়েসী স্ত্রী আর অবিবাহিত মেয়ের জন্যে। [বিরতি] একটা জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গ্যাছে—গ্রামে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে আমরা ঠিক এই পরিবেশের উপযুক্ত নই। অথচ অন্যদিকে আবার শহরে থাকতে গেলে যত টাকার প্রয়োজন, এখানকার এই বিষয়-সম্পত্তি থেকে যা আয় হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। ধরো আমরা জঙ্গলটা বিক্রি করে দিলুম, তাতে নিশ্চয়ই কিছু টাকা পাওয়া যাবে, কিন্তু তা

তো আর প্রতিবছর সম্ভব নয়। আমাদের এমন একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে, যাতে কম হোক বেশি হোক নির্দিষ্ট একটা আয় থাকে। আমি অবশ্য মনে মনে একটা পরিকল্পনা করেছি এবং বিচার-বিবেচনার জন্যে তোমাদের সামনে উপস্থিত করছি। বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি সংক্ষেপেই বলি—আমাদের সমস্ত সম্পত্তির যা মূল্য, সে তুলনায় আয় গড়ে দু শতাংশের একটুও বেশি নয়। অথচ আমরা যদি সম্পত্তিটা বিক্রি করে সেই টাকা ব্যাঙ্কে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে খাটাই, চার-পাঁচ শতাংশ সুদ পাবো। এবং উদ্বৃত্ত কয়েক হাজার রুবল দিয়ে আমরা ফিনল্যাণ্ডে ছোটখাটো একটা বাড়ি কিনিতে পারবো।

ভোনিৎস্কি : দাঁড়াও দাঁড়াও, শেষের দিকে কি যেন একটা বললে... সম্ভবত আমি খুব একটা ভালো করে মন দিয়ে শুনিনি। সম্পত্তিটা বিক্রি করে আমরা কি যেন করবো বললে?

সেরেবরিয়াকভ : সেই টাকা আমরা কোনো ব্যাঙ্কে রেখে দিতে পারি।

ভোনিৎস্কি : হ্যাঁ, এ পর্যন্ত বেশ ভালোই বুঝতে পারলুম...সম্পত্তিটা বিক্রি করে সেই টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দেওয়া হলো। বাঃ, চমৎকার! কিন্তু আমরা কোথায় যাবো—আমি, আমার মা আর সোনিয়া?

সেরেবরিয়াকভ : পরে আমরা এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই আলোচনা করবো। সব কিছু তো আর একসঙ্গে করা সম্ভব নয়।

ভোনিৎস্কি : নিশ্চয়ই, তা কেমন করে সম্ভব! তাহলে প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। আমি যতটুকু জানি, সম্পত্তিটা সোনিয়ার। আমার দিদির বিয়ের যৌতুকের জন্যেই বাবা ওটা কিনেছিলেন। সুতরাং আইনানুসারে দিদির মৃত্যুর পর ওটা তার মেয়ে সোনিয়ারই প্রাপ্য।

সেরেবরিয়াকভ : নিশ্চয়ই সম্পত্তিটা সোনিয়ার। কেউ তা অস্বীকার করছে না। এবং সোনিয়ার সম্মতি না নিয়ে বিক্রি করার

কোনো প্রশ্নই আসে না। আমার এই প্রস্তাবে সোনিয়াই উপকৃত হবে সব চেয়ে বেশি।

ভোনিৎস্কি : [বিদ্রূপের ভঙ্গিতে] নিশ্চয়ই, উপকৃত হবে বইকি!

মারিয়া : আঃ, জেন, সব সময় আলেক্সির মুখে মুখে এমন তর্ক করিস না! কিসে ভালো হয় না হয় এসব ব্যাপার ও তোর আমার চাইতে ঢের ভালো বোঝে।

ভোনিৎস্কি : [সেই একই বিদ্রূপের ভঙ্গিতে] নিশ্চয়ই, আমি তো একবারও অস্বীকার করিনি।

সেরেবরিয়াকভ : আজ তোমার কি হয়েছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভানিয়া। একটা জিনিস কিন্তু তুমি প্রথম থেকেই ভুল করছো—আমি একবারও বলিনি আমার পরিকল্পনাটা নিখুঁত এবং তোমরা সবাই তা গ্রহণ করো। তোমাদের সবার যদি পরিকল্পনাটা উপযুক্ত মনে না হয়, আমি নিশ্চয়ই জোর করবো না।

ভোনিৎস্কি : কিন্তু সম্পত্তি প্রসঙ্গে যখন কথাই তুললে, তখন তোমার কয়েকটা জিনিস স্পষ্ট করে জানা দরকার···বিশেষ করে যেগুলো তুমি জানো না। বুঝতে কোথাও কোনো অসুবিধে হলে ওয়াফলকে জিগেস কোরো, অন্য কারুর চাইতে ও অনেক ভালো বলতে পারবে, কেননা আমাদের এই সম্পত্তিটা ওর কাকার কাছ থেকেই কেনা।

ভেলিয়েঘিন : হ্যাঁ হুজুর, আমার বৌদির ভাই, কনসতান্তি এরফিমোভিচ লেকেদিমোনভ, হয়তো ওকে আপনি চিনতেও পারবেন, ও যখন···

ভোনিৎস্কি : তুমি এখন একটু চুপ করো ওয়াফল, আগে আমরা কাজের কথাটা সেরে নিই। সম্পত্তিটা আসলে কেনা হয়েছিলো পঁচানব্বুই হাজার রুবলে। কিন্তু বাবা শোধ করতে পেরেছিলেন মাত্র পঁচাত্তর হাজার রুবল, বাকি পঁচিশ হাজার রুবল ধার ছিলো। সেই পঁচিশ হাজার রুবল আমি নিজে

শোধ করেছি। শুধু তাই নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমার নিজের অংশ ছেড়ে না দিলে দিদির এই সম্পত্তিটা কোনোদিনই কেনা সম্ভব হোতো না। তাছাড়া এই জমিতে দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি একটানা গাধার মতো খেটে গেছি…

সেরেবরিয়াকভ : নাঃ, এ সম্পর্কে আমার আলোচনা করতে যাওয়াটাই দেখছি ভুল হয়েছে।

ভোনিৎস্কি : আমি নিজে চেষ্টা না করলে এ সম্পত্তি কোনোদিনই ছড়ানো সম্ভব হোতো না। আজ সেই তুমি কিনা আমাকে দূর করে দিতে চাইছো!

সেরেবরিয়াকভ : আসলে তুমি কি বলতে চাইছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ভোনিৎস্কি : বুঝতে তুমি চাওনি, চাইলে ঠিকই পারতে। এই জমিতে দিনরাত ক্রীতদাসের মতো পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাকে টাকা পাঠিয়েছি। অথচ কোনোদিন একটা ধন্যবাদ পর্যন্তও জানাবার প্রয়োজন বোধ করোনি। দশ বছর আগে যে টাকা পেতুম, আজও বছরে সেই পাঁচশো রুবল পাই। অথচ তোমার একবারও মনে হয়নি এতে এত বড় একটা সম্পত্তি চালানো সম্ভব কি না।

সেরেবরিয়াকভ : কিন্তু আমি তা কেমন করে জানবো? এসব ব্যাপারে আমি আদৌ কিছু বুঝি না। ইচ্ছে করলে তুমি পাঁচশোর সঙ্গে আরও যত খুশি যোগ করে নিতে পারতে।

ভোনিৎস্কি : নিশ্চয়ই, আমার সেইটেই উচিত ছিলো। [বিদ্রূপের ভঙ্গিতে] এখন আমার আফসোস হচ্ছে কেন তখন চুরি করলুম না!

মারিয়া : [তীক্ষ্ণস্বরে] আঃ, জেন!

তেলিয়েগিন : ভানিয়া, লক্ষ্মীটি, শোনো…কি হবে মিছিমিছি নিজেদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করে…

ভোনিৎস্কি : তুমি চুপ করো! [সেরেবরিয়াকভকে] পঁচিশ বছর

আমি এ বাড়ির চার দেওয়ালের মাঝে ছুঁচোর মতো মুখ গুঁজে কাটিয়েছি, আর সবাই মিলে দিনরাত তোমার পাণ্ডিত্যের গুণকীর্তন করেছি। শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছি। সেদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজ আমার চোখ খুলে গ্যাছে। শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে এত দিন যা লিখেছো, সে সম্পর্কে তুমি নিজেই কিছু বোঝো না, আজ তার এক কানাকড়িও মূল্য নেই।

ভেলিয়েঘিন : ভানিয়া, লক্ষ্মীটি, চুপ করো···

সেরেবরিয়াকভ : ওকে চুপ করতে বলো, নইলে কিন্তু আমি চলে যাবো!

ইলিয়েনা : ইভান পেত্রোভিচ, দোহাই আপনার, আমি মিনতি করছি আপনি চুপ করুন।

ভোনিৎস্কি : [সেরেবরিয়াকভের পথ আগলিয়ে] দাঁড়াও, এখনও আমার শেষ হয়নি। আমার জীবন, আমার যৌবনের রঙিন দিনগুলো এ ভাবে নষ্ট করে দেওয়ার জন্যে একমাত্র তুমিই দায়ী। শুনতে পেয়েছো তুমি, তুমিই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু!

ভেলিয়েঘিন : নাঃ, এ আমি আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না··· আমি চলে যাচ্ছি···

[দ্রুত বেরিয়ে যায়]

সেরেবরিয়াকভ : আমাকে এসব বলার কোনো অধিকার তোমার নেই। সম্পত্তিটা যদি তোমার হয়, তুমি নাও। আমার চাই না।

ইলিয়েনা : এই মুহূর্তে আমি এই নরক থেকে মুক্তি পেতে চাই, [আর্তস্বরে] আমার আর ভালো লাগছে না।

ভোনিৎস্কি : আমার স্বাভাবিক জীবন যৌবন, আনন্দ উজ্জ্বলতা তুমি দু পায়ে মাড়িয়ে চলে গ্যাছো···আজ আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না···

[স্পষ্ট করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই মায়ের দরজা দিয়ে ও ছুটে বেরিয়ে যায়]

মারিয়া : [তীক্ষ্ণস্বরে] জেন।

[উনিও ছেলেকে অনুসরণ করেন]

সোনিয়া : [ধাত্রীর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ককিয়ে ওঠে] নানি! নানি!

ইলিয়েনা : [স্বামীকে] মিছিমিছি আর দেরি করে কোনো লাভ নেই। চলো, এই মুহূর্তে আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সেরেবরিয়াকভ : হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। আর যাই হোক, এই ঘটনার পর আর এখানে থাকা চলে না।

সোনিয়া : [ধাত্রীর কোল থেকে মুখ তুলে অশ্রুসজল চোখে] বাপি, বাপিসোনা, তুমি ভানিয়ামামাকে ক্ষমা করো। তুমি জানো না বাপি, ভানিয়ামামা আর আমি এখানে কি ভীষণ অসুখী। রাগ করো না বাপিসোনা, মনে করে ছাখো—তুমি যখন তরুণ ছিলে, দিদিমা আর ভানিয়ামামা সারারাত সারাটা রাত জেগে তোমার জন্যে অনুবাদ করে দিতো, তোমার পাণ্ডুলিপির নকল রাখতো। ভানিয়ামামা আর আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতুম যাতে একটা পয়সাও বাজে খরচা না হয়, যাতে আমরা তোমাকে বেশি বেশি টাকা পাঠাতে পারি। তোমার হয়তো শুনতে খারাপ লাগবে, তবু বিশ্বাস করো—সত্যিই আমরা আমাদের দৈনিক রুটি রোজগার করতুম। ভানিয়ামামার ওপর তুমি মিছিমিছি রাগ করো না বাপি, ওকে তুমি ক্ষমা করো।

ইলিয়েনা : [স্বামীকে] সোনিয়া ঠিকই বলেছে আলেকসেন্দার। আমি কাতর স্বরে মিনতি করছি, যাও, তুমি গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলো, ওঁকে বুঝিয়ে বলো…দোহাই তোমার, ঝগড়াঝাঁটি কিছু করো না।

সেরেবরিয়াকভ : বেশ, তোমরা সবাই যখন বলছো, আমি নিশ্চয়ই

যাবো। কিন্তু একটা জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না—আমার প্রতি ওর এই ব্যবহার খুবই অদ্ভুত। এসবের মাথামুণ্ড আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, তোমরা যখন বলছো···

[মাঝের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়]

ইলিয়েনা : লক্ষ্মীটি, দেখো, যেন আবার মাথা গরম করো না। ভালো করে একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা কোরো···

[ইলিয়েনাও স্বামীকে অনুসরণ করে]

সোনিয়া : নানি! নানি! এখন কি হবে?

মারিনা : [চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে] কিচ্ছু ভেবো না সোনামণি, দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। একি, তুমি এমন কাঁপছো কেন! ঠাণ্ডা লাগেনি তো আবার? দাঁড়াও, তোমাকে আমি বাতাবি লেবুর ফুল দিয়ে এমন সুন্দর করে চা বানিয়ে দেবো···

[মঞ্চের ওপারে তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শোনা যায়, সেই সঙ্গে ইলিয়েনার তীক্ষ্ণ আর্তস্বর। সোনিয়া চমকে ওঠে]

নাঃ, সবকটারই দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে!

সেরেবরিয়াকভ : [আতঙ্কবিহ্বল ভঙ্গিতে ছুটে এসে] ওকে থামাও, থামাও! ও পাগল হয়ে গ্যাছে!

[দরজার সামনে ইলিয়েনা এবং ভোনিৎস্কিকে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করতে দেখা যায়। ইলিয়েনা আপ্রাণ চেষ্টা করে ভোনিৎস্কির হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিতে, কিন্তু পারে না]

ইলিয়েনা : না, রিভলভারটা আমাকে দিন! দিন বলছি! আঃ, ছাড়ুন! না, ওটা আমাকে দিন!

ভোনিৎস্কি : আমাকে ছেড়ে দাও হেলেনি! আমি শুধু একবার দেখতে চাই। [নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ভেতরে প্রবেশ করে

এবং চারদিকে সেরেবরিয়াকভকে খোঁজে] আঃ, এই যে, পেয়েছি তোমাকে ! শয়তান, ভেবেছো তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো ! [গুলি ছোঁড়ে] যাঃ, আবার ফসকে গেলো ! [রিভলভারটা মেঝেয় আছড়ে ফেলে] চুলোয় যাগ্ গে সব !

[দু হাতে মুখ গুঁজে চেয়ারের মধ্যে তলিয়ে যায়। সেরেবরিয়াকভ বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকায়। ইলিয়েনা বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন একটু নড়লেই ও জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে]

ইলিয়েনা : এই মুহূর্তে আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। আমি আর এখানে থাকতে চাই না। আমাকে যদি মেরেও ফেলো তবু আমি এখানে কিছুতেই থাকবো না···কিছুতেই না !

সোনিয়া : নানি ! নানি ! আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

পরদা

তেলিয়েগিনের ঘর, একই সঙ্গে শোবার এবং জমিজমার হিসেব-নিকেশ করার কাজকর্ম চলে। জানলার ধারে কাগজপত্র ঠাসা একটা টেবিল, ছোট একটা বইপত্র রাখার আলমারি। অন্য একটা ছোট টেবিলে আস্ত্রভের পেট-মোটা বড় একটা চামড়ার ব্যাগ, ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম। খাঁচায় একটা ময়না পাখি, দেওয়ালে ঝোলানো আফ্রিকার মানচিত্র। একপাশে চাদর দিয়ে ঢাকা একটা বিছানা। বাঁদিকের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে যাওয়া যায়, ডানদিকের দরজা দিয়ে হল ঘরে। ডান-দিকের দরজার সামনে চওড়া মোটা একটা পাপোশ, যাতে চাষীদের বুটের কাদায় মেঝেটা নষ্ট না হয়। শরতের এক শান্ত সন্ধ্যা। তেলিয়েগিনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে মারিনা উল বুনছে।

তেলিয়েগিন : তাড়াতাড়ি করো মারিনা তিমোফিয়েভনা, ওঁরা হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদায় জানাতে আসবেন।

মারিনা : [তাড়াতাড়ি বোনার চেষ্টা করে] না, আমার খুব একটা বেশি বাকি নেই।

তেলিয়েগিন : না থাকলেই ভালো। কেননা বাইরে গেটের সামনে ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছে।

মারিনা : [অনেকটা স্বগত স্বরে] দূর, তাড়াতাড়ি আর করবোটা কি, দিন দিন চোখের যা অবস্থা হচ্ছে।

[বিরতি]

তেলিয়েগিন : ওঁরা তাহলে সত্যিই চলে যাচ্ছেন?

মারিনা : প্রতিদিন ঝগড়াঝাঁটি, মন কষাকষির চেয়ে এ অনেক ভালো হবে।

তেলিয়েগিন : হ্যাঁ, তা অবশ্য এক দিক থেকে ঠিক।

মারিনা : আমরা সবাই আবার আগের মতো শান্তিতে বাস করতে

পারবো। সকালে চা, দুপুর বারোটায় মধ্যাহ্নভোজ, রাত্তিরে খেতে বসার আগে গল্প-গুজব…সত্যি, কতদিন যে একসঙ্গে গল্প-গুজব করিনি!

তেলিয়েঘিন : জানো মারিনা তিমোফিয়েভনা, তোমাদের এখানে থাকি খাই বলে সবাই আমাকে ঠাট্টা করে। এই তো আজ সকালেই মুদি বলছিলো—অপরের পয়সায় খাও, তোমার লজ্জা করে না! সত্যি, কথাটা শুনে আমার এত খারাপ লাগলো!

মারিনা : [ব্যথাহত চোখে] আহা, বেচারি! তুমি ওদের কথায় কান দাও কেন? ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আমরা কেউ কারুর পয়সায় খাই না। তুমি, সোনিয়া, ভানিয়া—এখানে সবাই সমান, সবাই আমরা গায়ে-গতরে খেটে খাই। কিন্তু সোনিয়া আবার কোথায় গেলো?

তেলিয়েঘিন : বাগানে। ডাক্তারের সঙ্গে ও ভানিয়ার ওপর নজর রাখছে। ওদের ধারণা ভানিয়া নিজের কোনো ক্ষতি করতে পারে।

মারিনা : ওর রিভলভারটা কোথায়?

তেলিয়েঘিন : [নিচু স্বরে] আমি ওটা ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে রেখেছি।

মারিনা : ভালো করেছো।

[বাইরে থেকে ভোনিৎস্কি আর আস্ত্রভ প্রবেশ করে]

ভোনিৎস্কি : না না, তোমরা সবাই যাও এখান থেকে। দোহাই তোমাদের, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

তেলিয়েঘিন : নিশ্চয়ই, আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি ভানিয়া।

[পা টিপে টিপে ও বেরিয়ে যায়]

ভোনিৎস্কি : মারিনা!

মারিনা : যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি।

[উল বোনার সাজ-সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিয়ে ও-ও ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। মারিনা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ভোনিৎস্কি অপেক্ষা করে]

তোনিংস্কি : তুমি আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সোজা বিদেয় হও এখান থেকে।

আত্রভ : স্বচ্ছন্দে। অনেক আগেই আমার চলে যাওয়া উচিত,ছিলো, কিন্তু যেতে পারছি না যতক্ষণ না তুমি আমার জিনিসটা ফেরত দিচ্ছো।

তোনিংস্কি : কোন্ জিনিস?

আত্রভ : সে তুমি খুব ভালো করেই জানো।

তোনিংস্কি : আমি তোমার কাছ থেকে কিছু নিইনি।

আত্রভ : ভাখো, মিছিমিছি সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। আমি ভালোভাবেই বলছি, আমার জিনিসটা ফিরিয়ে দাও।

তোনিংস্কি : [একটা চেয়ারে বসে] বললুম তো, আমি তোমার কাছ থেকে কিছু নিইনি।

আত্রভ : নাওনি?

তোনিংস্কি : না।

আত্রভ : বেশ, যতক্ষণ না 'জিনিসটা ফেরত পাচ্ছি, আমি কিন্তু এখান থেকে এক পাও নড়বো না। [বসে] তারপর তোমার সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজবো।

তোনিংস্কি : সে তোমার যা খুশি।

[কয়েক মুহূর্তের জন্যে এক টুকরো নিটোল নিস্তব্ধতা]

আত্রভ : আচ্ছা ভানিয়া, কেন তুমি মিছিমিছি এমন ছেলেমানুষি করছো বলো তো?

তোনিংস্কি : [বিষণ্ণ ম্লান স্বরে] আমার যে কি ভীষণ খারাপ লাগছে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না আত্রভ। শালা দু-দুবার গুলি ছুঁড়লুম, দুবারই ফসকে গেলো। এখন আমার নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে।

আত্রভ : কাউকে খুন করার যখন এতই শখ, তখন বনে-জঙ্গলে কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা করলেই তো পারো।

তোনিংস্কি : সত্যি, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত লাগছে! আমি

কাউকে খুন করার চেষ্টা করলুম, অথচ কেউ আমাকে গ্রেফতার করলো না, কেউ আমার কাছে কোনো কৈফিয়ৎ চাইলো না।...তার মানে, সবাই ধরে নিয়েছে আমি পাগল হয়ে গেছি। [করুণ অথচ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হেসে] অথচ যে লোকটা এতদিন বিরাট একটা প্রতিভার ভান করে এলো, পরগাছার মতো রক্ত শোষণ করে সবাইকে উত্যক্ত করলো, সে পাগল হলো না। এত রূপ যৌবন সত্বেও যে মেয়েটা একটা পঙ্গু বুড়োকে বিয়ে করলো, তারা কেউ পাগল হলো না...আর আমিই হয়ে গেলুম পাগল !

আস্ত্রভ : পাগল তুমি নও, তুমি একটা মাথামোটা ! আমার আগে ধারণা ছিলো প্রতিটা মাথামোটা মানুষ মানেই কোনো কোনো দিক থেকে অস্বাভাবিক। কিন্তু এখন দেখছি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষও মাথামোটা হতে পারে।

ভোনিৎস্কি : বাজে বোকো না ! আমার বুকের মধ্যে যে কি হচ্ছে সে আমিই জানি। লজ্জায় অপমানে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। যন্ত্রণা হলে তবু না হয় সহ্য করতুম। এখন যে আমি কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আস্ত্রভ : কিছু করতে হবে না, দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভোনিৎস্কি : তুমি বুঝতে পারছো না আস্ত্রভ। এখন আমার বয়েস সাতচল্লিশ, যদি ষাট বছর বয়েস পর্যন্তও বাঁচি—এই তেরটা বছর নিয়ে আমি কি করবো বলতে পারো ? বলতে পারো আমার জীবনের শেষ দিনগুলো কেমন করে কাটবে—যদি না আমার অতীতকে ভুলতে পারি, যদি না আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারি ?

আস্ত্রভ : কেমন করে বলবো বলো ? তোমার আমার জীবন প্রায় একই। চারদিক জুড়ে এই নিঃসীম হতাশার মধ্যে নতুন করে বাঁচার আর কিছু নেই। আমরা কবরে যাবার পর একশো কি দুশো বছর পরে যারা আসবে তারা হয়তো খুঁজে

পাবে সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার পথ।

ভোনিৎস্কি : বেশ, তাই যদি হয়, তা হলে আমাকে এমন একটা কিছু দাও…

আস্ত্রভ : এবার কিন্তু তুমি সত্যিই পাগলামি করছো ভানিয়া। সারা প্রদেশে কেবল মাত্র দুজন মানুষই ছিলো সবচেয়ে সৎ, সবচেয়ে সংস্কৃতিবান—সে শুধু তুমি আর আমি। কিন্তু দশ বছরের এই বিশ্রী একঘেয়ে জীবনই আমাদের কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। আজ তুমি আমি আমরা দুজনেই অন্য কারুর চেয়ে কোনো অংশে ভালো নই। [চকিতে উদ্দীপ্ত হয়ে] কিন্তু এসব বলে আর কি লাভ, তুমি বরং জিনিসটা ফিরিয়ে দাও।

ভোনিৎস্কি : বললুম তো কিছু নিইনি।

আস্ত্রভ : নিয়েছো। আমার ওষুধের ব্যাগ থেকে এক শিশি মরফিয়া নিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো। বার করে দাও বলছি। [ভোনিৎস্কিকে নিশ্চুপ দেখে] ছাখো, যদি আত্মহত্যা করার এতই ইচ্ছে থাকে, যাও, বনের মধ্যে গিয়ে নিজের রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করগে। দয়া করে আমার মরফিয়াটা ফিরিয়ে দাও, নইলে সবাই সন্দেহ করবে। লোকে ভাববে আমিই বুঝি তোমাকে…

ভোনিৎস্কি : লোকে জানবে কি করে? আমি কি তাদের কানে কানে বলতে যাচ্ছি নাকি?

আস্ত্রভ : তুমি বলতে যাবে কেন, পোস্ট-মর্টম করলেই সবাই জানতে পারবে। না, এখনো ভালো কথা বলছি, তুমি ওটা ফিরিয়ে দাও। [হঠাৎ সোনিয়াকে প্রবেশ করতে দেখে] সোনিয়া, তোমার ভানিয়ামামা আমার ওষুধের ব্যাগ থেকে এক শিশি মরফিয়া চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে, কিছুতেই ফিরিয়ে দিচ্ছে না। তুমি ওকে বলো তো…একেই আমার ভীষণ দেরি হয়ে গ্যাছে, তার ওপর এভাবে যদি আটকে রাখে…

সোনিয়া: ভানিয়ামামা, সত্যিই তুমি ওঁর মরফিয়ার শিশিটা নিয়েছো?
[নিশ্চুপ]

আস্ত্রভ: হ্যাঁ, আমি জানি ও নিয়েছে।

সোনিয়া: ছিঃ, ভানিয়ামামা! তুমি ওটা ফিরিয়ে দাও। [মিনতির মতো করুণ স্বরে] কেন তুমি আমাদের এমন মিছিমিছি ভয় পাইয়ে দিচ্ছো বলো তো? আমি তো তোমারই মতো অসুখী ভানিয়ামামা, কিন্তু কই, আমি তো তোমার মতো এমন হতাশায় ভেঙে পড়িনি। তুমি যা করতে যাচ্ছো, আমি কোনোদিনই তা করতাম না। সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্ট আমি জীবনের শেষ পর্যন্ত একা বহন করতাম। আর ছোট হয়েও আমি যা করতে পারি, বড় হয়ে তুমি কেন তা করতে পারবে না ভানিয়ামামা? [ভোনিৎস্কির হাতে চুমু দিয়ে] লক্ষ্মী ভানিয়ামামা, আমি বলছি তুমি ওটা ডাক্তারবাবুকে ফিরিয়ে দাও।

[একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে ভোনিৎস্কি চাবি দিয়ে দেরাজ খুলে একটা ছোট শিশি আস্ত্রভের হাতে দেয়]

ভোনিৎস্কি: এই নাও। [সোনিয়াকে] কিন্তু আমাদের কিছু একটা করা উচিত। কাজকর্মের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে না পারলে, ভুলে থাকা অসম্ভব···

সোনিয়া: নিশ্চয়ই, তুমি ঠিক বলেছো ভানিয়ামামা। ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আবার কাজ শুরু করে দেবো। [টেবিলের ওপর কাগজপত্রগুলো উলটিয়ে] দেখেছো, কত কাজ জমে গ্যাছে।

আস্ত্রভ: [শিশিটা ব্যাগের মধ্যে ভরে] তাহলে এবার আমি যেতে পারি।

[ইলিয়েনা প্রবেশ করে]

ইলিয়েনা: ইভান পেত্রোভিচ, আমরা চলে যাচ্ছি। আলেকসান্দার আপনাকে একবার ডাকছে, কি যেন বলবে।

সোনিয়া : যাও ভানিয়ামামা, [হাত দুটো ধরে] বাপির সঙ্গে দেখা করে এসো। না, চলো, আমিও যাবো।

[সোনিয়া আর ভোনিংস্কি বেরিয়ে যায়]

ইলিয়েনা : [হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে] আমরা চলে যাচ্ছি মিখাইল লভোভিচ।

আস্ত্রভ : এখুনি ?

ইলিয়েনা : হাঁা, বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

আস্ত্রভ : তাহলে বিদায়।

ইলিয়েনা : আপনি কিন্তু আজ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এখান থেকে···

আস্ত্রভ : আমি ভুলিনি হেলেনি। এই তো এখুনি চলে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু আর কয়েকটা দিন থেকে গেলে পারতে ?

ইলিয়েনা : না, তা হয় না···সব ঠিক হয়ে গ্যাছে।

আস্ত্রভ : তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে কাল দুটোর সময় বাগানবাড়ির সামনে থাকবে।

ইলিয়েনা : কি করবো, যাওয়ার ব্যবস্থা যে হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গ্যালো।

আস্ত্রভ : বেশ, তাহলে যাও। কিন্তু যেখানেই যাও না কেন—এখানকার এই সবুজ শ্যামলী মাঠ, পাহাড়, অরণ্য, অর্ধেক ভেঙে পড়া বাড়ি···সব মিলিয়ে তুর্গেনিভের আঁকা একটা ছবি সব সময়েই তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তখন আমাদের কথা তোমার মনে পড়বে···

ইলিয়েনা : নাঃ, আপনি সত্যিই ভারি অদ্ভুত মানুষ! তখন আপনার ওপর রাগ করলেও···এখন যখন চলেই যাচ্ছি, যখন আমাদের দুজনের আর কখনও দেখা হবে না, তখন আমার স্বীকার করতে কোনো আপত্তি নেই···সত্যি, আপনি আমার সমস্ত ভাবনাকে বানের স্রোতে ছোট্ট একটা কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন···

আস্ত্রভ : হেলেনি!

ইলিয়েনা : বলুন, আমাকে কখনও ভুলবেন না?

আস্ত্রভ : না, হেলেনি !

ইলিয়েনা : আজ আপনি আমাকে বন্ধুর মতো বিদায় দিন মিখাইল লভোভিচ।

আস্ত্রভ : [কি যেন ভেবে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে] হ্যাঁ, হেলেনি, তোমার বরং এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। তুমি যত সরল, যত সুন্দরই দেখতে হও না কেন, তোমার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত চারিত্রিক দৃঢ়তা আছে, যা আমি আজও চিনতে পারিনি, হয়তো কোনোদিনও চিনতে পারবো না। ঠাট্টা করে হলেও, একটা জিনিস আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছি, যে বা যারাই তোমার সান্নিধ্যে এসেছে বা আসবে, মুখর আলস্যে তারা তোমার চারপাশে কেবল ঘুরাঘুরি করতেই থাকবে। সম্পূর্ণ করে তারা তোমাকে কখনও পাবে না, অথচ তোমার এই উষ্ণ সান্নিধ্যের বৃত্ত থেকে কোনোদিন বেরিয়ে আসতেও পারবে না। এই আমার কথাই ধরো না কেন—সমস্ত কাজকর্ম ফেলে গত এক মাস আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তোমার চারপাশে ঘুরঘুর করেছি। রুগীর কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, এই এক মাসে চাষীরা গাছের পর গাছ কেটে আমার অরণ্য ফাঁকা করে দিয়েছে, গরু ছাগল ভেড়ায় আমার নিজে হাতে লাগানো চারা গাছ মুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। তুমি যতদিন এখানে থাকবে ক্ষতির পরিমাণ কেবল ততই বাড়তে থাকবে। তোমার বরং এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো সোনামণি !

ইলিয়েনা : [টেবিল থেকে আস্ত্রভের একটা তুলি তুলে নিয়ে ত্রস্ত পকেটে পোরে] এটা আমি স্মৃতিচিহ্নের জন্যে রেখে দিচ্ছি মিখাইল লভোভিচ।

আস্ত্রভ : সত্যিই তুমি অদ্ভুত হেলেনি ! এখানে আমরা পরস্পরে কত চেনা, আবার একই সঙ্গে কত না অচেনা ! এই মুহূর্তে তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছো, অথচ পরমুহূর্তেই তোমার

সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না। [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] পৃথিবীর নিয়মই এই! কেউ এসে পড়ার আগে আমাকে একটা চুমু দাও না লক্ষ্মীটি…[ওর চিবুকে, কপালে চুমু দিয়ে] আঃ, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে! তাহলে বিদায় সোনা-মণি।

ইলিয়েনা : কামনা করি প্রতিটা মুহূর্ত তোমার নিঃসীম সুখের হোক। [চকিতে চারদিকে তাকিয়ে] না, দাঁড়াও…জীবনের এই মুহূর্তটা আমার স্মরণীয় হয়ে থাক! [আস্ত্রভের গলাটা দু হাতে মালার মতো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয়] এবার তুমি আমাকে বিদায় দাও সোনামণি!

[হঠাৎ বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা যায়। দুজনেই নিবিড় আলিঙ্গন থেকে ছিটকে সরে আসে]

ইলিয়েনা : আমি চলি।

আস্ত্রভ : বিদায় সোনামণি।

[সেরেব্রিয়াকভ, ভোনিৎস্কি, বই হাতে মারিয়া ভাসিলিয়েভনা, তেলিয়েঘিন এবং সোনিয়া প্রবেশ করে]

সেরেবরিয়াকভ : এই বিদায়-মুহূর্তে আমি সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বিশেষ করে ভানিয়া, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো ভাই। বিদায়।

[সেরেবরিয়াকভ এবং ভোনিৎস্কি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তিনবার চুম্বন করে]

ভোনিৎস্কি : কিছু ভেবো না, আগে যে টাকা পেতে সেই পরিমাণ টাকাই তুমি নিয়মিত পেয়ে যাবে।

[ইলেয়েনা এবং সোনিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করে]

সেরেবরিয়াকভ : [মারিয়ার হাত চুম্বন করে] চলি মা, বিদায়।

মারিয়া : [চুমু দিয়ে] তোমার ছবিটা কিন্তু পাঠাতে ভুলো না আলেকসেন্দার।

সেরেবরিয়াকভ : ভুলবো না মা, দেখবেন, ঠিক পাঠিয়ে দেবো।

তেলিয়েঘিন : আপনি কিন্তু আমাদের কথা ভুলবেন না হুজুর। বিদায়।

সেরেবরিয়াকভ : [সোনিয়াকে চুমু দিয়ে] বিদায়। [আস্ত্রভের সঙ্গে করমর্দন করে] আপনার সাহচর্যে সত্যিই আমরা খুব আনন্দ লাভ করেছি মিখাইল লভোভিচ। মানুষের প্রতি আপনার মনোভাব, স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনার জন্যে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বিদায়বেলায় এই বৃদ্ধের একটা অনুরোধ, সত্যি-কারের একটা কিছু করার চেষ্টা করুন,...মানে, এমন একটা কিছু যাতে লোকে চিরদিন আপনাকে স্মরণ করে। [সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে] সবায়ের শুভ কামনা করি। বিদায়।

[সেরেবরিয়াকভ বেরিয়ে যায়, সঙ্গে সোনিয়া আর মারিয়া ভাসিলিয়েভনা।]

ভোনিৎস্কি : [ইলিয়েনার হাতে উষ্ণ চুম্বন দিয়ে] হয়তো আমাদের আর কখনও দেখা হবে না, তবু আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো ...বিদায় সোনামণি।

ইলিয়েনা : [দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে] বিদায়, ইভান পেত্রোভিচ।

[ভোনিৎস্কির মাথায় চুমু দিয়ে বেরিয়ে যায়]

আস্ত্রভ : [তেলিয়েঘিনকে] ওয়াফল, ওদের কাউকে বলো না ভাই, আমার ঘোড়াটা একটু নিয়ে আসবে।

তেলিয়েঘিন : নিশ্চয়ই, আমি একখুনি যাচ্ছি।

[তেলিয়েঘিন বেরিয়ে যাবার পরেও আস্ত্রভ এবং ভোনিৎস্কি খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আস্ত্রভ তার টেবিল থেকে আঁকার সাজ-সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিয়ে তার ব্যাগে ভরে]

আস্ত্রভ : ঠুঁটো জগন্নাথের মতো এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বাইরে গিয়ে ওদের তো গাড়িতে তুলে দিতে পারো?

ভোনিৎস্কি : ওরা যা খুশি করুকগে, ওদের নিয়ে আমার কোনো মাথা-ব্যথা নেই। [টেবিলের কাগজপত্র হাঁটকাতে হাঁটকাতে]

আমাকে আমার কাজ করতে হবে।

[বাইরে অস্পষ্ট ঘোড়ার গলার ঘন্টাধ্বনি আর শক্ত মেঝেতে পা ঠোকার শব্দ শোনা যায়]

আস্ত্রভ : ওরা তাহলে সত্যিই চলে যাচ্ছে ! যাক, ভালোই হলো··· অধ্যাপক খুব খুশি হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। আর যা-ই হোক, বুড়ো ঘোড়াছুটো ওকে আর এখানে ফিরিয়ে আনবে না।

মারিনা : [প্রবেশ করে] ওরা চলে গ্যাছে।

[চেয়ারে বসে হাতের মোজাটা আবার বুনতে শুরু করে। সোনিয়া চোখ মুছতে মুছতে প্রবেশ করে]

সোনিয়া : ওরা চলে গ্যাছে। এসো ভানিয়ামামা, এবার আমাদের কাজ শুরু করা যাক।

ভোনিৎস্কি : [সউৎসাহে] হ্যাঁ, নিশ্চয়ই···

সোনিয়া : অনেকদিন আমরা দুজনে একসঙ্গে এই টেবিলটায় বসে কাজ করিনি। [বাতিটা জ্বালিয়ে টেবিলের ওপর রাখে] দেখেছো, দোয়াতে এক ফোঁটা কালি নেই, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গ্যাছে···[দোয়াতটা নিয়ে গিয়ে র‍্যাকের বোতল থেকে কালি ঢেলে নিয়ে আসে] ওরা চলে যাওয়াতে মনটা কিন্তু আমার সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গ্যাছে।

মারিয়া ভাসলিয়েভনা বই হাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন]

মারিয়া : ওরা যে সত্যিই চলে যাবে আমি যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। এখন ভালোয় ভালোয় পৌঁছতে পারলে হয়।

[একটা আরাম-কুর্শিতে ঘাড় গুঁজে বসে বই পড়তে শুরু করেন। সোনিয়া টেবিলে বসে হিসেবের খাতাপত্র ওলটাতে শুরু করে]

সোনিয়া : শোনো ভানিয়ামামা, প্রথমে আমাদের কাছে কে কি পাবে তার একটা হিসেব করতে হবে। রোজ রোজ পাওনাদাররা

এসে ফিরে যাবে এ আমার ভালো লাগে না। [কিছু কাগজ-পত্র ভোনিৎস্কির দিকে ঠেলে দিয়ে] তুমি এগুলো ছাখো… আমাদের কার কাছে কি পাওনা আছে আমি বরং তার একটা হিসেব করে ফেলি…

ভোনিৎস্কি : দাও। কিন্তু এগুলো ভালো করে বিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

সোনিয়া : তা তো বটেই। কিন্তু তার আগে দেনা-পাওনা একটা হিসেব করতে হবে, অনেকদিন কিচ্ছু দেখা হয়নি।

ভোনিৎস্কি : সেই ভালো।

[দুজনেই অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে কাজ করে যায়]

আস্ত্রভ : এই যে নৈঃশব্দ্য, বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক, সারা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে পড়া উষ্ণ আরাম· ·এ সব কিছু ছেড়ে বাইরে বেরুতে আমার আর একদম ইচ্ছে করছে না।

[এমন সময় ঘোড়ার গলার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়]

কিন্তু কোনো উপায় নেই, ঘোড়া প্রস্তুত…

মারিনা : এত তাড়াহুড়ো করার কি আছে, আর খানিকক্ষণ না হয় থেকেই গ্যালে।

আস্ত্রভ : না, থাক…যেতে যখন হবেই…

[একজন শ্রমিক প্রবেশ করে]

শ্রমিক : মিখাইল লভোভিচ, আপনার ঘোড়া নিয়ে এসেছি।

আস্ত্রভ : হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি… না, শোনো…আমার এই ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে যাও। [ব্যাগটা ওর হাতে দেয়] সাবধানে নিয়ে যেও, দেখো, যেন আবার কাত না হয়ে যায়।

শ্রমিক : আচ্ছা।

[ও বেরিয়ে যায়]

আস্ত্রভ : তাহলে আজ চলি।

সোনিয়া : আবার কবে আসবেন ?

আস্ত্রভ : আগামী গ্রীষ্মের আগে হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে না, শীতও হয়ে যেতে পারে। অবশ্য তার মধ্যে কারুর যদি কিছু হয় আমাকে নিশ্চয়ই খবর পাঠিও। [সবার সঙ্গে করমর্দন করে] আন্তরিক আতিথেয়তার জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ। [বৃদ্ধা ধাত্রীর মাথায় চুমু দিয়ে] চলি, নানি।

মারিনা : না না, তা হয় না···এতটা পথ যাবে, চা না খাইয়ে তোমাকে ছাড়ছি না।

আস্ত্রভ : অনেক দেরি হয়ে যাবে নানি। তাছাড়া এখন এসব ঝামেলা করার কোনো দরকার নেই।

মারিনা : তাহলে দাঁড়াও, আমি তোমার জন্যে একটু ভদকা নিয়ে আসি।

আস্ত্রভ : সেই ভালো।

[মারিনা বেরিয়ে যায়]

আস্ত্রভ : [একটু নিস্তব্ধতার পর] কি হয়েছে কি জানি, আমার ঘোড়াটা আবার একটু খুঁড়িয়ে চলছে। কাল পেত্রোসকা ওকে যখন জল খাওয়াতে নিয়ে যায়, তখনই আমার প্রথম নজরে পড়ে।

তেলিগিন : নালগুলো পালটে দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গ্যাছে।

আস্ত্রভ : তাই নাকি! তাহলে তো কালই একবার কামারশালায় যেতে হবে।

[একটা ট্রেতে এক গেলাস ভদকা আর কয়েক টুকরো রুটি নিয়ে প্রবেশ করে]

মারিনা : নাও, এটুকু খেয়ে ফ্যালো।

আস্ত্রভ : অসংখ্য ধন্যবাদ নানি।

[আস্ত্রভ গেলাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দেয়]

মারিনা : রুটিটুকু খেয়ে নিলে না কেন?

আস্ত্রভ : এখন আমার আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না···ভদকাই ভালো। তাহলে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই···না

না, থাক নানি, তোমাকে এখন আর কষ্ট করে বাইরে যেতে হবে না, আমি একাই চলে যেতে পারবো।

[আস্ত্রভ বেরিয়ে যায়। সোনিয়া টেবিল থেকে একটা বাতি তুলে নিয়ে আস্ত্রভকে এগিয়ে দিতে যায়। মারিনা আবার তার আসনে বসে বোনায় মন দেয়]

ভোনিৎস্কি : [লিখতে লিখতে আপন মনে] দোসরা ফেব্রুয়ারী, কুড়ি পাউণ্ড তিসির তেল…ছয়ুই ফেব্রুয়ারী, আবার কুড়ি পাউণ্ড তিসির তেল…গম…

[ঘোড়ার গলার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়]

সোনিয়া : [প্রবেশ করে] চলে গ্যাছেন।

[বাতিটা আবার টেবিলের ওপর বসিয়ে দেয়]

ভোনিৎস্কি : [আপন মনেই] তাহলে মোট…পনেরো আর পঁচিশ, চল্লিশ…

মারিনা : [হাই তুলতে তুলতে] ঈশ্বর, তুমি আমাদের ক্ষমা করো…

[তেলিয়েগিন পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দরজার সামনের একটা চেয়ারে বসে। তারপর নিঃশব্দে তার গিটারে মৃদু সুর তোলে]

ভোনিৎস্কি : [হঠাৎ টেবিলের কাগজপত্র সব ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রীতিমতো হতাশ ভঙ্গিতে সোনিয়াকে] দূর, কাজকর্ম আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না…কি-চ্ছু না! বুকের মধ্যে আমার কি যে হচ্ছে কাউকে বোঝাতে পারবো না।

সোনিয়া : আমি জানি ভানিয়ামামা। কিন্তু কি করবে বলো, এমনি ভাবেই আমাদের বাঁচতে হবে। এমনি ভাবেই আমাদের একঘেয়ে দিনগুলো কেটে যাবে। বুড়ো হয়ে না মরা পর্যন্ত বিশ্রাম আমাদের কপালে কোনো দিনও জুটবে না। কিন্তু তার জন্যে দুঃখু করে কোনো লাভ নেই ভানিয়ামামা। তবু নিজেদের দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে যদি কাজ করে যেতে পারি, অন্তত মরার পরে কবরে গিয়েও বলতে পারবো—

আমরা আজীবন সংগ্রাম করেছি, কেঁদেছি, তিক্ত জীবনযাপন করেছি ; ঈশ্বর, এবার তুমি আমাদের কৃপা করো। আমি বিশ্বাস করি ভানিয়ামামা…সুন্দর, উজ্জ্বল জীবন কি, ভালো-বাসা কাকে বলে, তখন আমরা নিশ্চয় জানতে পারবো। তুমি কি ভাবো আমি জানি না ভানিয়ামামা, কিন্তু আমি সত্যিই তাই ভাবি। আমি আন্তরিক ভাবেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি…[এখন সারা মঞ্চ জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে তেলিয়েঘিনের গিটারের আশ্চর্য করুণ একটা সুরমূর্ছনা। সোনিয়া ধীরে ধীরে ভোনিংস্কির সামনে এসে হাঁটু মুড়ে বসে ওর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ক্লান্ত ম্লান স্বরে] সেদিন সত্যি-কারের শান্তি কি জিনিস আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। সেদিন আমরা শুনতে পাবো দেবদূতের আশ্চর্য মিষ্টি কণ্ঠস্বর, দেখবো চুনীপান্নার মতো সারা আকাশ তারায় তারায় ছেয়ে আছে, আর পৃথিবীর যা কিছু দুঃখ-কষ্ট, অশুভ মুছে গিয়ে আমাদের জীবন হয়ে উঠেছে শান্ত আর নিঃসীম সুখের। আমি বিশ্বাস করি ভানিয়ামামা, আমি সত্যিই তা বিশ্বাস করি…[চাকতে অশ্রুসজল চোখে] একি ভানিয়ামামা, তুমি কাঁদছো ! [উঠে আদর করে ভোনিংস্কির মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে] ছিঃ, কাঁদে না, লক্ষ্মীটি !

[এমন সময় দূরে রাতপ্রহরীর লাঠির ঠক ঠক শব্দ শোনা যায়]

তোমার আমার দুঃখ তো একই ভানিয়ামামা ! কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে ছাখো। কই, আমি কাঁদছি…বলো, আমি কাঁদছি ? আমাদের জীবন একদিন ঠিকই সুখের হবে ভানিয়ামামা, তুমি দেখো !

[ধীরে পরদা নেমে আসে]

প্রস্তাব

যাদের নিয়ে নাটক

স্তেপান স্তেপানভিচ চুবুকভ, জমিদার।

নাতালিয়া স্তেপানভ্না (নাতাশা), জমিদারের মেয়ে, বয়েস পঁচিশ।

ইভান ভাসিলিয়েভিচ লোমভ, চুবুকভের প্রতিবেশী এবং জমিদার। ভারি চমৎকার দেখতে, বেশ সুন্দর বেশভূষা, কিন্তু স্নায়বিক রোগগ্রস্ত।

চুবুকভের বৈঠকখানা। বেশ সুন্দর সাজ্য পোশাক, হাতে সাদা দস্তানা পরে লোমভ প্রবেশ করে।

চুবুকভ : [উঠে লোমভের দিকে এগিয়ে গিয়ে] আরে ইভান ভাসিলিয়েভিচ যে! কি ব্যাপার, এসো এসো! [করমর্দন করে] এভাবে হঠাৎ এসে পড়ায় সত্যিই খুব খুশি হলাম। তারপর, কেমন আছো?

লোমভ : ধন্যবাদ। বেশ ভালোই আছি। আপনি কেমন আছেন?

চুবুকভ : ওই চলে যাচ্ছে মোটামুটি। একি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো। যাই বলো, পুরনো প্রতিবেশীকে কিন্তু তোমার এভাবে ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু কি ব্যাপার, একেবারে ধড়াচূড়ো পরে·· কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো নাকি?

লোমভ : আজ্ঞে না, আমি শুধু আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি স্তেপান স্তেপানভিচ।

চুবুকভ : তাই নাকি! আমি ভাবলাম তুমি বুঝি সেজেগুজে কাউকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে বেরিয়েছো।

লোমভ : না, মানে···ব্যাপারটা হচ্ছে···আমি আপনার কাছে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষে করতে এসেছি স্তেপান স্তেপানভিচ···অবশ্য আপনি যদি আমার ওপর নিতান্ত বিরক্ত না হন। এর আগেও বহুবার সাহস করে আমি আপনার কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষে করেছি, এবং সত্যি বলতে কি, আপনি সব সময়েই·· না, মাফ করবেন, আমার সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যদি কিছু মনে না করেন, আমি এক গেলাস জল খাবো স্তেপান স্তেপানভিচ।

চুবুকভ : [সচকিত হয়ে] হ্যাঁ, নিশ্চয়ই···[এক গেলাস জল এগিয়ে দিয়ে] এই যে।

লোমভ : ধন্যবাদ।

[গেলাসটা নিয়ে চক চক করে পান করে]

চুবুকভ : [নেপথ্যে] ব্যাটা নিশ্চয় টাকা ধার চাইতে এসেছে! তুমি যতই ভনিতা করো বাছাধন, আমি তোমাকে এক পয়সাও ঠেকাচ্ছি না।

লোমভ : [গেলাসটা নামিয়ে রেখে] আঃ!

চুবুকভ : তারপর, কি যেন বলছিলে ভায়া?

লোমভ : হাঁা, বলছিলাম স্তেপানভিচ…না, মানে স্তেপান স্তেপানভিচ… আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার স্নায়ু ভীষণ দুর্বল, সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়…হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমায় সাহায্য করতে পারেন। অবশ্য আজ পর্যন্ত আমি আপনার জন্যে এমন কিছুই করতে পারিনি যে এ-সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি, এবং আদৌ আমার সে অধিকার নেই…

চুবুকভ : অত ধানাইপানাই না করে তুমি বরং স্পষ্টই বলে ফ্যালো।

লোমভ : হাঁা হাঁা, নিশ্চয়, আমি স্পষ্টই বলবো। আসলে আপনাকে যে কথাটা বলবো বলে এসেছি, তা হলো আপনার মেয়ে নাতালিয়া স্তেপানভনাকে বিয়ে করতে চাই।

চুবুকভ : [সউল্লাসে] কি বললে ইভান ভাসিলিয়েভিচ! বলো বলো, আর একবার বলো! আমি ঠিক ভালো ভাবে শুনতে পাইনি।

লোমভ : না, মানে…আপনি যদি অনুগ্রহ করে…

চুবুকভ : [বাধা দিয়ে] আঃ, আমি সত্যিই কি যে খুশি হয়েছি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না ইভান ভাসিলিয়েভিচ! নিশ্চয়ই…[আনন্দের আতিশয্যে লোমভকে প্রায় জড়িয়ে ধরে] ঠিক এই জিনিসটাই আমি বহুকাল ধরে মনে মনে আশা করেছিলাম। এ আমার দীর্ঘদিনের বাসনা। [চিবুক বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে] ছেলেবেলা থেকেই

আমি তোমাকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ করে এসেছি। ঈশ্বর তোমাদের জীবন সুখের করুন সত্যি, আজ আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে…কিন্তু আমি বোকার মতো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি কেন? আসলে আমি আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছি, যাকে বলে হতবাক। দাঁড়াও, আমি নাতাশাকে ডেকে নিয়ে…

লোমভ: [এগিয়ে গিয়ে] আচ্ছা স্তেপান স্তেপানভিচ, আপনার কি মনে হয় নাতালিয়া সম্মতি দেবে?

চুবুকভ: দেবে না আবার? কার্তিকের মতো তোমার এমন সুন্দর চেহারা! আমি তো বাজি ধরে বলতে পারি ও তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

[চুবুকভ বেরিয়ে যান]

লোমভ: আমার কেমন যেন শীত শীত করছে…সারা শরীর কাঁপছে, যেন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। আসল কথা হলো…মানসিক প্রস্তুতির দরকার। দীর্ঘদিন ধরে তুমি যদি কেবল ভাবতেই থাকো, ইতস্তত করো, আর আদর্শ কোনো তরুণী কিংবা সত্যিকারের খাঁটি প্রেমের জন্যে যদি পথ চেয়ে হাঁ করে বসে থাকো, তাহলে তোমার কোনোদিনই বিয়ে হবে না। উফ্, কি শীত করছে রে বাবা! নাতালিয়া স্তেপানভনা ঘর-সংসারের কাজে সত্যিই খুব নিপুণা, লেখাপড়া জানে আর দেখতেও এমন একটা কিছু খারাপ নয়…এর চেয়ে বেশি আমার আর কি চাই? আর চাইলেই তো সবকিছু সব সময় পাওয়া যায় না। এই যে আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেলো, অথচ এখনও বিয়ে হলো না, এভাবে তো আর চিরটা কাল চলবে না। তাছাড়া এখন আমাকে স্বাভাবিক, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে হবে…স্নায়ু আমার ভীষণ দুর্বল, সারাক্ষণই বুক ধড়ফড় করে, সহজেই অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে পড়ি। এই তো, এখনই আমার ঠোঁট কাঁপছে, ডান

চোখের পাতাটা নাচছে। আর সব চেয়ে মুশকিল হয়েছে আমার ঘুম নিয়ে। যেই না বিছানায় শুয়েছি আর ঘুমে দু'চোখের পাতা আমার সবে জুড়ে আসছে, অমনি মনে হলো আমার বুকের বাঁ পাশটায় কে যেন ছোরা চালাচ্ছে। ব্যাস, ঘুম আমার মাথায় উঠলো। পাগলের মতো লাফিয়ে উঠে খানিকক্ষণ পায়চারি করলুম…তারপর আবার যখন ঘুমে দু'চোখের পাতা জুড়ে এলো, আবার সেই ছোরার ঘা। এ কি শুধু এক-আধ বার, দিনে যে এ রকম কত বার হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা…

[নাতালিয়া প্রবেশ করে]

নাতালিয়া : আরে আপনি! আর বাপিসোনাটা এমন দুষ্টু…তারপর কেমন আছেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ?

লোমভ : ভালোই আছি। তুমি কেমন আছো?

নাতালিয়া : হ্যাঁ, আমিও খুব ভালো। রোদে শুকতে দেবার জন্যে আমরা মটরশুঁটি ছাড়াচ্ছিলুম। ভদ্র জামা-কাপড় পরে আসতে পারিনি বলে যেন আবার কিছু মনে করবেন না। এতদিন যে বড় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি? একি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

[দুজনেই মুখোমুখি আসনে বসে]

আজ দুপুরে কিন্তু আমাদের এখানে খাওয়া-দাওয়া করে যেতে হবে।

লোমভ : ধন্যবাদ। আমার খাওয়া হয়ে গ্যাছে।

নাতালিয়া : ইচ্ছে করলে সিগারেট ধরাতে পারেন, এখানে কাঠি আছে… যাই বলুন আজকের দিনটা কিন্তু ভারি চমৎকার। অথচ জানেন, কাল এমন বৃষ্টি হলো, মজুররা সারাদিন কাজই করতে পারলো না। এদিকে আমাদের সব ফসল কাটা হয়ে গ্যাছে, এখন ভয় হচ্ছে আবার পচে না যায়। আমার মনে হয় আর কটা দিন অপেক্ষা করলেই ভালো হতো। সে যাকগে…

কিন্তু আপনার কি ব্যাপার, একেবারে বুলবাবু সেজে। নাচের আসর কিংবা কোনো উৎসব-টুৎসব আছে বলে মনে হচ্ছে? যাই বলুন, আগের চেয়ে আপনাকে কিন্তু এখন অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে।

লোমভ : না, মানে···আসলে ব্যাপারটা কি জানো নাতালিয়া·· আমি ভেবেছি তোমাকে একটা কথা জিগেস করবো। তুমি যেন আবার রাগ কোরো না, বা অবাক হোয়ো না···[নেপথ্যে] উরে বাবা, এখন আমার আবার শীত করছে।

নাতালিয়া : [অবাক হয়ে] কি ব্যাপার বলুন তো?

লোমভ : হ্যাঁ, যতটা সম্ভব সংক্ষেপেই বলি। তুমি নিশ্চয়ই জানো নাতালিয়া, দীর্ঘদিন ধরে মানে ছেলেবেলা থেকেই আমি তোমাদের পরিবারের সান্নিধ্য পেয়ে এসেছি। আমার পিসিমা পিসেমশাই, উত্তরাধিকার সূত্রে আমি যাঁদের কাছ থেকে জমিদারিটা পেয়েছি, ওঁরা তোমার বাবা আর স্বর্গতা মার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। লোমভ আর চুবুকভ পরিবারের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক আজ দীর্ঘদিনের। শুধু তাই নয়, তোমাদের আর আমাদের জমিদারীদুটোও একেবারে ঘেঁষা-ঘেঁষি। তোমার হয়তো মনে পড়বে, আমার ভলোভি মাঠটা শুরু হয়েছে তোমাদের বার্চ বনের একেবারে কোল থেকে।

নাতালিয়া : মাফ করবেন, এই মাত্র আপনি যে বললেন 'আমার' ভলোভি মাঠ কিন্তু ওটা কি সত্যিই আপনার?

লোমভ : হ্যাঁ, আমারই তো

নাতালিয়া : তাই নাকি! শুনে রাখুন, ভলোভি মাঠটা আপনার নয়, আমাদের।

লোমভ : না, তুমি ভুল করছো নাতালিয়া। ওটা আমার।

নাতালিয়া : এ যে নতুন শুনছি। তা ওটা আপনার হলো, কেমন করে?

লোমভ : তার মানে? তোমাদের বার্চ বন আর পোড়ো জলাটার

মাঝে যে মাঠটা রয়েছে আমি তার কথা বলছি।

নাতালিয়া : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই···ওটা তো আমাদের।

লোমভ : তুমি ভুল করছো নাতালিয়া, ওটা আমার।

নাতালিয়া : আপনার মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে ইভান ভাসিলিয়েভিচ। কবে থেকে ওটা আপনার হলো শুনি ?

লোমভ : কবে থেকে মানে ? যবে থেকে আমার মনে পড়ে—ওটা তো চিরকালই আমাদের ছিলো।

নাতালিয়া : ক্ষমা করবেন, আমি আপনার সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলুম না।

লোমভ : কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলেই দলিলপত্র সব দেখতে পারো। অবশ্য একথা সত্যি যে ভলোভি মাঠের স্বত্ব নিয়ে এক সময়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো, কিন্তু আজ সবাই জানে ওটা আমার। এবং এ নিয়ে ঋকাঋকি করারও কোনো প্রয়োজন নেই। তবু আমি তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি—আমার পিসিমার ঠাকুমা তোমার ঠাকুর্দার বাবার প্রজাদের ওই মাঠটা বিনা খাজনায় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ভোগ করতে দিয়েছিলেন, কথা ছিলো তার বদলে ওরা ইঁট পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বিনা খাজনায় প্রজারা ভোগ করে করে ধরেই নিয়েছে যে ওটা ওদের। কিন্তু দাসপ্রথা উঠে যাওয়ার পর যখন নতুন বন্দোবস্ত হলো···

নাতালিয়া : কিন্তু আপনি যা বলছেন ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। আমার ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা খুব ভালো করেই জানতেন বার্চ বন আর পোড়ো জলার মাঝের ভলোভি মাঠটা আমাদেরই সম্পত্তি। সুতরাং এ নিয়ে মিছিমিছি তর্ক করে কোনো লাভ নেই···

লোমভ : কিন্তু আমি তোমাকে দলিল দেখাতে পারি।

নাতালিয়া : না, আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ···নয়তো আমাকে চটিয়ে দিয়ে মজা দেখছেন।

কিন্তু সত্যিই আমার ভীষণ অবাক লাগছে। প্রায় তিনশো বছর ধরে জমিটা আমাদের, অথচ আজ হঠাৎ কেউ একজন বললো জমিটা আমার, অমনি তার হয়ে গেলো। ক্ষমা করবেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ, আমি যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না···অবশ্য আমি ওই মাঠটার কোনো মূল্যই দিই না। কত আর হবে, বড় জোর পনেরো একর, যার দাম তিনশো রুবলের একটুও বেশি নয়। কিন্তু প্রশ্নটা তা নয়, আসল কথা হলো এই সব অন্যায়-অবিচার আমি একদম সহ্য করতে পারি না, শুনলেই আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়।

লোমভ : মিনতি করছি, দোহাই তোমার, একটু ধৈর্য ধরে শোনো নাতালিয়া। তোমার ঠাকুর্দার বাবার প্রজারা আমার পিসিমার ঠাকুমার জন্যে ইঁট পোড়াতো, এ পর্যন্ত তো তোমাকে বলেছি। তার বদলে আমার পিসিমার ঠাকুমা চেয়েছিলেন ওদের অনুগ্রহ···

নাতালিয়া : ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, পিসিমা···এসব আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। মাঠটা আমাদের, ব্যাস, আর কিছু শুনতে চাই না।

লোমভ : না, মাঠটা আমার।

নাতালিয়া : মাঠটা আমাদের। আপনি যদি ঝাড়া দুদিন ধরেও তর্ক করেন, যদি এই পোশাকের ওপর আরও পনেরোটা নতুন পোশাক পরে আসেন, তবু ওটা আমাদের, আমাদের, আমাদের। আমি যেমন আপনার কোনো জিনিস চাই না, তেমনি আবার কোনো কিছু হারাতেও চাই না যা আমার নিজের··· তাতে আপনি যা-ই মনে করুন।

লোমভ : মাঠটার আমার কোনো প্রয়োজন নেই নাতালিয়া। কিন্তু প্রশ্নটা ন্যায়-অন্যায়ের। তুমি যদি চাও ওটা তোমাকে আমি এমনিই বিলিয়ে দিতে পারি।

নাতালিয়া : বিলিয়ে দিতে পারি একমাত্র আমিই, কেননা ওটা আমার। যাই বলুন ইভান ভাসিলিয়েভিচ, এটা কিন্তু খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত আমরা আপনাকে একজন সৎ প্রতিবেশী, একজন প্রকৃত বন্ধু হিসেবেই গণ্য করে এসেছি। গত বছর আপনাকে আমাদের ফসল-মাড়াইয়ের কলটা ধার দিলুম, ফলে আমাদের নিজের ফসল তুলতে তুলতে সেই নভেম্বর হয়ে গেলো। আর এখন আপনি আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন যেন আমরা কোথাকার কে হঠাৎ করে এসে জুড়ে বসেছি। আমারই নিজের জমিকে আপনি আমাকে বিলিয়ে দিতে চাইছেন। বাঃ, চমৎকার! যাই বলুন, এটা কিন্তু আদৌ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ নয়। আমি তো বলবো এটা রীতিমতো জুলুমবাজি···

লোমভ : তার মানে তুমি কি বলতে চাও, আমি তোমাদের জমি জবর-দখল করেছি?

নাতালিয়া : ঠিক তাই।

লোমভ : [উত্তেজিত ভাবে] তুমি না হয়ে আর অন্য কেউ হলে আমি কিন্তু আদৌ বরদাস্ত করতুম না···[গেলাস থেকে আর খানিকটা জল ঢক ঢক করে খেয়ে] ভলোভির মাঠটা আমার।

নাতালিয়া : কচু। ওটা আমাদের।

লোমভ : ওটা আমার।

নাতালিয়া : ডাহা মিথ্যে কথা। ঠিক আছে, আমি প্রমাণ করে দেবো ·· আজই আমি আমার মজুরদের ওই মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাবো।

লোমভ : কি বললে?

নাতালিয়া : আজই আমার মজুররা ওখানে ঘাস কাটতে যাবে।

লোমভ : আমি ওদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো।

নাতালিয়া। সে মুরোদ আপনার কোনো দিনই হবে না।

লোমভ : [বুক আঁকড়ে] ভলোভির মাঠ আমার, আমার, আমার!

নাতালিয়া : দয়া করে অত চ্যাঁচাবেন না। আপনার বাড়িতে বসে যত খুশি চ্যাঁচান, কিন্তু এখানে নয়।

লোমভ : আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না নাতালিয়া··· আমার বুকটা ধড়ফড় করছে, রগের পাশদুটো দপদপ করছে [হঠাৎ চিৎকার করে] ভলোভির মাঠটা আমার।

নাতালিয়া : আমাদের

লোমভ : আমার

নাতালিয়া : আমাদের

লোমভ : আমার

[চুবুকভ প্রবেশ করেন]

চুবুকভ : কি ব্যাপার, তোমরা এত চ্যাঁচাচ্ছো কেন?

নাতালিয়া : আচ্ছা বাপিসোনা, তুমি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলো তো ভলোভির মাঠটা—আমাদের, না ওঁর।

চুবুকভ : [লোমভকে] মাঠটা তো আমাদেরই, ইভান ভাসিলিয়েভিচ।

লোমভ : ক্ষমা করবেন স্তেপান স্তেপানভিচ, মাঠটা আপনাদের হলো কি করে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমার পিসিমার ঠাকুমা ওটা আপনার ঠাকুদ্দার প্রজাদের বিনা খাজনায় ভোগ করতে দিয়েছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে ভোগ করতে করতে ওরা ধরেই নিয়েছে জমিটা ওদের। কিন্তু পরে যখন নতুন বন্দোবস্ত হলো·

চুবুকভ : তুমি কিন্তু একটা জিনিস ভুল করছো ইভান ভাসিলিয়েভিচ, জমিটার স্বত্ব নিয়ে গোলমাল ছিল বলেই প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। আজ গাঁয়ের একটা কুকুরও জানে ও জমিটা আমাদের।

লোমভ : কিন্তু আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেবো ওটা আমার।

চুবুকভ : তা তুমি কোনো দিনই পারবে না।

লোমভ : [চেঁচিয়ে] আলবৎ পারবো।

চুবুকভ : কিন্তু অত চ্যাঁচাচ্ছো কেন? চ্যাঁচালেই কি প্রমাণ হয়ে যাবে

যে ওটা তোমার ? যে জিনিস তোমার তা আমার চাই না, কিন্তু যা আমার তাকে ছেড়ে দেবার কথা মাত্র বাসনা আমার নেই। আর দেবোই বা কেন ? তুমি যদি এ নিয়ে অযথা ঝামেলা পাকাও, আমি বরং জমিটা প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো, তবু তোমাকে দেবো না। এই আমার শেষ কথা।

লোমভ : কিন্তু অপরের সম্পত্তি বিলিয়ে দেবার আপনার কি অধিকার আছে আমি সেইটেই বুঝতে পারছি না !

চুবুকভ : আমার কি অধিকার আছে না আছে তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আর শোনো, আমি ঠিক এ ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত নই···আমার বয়েস তোমার দ্বিগুণ, তবু তোমায় অনুরোধ করছি এবার থেকে আমার সামনে আর কক্ষোনো ওরকম বিশ্রী ভাবে চোটপাট করে কথা কইবে না।

লোমভ : বেশ, তা না হয় কইবো না। কিন্তু আপনি কি ভেবেছেন আমি একটা উজবুক, আর তা নিয়ে হাসাহাসি করবেন ! আমার জমিটাকে অনায়াসে বলছেন আপনাদের, এর পরেও কি আপনি আশা করেন আমি ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলবো ? না স্তেপান স্তেপানভিচ, কোনো সং প্রতিবেশী এ রকম আচরণ করেন না। আপনি আমার প্রতিবেশী নন, আপনি আমার জমি বেদখলকারী।

চুবুকভ : কি বললে ?

নাতালিয়া : ভলোভির মাঠে তুমি এক্ষুণি লোকজনদের ঘাস কাটতে পাঠাও বাপিসোনা।

লোমভ : আমিও ওদের ছেড়ে কথা কইবো না। তাছাড়া আমি আদালতে যাবো, প্রমাণ করে দেবো জমিটা আমার।

চুবুকভ : আদালতে যাবে ? বেশ, তাই যাও। আমি তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি—এতদিন মৌকা খুঁজছিলে কোন্ ছুতোয় আদালতে যাওয়া যায়। সামান্য জিনিস নিয়ে ঘোঁট পাকানোই

তোমাদের স্বভাব। তোমাদের গুষ্টির সবাই মামলাবাজ…

লোমভ: দোহাই আপনার, আমার পরিবারের লোকজনদের আর অপমান করবেন না। আর যাই হোক, আমাদের ভদ্র পরিবারের কাউকে অন্তত আপনার কাকার মতো তহবিল তছরুপের দায়ে কাঠগড়ায় উঠতে হয়নি।

চুবুকভ: লোমভ গুষ্টির সবাই পাগল।

নাতালিয়া: সবাই—সব কটা।

চুবুকভ: তোমার ঠাকুর্দা ছিলো পাঁড় মাতাল। তোমার ছোট পিসি, নাতালিয়া মাখাইলোভনা পালিয়ে গিয়েছিলো একটা কারিগরের সঙ্গে

লোমভ: আর আপনার মা ছিলেন কুঁজো। ওরে বাবা…[দু হাতে বুকটা চেপে ধরে] বুকের ব্যথাটা আবার ঝিলিক মারছে… সমস্ত রক্ত আমার মাথায় উঠে গ্যাছে।

চুবুকভ: তোমার বাবা ছিলো জুয়াড়ি আর রাম পেটুক

নাতালিয়া: আপনার ছোট পিসি ছিলেন একটা কুটনি—ওরকম কুচুটে মহিলা সারা গাঁয়ে আর একটাও ছিলেন না।

লোমভ: আমার বাঁ পাটা অবশ হয়ে যাচ্ছে…আপনি, আপনি একটা ধড়িবাজ…উঃ, আমার বুকটা!…সবাই জানে, নির্বাচনের আগে আপনি…চোখের সামনে আমার বিজলি খেলে যাচ্ছে

আমার টুপি, আমার টুপিটা কোথায়?

নাতালিয়া: আপনি একটা ছোটলোক, ইতর, ধাপ্পাবাজ।

চুবুকভ: হ্যাঁ, ঠিক তাই। তুমি একটা নীচ, ভণ্ড, ছোটলোকেরও বেহদ্দ।

লোমভ: এই যে টুপিটা, পেয়েছি…উঃ, বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে… কোন্ দিক দিয়ে বেরুবো? দরজাটা যেন কোথায়? উঃ, আর বাঁচবো না…পাটা যেন নড়ছেই না…

[দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

চুবুকভ: [পেছন থেকে চেঁচিয়ে] খবদ্দার, আর কোনো দিন এ

বাড়ির ছায়াও মাড়াবে না।

[টলতে টলতে লোমভ বেরিয়ে যায়]

চুবুকভ : উচ্ছন্নে যাক !

[অস্থির ভাবে পায়চারি করে]

নাতালিয়া : এ রকম একটা পাজি লোক আর কখনো দেখেছো ? এর পরেও লোকে বলবে প্রতিবেশীর ওপর ভরসা রাখতে।

চুবুকভ : ওটা একটা আস্ত হালপাতার সেপাই, পাজি, বদমাইস। ব্যাটার সাহস কতখানি, এখানে এসেছিলো আবার প্রস্তাব পাড়তে ! ভাবতে পারিস তুই ?

নাতালিয়া : প্রস্তাব ! কিসের প্রস্তাব বাপিসোনা ?

চুবুকভ : কিসের আবার, তোকে বিয়ে করার।

নাতালিয়া : বিয়ে করার ! আমাকে ! আমাকে আগে বলোনি কেন বাপিসোনা ?

চুবুকভ : আরে সেই জন্যেই তো বাঁদরটা অমন সেজেগুজে এসেছিলো

নাতালিয়া : আমাকে বিয়ে করতে ? আমার বিয়েব প্রস্তাব নিয়ে ? হায় হায় হায়…[অস্ফুট আর্তনাদ করে চেয়ারে বসে পড়ে] তুমি ওকে ডেকে নিয়ে এসো বাপিসোনা…শিগগির ডেকে নিয়ে এসো !

চুবুকভ : কাকে ডেকে নিয়ে আসবো ?

নাতালিয়া : কাকে আবার, ওকে। যাও যাও, শিগগির ডেকে নিয়ে এসো বাপিসোনা। নইলে হয়তো আমি এখুনি ভিরমি খেয়ে যাবো।

[মৃগীরোগীর মতো আর্তনাদ করে]

চুবুকভ : উঃ, এখন আমি কি করি ! [দু হাতে মাথাটা চেপে ধরে অনেকটা স্বগত স্বরে] অভিসম্পাত আর কাকে বলে। গুলি করে আত্মহত্যা করা, কিংবা গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া এখন আমার আর কোনো উপায় নেই। ওরা সবাই মিলে

আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না।

নাতালিয়া : তুমি শিগগির যাও বাপিসোনা, নইলে আমি ঠিক মরে যাবো।

চুবুকভ : যাচ্ছি যাচ্ছি ···অমন হাউমাউ করিস না, চুপ কর :

[ছুটে বেরিয়ে যান]

নাতালিয়া : এ আমি কি করলুম ! [ককিয়ে] ওগো, ওকে তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে এসো গো।

চুবুকভ : [দ্রুত প্রবেশ করে] ওই যে, বদনচাঁদ আসছেন। তুই নিজে ওর সঙ্গে কথা বলবি, আমার দ্বারা হবে না, এই তোকে আমি স্পষ্ট বলে দিলুম।

নাতালিয়া : [আগেরই মতো ককিয়ে] হায় হায়, আমার কি পোড়া কপাল গো।

চুবুকভ : [ধমকে] আবার চেঁচাচ্ছিস কেন ? বললুম তো ও আসছে। উফ্। আইবুড়ো মেয়ের বাবা হওয়া যে কি যন্ত্রণা ! হে ভগবান, কেন এর আগে আমি গলায় ছুরি বসালুম না ? লোকটাকে গালাগালি দিলুম, অপমান করলুম, লাথি মেরে ঘর থেকে দূর করে দিলুম—এ সব শুধু তোর জন্যে, তোরই দোষ।

নাতালিয়া : না, তোমার।

চুবুকভ : ও, এখন সব দোষ তাহলে আমার। বেশ, এর পর আর কি শুনতে হবে ?

[বুকটা চেপে ধরে লোমভ প্রবেশ করে]

লোমভ : বুক ধড়ফড় করছে···পাটা অবশ হয়ে গ্যাছে···বাঁ পাশটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে···

চুবুকভ : [স্বগত স্বরে ভেংচি কেটে] তুমি জাহান্নমে যাও !

[দ্রুত বেরিয়ে যান]

নাতালিয়া : মাফ করবেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ, ঝোঁকের মাথায় তখন বলে ফেলেছি···এখন মনে পড়ছে, ভলোভির মাঠটা সত্যিই আপনার।

লোমভ : উরে বাব্বা, বুকটা যা ধড়ফড় করছে···মাঠটা আমার···দুটো চোখের পাতাই আবার এক সঙ্গে নাচছে···

নাতালিয়া : হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাঠটা আপনারই···বসুন না···[দুজনে বসে] আমাদেরই ভুল হয়েছিলো।

লোমভ : আসলে কি জানো, এটা একটা ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন···জমি-টার আমি আদৌ কোনো মূল্য দিই না, কিন্তু আমার কাছে ন্যায়ের মূল্য অনেকখানি।

নাতালিয়া : নিশ্চয়ই, তাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু ওকথা থাক, এখন অন্য কিছু বলুন।

লোমভ : বিশেষ করে আমার হাতে যখন প্রমাণ রয়েছে। আমার পিসিমার ঠাকুমা তোমার বাবার ঠাকুদ্দার প্রজাদের·

নাতালিয়া : থাক থাক, ওসব কথা তো হয়েই গ্যাছে ··[স্বগত স্বরে] দূর, কোথা থেকে যে ছাই শুরু করি···[যেন হঠাৎ মনে পড়েছে] আপনি কি খুব শিগ্‌গিরই আবার শিকারে বেরুচ্ছেন নাকি ?

লোমভ : ইচ্ছে তো আছে ফসল ওঠার পরেই হাঁস শিকারে বেরুবো। ইশ, আমার কি পোড়া কপাল, তুমি হয়তো শুনেছো— আমার ট্রাইয়ারটার আবার পা খোঁড়া হয়ে গ্যাছে।

নাতালিয়া : আহা রে বেচারি ! কি করে হলো বলুন তো ?

লোমভ : ঠিক জানি না· ·তবে মনে হয় মচকে গ্যাছে, নয়তো অন্য কোনো কুকুরে কামড়ে দিয়েছে। [গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে] টাকার কথা বাদ দিলেও, ওইটেই আমার সবচেয়ে প্রিয় কুকুর। তুমি হয়তো জানো, মিরনভের কাছ থেকে ওকে আমি একশো পঁচিশ রুবল দিয়ে কিনেছিলুম।

নাতালিয়া : আপনাকে কিন্তু অযথা বড্ড বেশি দাম দিতে হয়েছিলো ইভান ভাসিলিয়েভিচ।

লোমভ : আমার তো মনে হয় জলের দামেই পেয়েছিলুম। সত্যি বলতে কি, ওর মতো কুকুরই হয় না।

নাতালিয়া : বাপি ক্লাইয়ারের জন্তে পঁচিশ রুবল দিয়েছিলেন। আর আমাদের ক্লাইয়ার আপনার ট্রাইয়ারের চাইতে অনেক ভালো কুকুর।

লোমভ : ক্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চাইতে ভালো কুকুর! যাঃ, কি বলো না! [হাসতে হাসতে] ক্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চাইতে ভালো?

নাতালিয়া : নিশ্চয় ভালো। অবশ্য এ কথা সত্যি, ও এখনও বাচ্চা— পুরো বয়েস হয়নি। তবে সবদিক থেকে অমন চালাক-চতুর কুকুর ভলচানিংস্কিতে আর একটাও নেই।

লোমভ : মাফ করো নাতালিয়া, ও থ্যাবড়ামুখো। আর থ্যাবড়া-মুখো কুকুর কখনও কোনো জিনিস ভালো করে কামড়ে ধরতে পারে না।

নাতালিয়া : আমাদের ক্লাইয়ার থ্যাবড়ামুখো এই প্রথম শুনলুম।

লোমভ : তুমি হয়তো লক্ষ্য করোনি, ওর নিচের চোয়াল ওপরের চোয়ালের চাইতে অনেক ছোট।

নাতালিয়া : কেন, আপনি মেপে দেখেছেন নাকি?

লোমভ : হ্যাঁ। ও শিকার তাড়া করে অবশ্য খুব ভালো, কিন্তু কামড়ে ধরার বেলায় অষ্টরম্ভা।

নাতালিয়া : প্রথমত আমাদের ক্লাইয়ার খানদানী বংশের কুকুর—হার্নেস আর চিজল ওর বাপ-মা। আর আপনার ট্রাইয়ারের গায়ে এমন পাঁচমিশেলি রং যে চেনাই যায় না ও কোন্ জাতের কুকুর। তাছাড়া ও বুড়ো হয়ে গ্যাছে, আর এমন কদাকার দেখতে যে…

লোমভ : কি বললে, বুড়ো আর কদাকার দেখতে! কিন্তু ওর বদলে কেউ যদি আমাকে পাঁচটা ক্লাইয়ারও দেয় আমি নেবো না। ট্রাইয়ার হচ্ছে যাকে বলে সত্যিকারের কুকুর, কিন্তু ক্লাইয়ার…অবশ্য এ নিয়ে তর্ক করাটাই বোকামি। তোমাদের ক্লাইয়ারের মতো কুকুর সব শিকারীদেরই অমন গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। যদি পঁচিশ রুবল দিয়ে থাকে, তাহলে বলবো ওর

তুলনায় অনেক বেশিই নিয়েছে।

নাতালিয়া : আপনার ঘাড়ে যে আজ কি ভূত চেপেছে কে জানে, সব কথাতেই খালি উলটো বলছেন। প্রথমে বলে বসলেন ভলোভির মাঠটা আপনার, এখন বলছেন ট্রাইয়ার ক্লাইয়ারের চাইতে ভালো। কিন্তু সবাই জানে আপনার ওই বোকা ট্রাইয়ারের চাইতে আমাদের ক্লাইয়ার শতগুণে ভালো। তাহলে আর কেন মিছিমিছি উলটো বলছেন?

লোমভ : বুঝতে পেরেছি নাতালিয়া, তুমি আমাকে ভেবেছো হয় মূর্খ নয়তো অন্ধ। এই জিনিসটা তুমি কেন বুঝতে পারছো না তোমাদের ক্লাইয়ার থ্যাবড়ামুখো

নাতালিয়া : মিথ্যে কথা।

লোমভ : নিশ্চয়ই ওটা থ্যাবড়ামুখো।

নাতালিয়া : [চেঁচিয়ে] না, মিথ্যে কথা।

লোমভ : গলার শিরা ফুলিয়ে অমন চেঁচাচ্ছো কেন?

নাতালিয়া : আপনিই বা অমন আজেবাজে বকছেন কেন? সত্যি, শুনলে পিত্তি একেবারে জ্বলে যায়। আপনার ট্রাইয়ারকে গুলি করে মারার সময় হয়ে এলো, আর আপনি এখন ওকে ক্লাইয়ারের সঙ্গে তুলনা করছেন।

লোমভ : থাক, এ নিয়ে আর তর্ক করে কোনো লাভ নেই। আমার বুকটা আবার ধড়ফড় করছে।

নাতালিয়া : আমি দেখেছি, যারা শিকার সম্পর্কে যত কম জানে, তারাই শিকার নিয়ে তত বেশি তর্কাতর্কি করে।

লোমভ : দোহাই তোমার, চুপ করো নাতালিয়া···বুকটা আমার যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে· [চিৎকার করে] চুপ করো!

নাতালিয়া : না, যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করছেন ক্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চাইতে শতগুণে ভালো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চুপ করবো না।

লোমভ : না, তোমাদের ক্লাইয়ার শতগুণে নিরেস···উরে বাবা, মাথাটা আবার ঝিমঝিম করছে···চোখের পাতাদুটো নাচছে···

কাঁধটা···

নাতালিয়া : আর আপনার হাবা ট্রাইয়ারটাকে গুলি করে মারতে হবে না, ও সে এমনিতেই প্রায় মরে আছে।

লোমভ : উরে বাবারে বাবা··· [মিনতি করে] দোহাই তোমার, চুপ করো, লক্ষ্মীটি, বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে

নাতালিয়া [চেঁচিয়ে] না, আমি কিছুতেই চুপ করবো না।

[চুবুকভ প্রবেশ করেন]

চুবুকভ : কি ব্যাপার, আবার কি হলো?

নাতালিয়া : আচ্ছা, সত্যি কোরে বলো তো বাপসোনা, কোন্ কুকুরটা ভালো—আমাদের স্কাইয়ার, না ওর ট্রাইয়ার?

লোমভ : অনুগ্রহ করে আপনি শুধু একটা কথা বলুন স্তেপান স্তেপানভিচ—আপনাদের স্কাইয়ার থ্যাবড়ামুখো, না থ্যাবড়ামুখো নয়?

চুবুকভ : যদি হতই না, তাতে কি এসে গেলো? যাই বলো, এ রকম কুকুর সারা জেলাতে আর একটাও নেই

লোমভ : [উত্তেজিত স্বরে] আমার ট্রাইয়ারের চাইতেও ভালো?

চুবুকভ : ও রকম হঠাৎ হঠাৎ মাথা গরম কোরো না বাপু···দাঁড়াও, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি··· ট্রাইয়ারের অনেক গুণ আছে—জাতে ভালো, পাগুলো জোরদার, চমৎকার গড়ন। কিন্তু ওর সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো—একেবারে বুড়িয়ে গ্যাছে আর নাকটা ভীষণ চাপা, প্রায় নেই বললেই চলে

লোমভ : মাফ করবেন, বুকটা আমার ধড়ফড় করছে···কিন্তু আপনার হয়তো মনে আছে, আমরা যখন মারুসকিনের মাঠে শিকার করতে গিয়েছিলুম, আমার ট্রাইয়ার কাউন্টের স্পটারের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটেছিলো, কিন্তু আপনাদের স্কাইয়ার প্রায় আধ মাইল পেছনে পড়েছিলো।

চুবুকভ : তার কারণ কাউন্টের ভাড়াটে শিকারীটা চাবুক দিয়ে ওর পায়ে মেরেছিলো।

লোমভ : ওটাই ওর প্রাপ্য ছিলো। শিকার করতে এসে সবকটা কুকুর যখন খেঁকশিয়ালের পেছনে তাড়া করছিলো, ও তখন নিরীহ ভেড়াগুলোকে জ্বালাতন করছিলো।

চুবুকভ : বাজে বোকো না! দেখো বাপু, রাগিও না, আমার আবার চট করে মাথা গরম হয়ে যায়। লোকের স্বভাবই হচ্ছে অন্যের কুকুরকে হিংসে করা, তাই শিকারীটা ওর পায়ে চাবুক মেরেছিলো। আর তুমিও যখন দেখলে আমাদের স্কুইয়ার তোমার ট্রাইয়ারের চাইতে অনেক সরেস, এমনি ঘ্যানোর ঘ্যানোর জুড়ে দিলে—[বিকৃত স্বরে] আমার ট্রাইয়ার আপনাদের স্কুইয়ারের চাইতে অনেক ভালো! দেখো বাপু, এসব আমার আবার অনেক ভালো মনে থাকে।

লোমভ : আমারও।

চুবুকভ : [ভেংচি কেটে] আমারও!

লোমভ : উরে বাবারে বাবা···বুকটা ধড়ফড় করছে···পাটা অবশ হয়ে গ্যাছে—

নাতালিয়া : [ভেংচি কেটে] উঁ, বুকটা ধড়ফড় করছে! ইশ, কি বড় শিকারী রে আমার! শিকারে না গিয়ে আপনার উচিত উনুনের পাশে শুয়ে শুয়ে গুবরেপোকা মারা।

চুবুকভ : ঠিক, ঠিক বলেছিস নাতাশা। ওটা আদপে শিকারীই নয়। ও শিকারে যায় শুধু অপরের কুকুরকে হিংসে করার জন্যে।

লোমভ : আর আপনি—আপনি কি? আপনি তো শিকারে যান শুধু লোকের বিরুদ্ধে কাউন্টের কাছে নালিশ করার জন্যে। উরে বাবা, বুকটা আমার···আসলে আপনি ভীষণ কুচুটে।

চুবুকভ : কি? কি বললে? আমি কুচুটে? [চেঁচিয়ে] খবরদার!

লোমভ : হ্যাঁ, আপনি কুচুটে।

চুবুকভ : খেচ্চড়, মেয়ে-ন্যাংড়া, পাজি, বদমাইশ!

লোমভ : বুড়ো ইঁদুর, ভণ্ড!

চুবুকভ : মুখ সামলে কথা বলো, নইলে আমি তোমাকে নোংরা বন্দুক

দিয়ে [illegible]রের মতো গুলি করে মারবো।

লোমভ : সবাই জানে···উঃ, আমার বুকটা···আপনার স্ত্রী আপনাকে ধরে ঠ্যাঙাতো। ··আমার পাটা অবশ হয়ে গ্যাছে···মাথাটা ঘুরছে ··চোখের সামনে বিজলী খেলছে···আমি পড়ে যাবো ···আমি পড়ে যাচ্ছি···

চুবুকভ : আর যে মাগী তোমার সংসারে সে তোমাকে চেপে রেখেছে বুড়ো আঙুলের নিচে।

লোমভ : উঃ রে বাবারে বাবা·· আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে···আমার কাঁধটা নেই···আমি মরে যাচ্ছি। [চেয়ারে আছড়ে পড়ে] ডাক্তার!

[মূর্চ্ছা যায়]

চুবুকভ : খেড়ে, মেয়ে-ন্যাংড়া, পাজি, বদমাইশ!

নাতালিয় : শিকারী না ছাই! কি করে ঘোড়ায় চড়তে হয় তাই-ই জানে না। [বাবাকে] কিন্তু ওর কি হলো দেখো না বাপি-সোনা! ইভান ভাসিলিয়েভিচ! [আর্তনাদ করে] একি বাপিসোনা, উনি যে মারা গ্যাছেন!

চুবুকভ : সর্বনাশ! এদিকে আমারও দম বন্ধ হয়ে আসছে! বাতাস, আমাকে বাতাস দাও!

নাতালিয় : উনি মারা গ্যাছেন! [আস্তিন ধরে টানাটানি করতে করতে] ইভান ভাসিলিয়েভিচ! ইভান ভাসিলিয়েভিচ! এ আমরা কি করলাম! উনি মারা গ্যাছেন! ডাক্তার, ডাক্তার!

[চেয়ারে আছড়ে পড়ে আচ্ছন্নের মতো কখনও কাঁদে, কখনও বা আবার হেসে ওঠে]

বুকভ : কি হয়েছে কি? কি চাস তুই?

নাতালিয়া : [ফোঁপাতে ফোঁপাতে] উনি মারা গ্যাছেন বাপিসোনা!

চুবুকভ : [লোমভের দিকে তাকিয়ে] সত্যিই তো! হে ভগবান, এখন আমি কি করি! জল, ডাক্তার, জল! [এক গেলাস জল

লোমভের ঠোঁটের সামনে ধরে] নাও, একটু জল খেয়ে নাও ···নাঃ, ও খাচ্ছে না। তাহলে ও সত্যিই মারা গ্যাছে। হায় হায়, কি পোড়া কপাল আমার! কেন আমি আত্মহত্যা করলুম না? কেন আমি মিছিমিছি এখনও অপেক্ষা করছি? [লোমভ একটু নড়ল] এই তো নড়ছে···খাও বাবা, একটু জল খেয়ে নাও! হ্যাঁ, ঠিক আছে···

লোমভ : আমার চোখের সামনে বিজলী খেলছে···কুয়াশার মতো ঝাপসা হয়ে গ্যাছে···আমি কোথায়?

চুবুকভ : নাতাশা রাজি আছে, যাও তাড়াতাড়ি সত্বর বিয়েটা সেরে ফ্যালো আর উচ্ছন্নে যাও। [দুজনের হাত মিলিয়ে] আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি···আমার আর কিচ্ছু চাই না, শুধু একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

লোমভ : আঁঃ! কি ব্যাপার? [উঠে দাঁড়িয়ে] কে?

চুবুকভ : আবার কি হলো? চুমু খাও, চুমু খাও···ও রাজি আছে···

নাতালিয়া : [আর্তনাদ করে] উনি বেঁচে আছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাজি ·

চুবুকভ : এসো, দুজন দুজনকে চুমু খাও।

লোমভ : আঁঃ। কাকে? [নাতালিয়াকে চুমু দিয়ে] সাঃ, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে! মাফ করবেন, ব্যাপারটা কি যেন? ওঃ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে···আমার বুকটা···বিজলী সত্যিই আমি সুখী নাতালিয়া স্তেপানভনা···[ওর হাতে চুমু দিয়ে] আমার পাটা···

নাতালিয়া : আমিও খুব সুখী ইভান ভাসিলিয়েভিচ!

চুবুকভ : উফ, ঘাড় থেকে কি বোঝাটাই না নামলো!

নাতালিয়া : কিন্তু যাই বলুন, এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে— আমাদের স্লাইয়ার আপনার ট্রাইয়ারের চাইতে অনেক ভালো কুকুর।

লোমভ : মোটেই না, আমার ট্রাইয়ার অনেক ভালো কুকুর।